প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭, এপ্রিল, ১৯৬০

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার টাইপসেটিং : পেজমেকার্স
২৩বি. রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রক স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

জীবনের যথার্থ উদ্ভাসই প্রতিফলিত হয় সাহিত্যের অঙ্গনে । তাই সাহিত্য জীবনের মতোই গতিময়, জীবনের মতো তার স্রোতও অব্যাহত । চলার পথে নানা বাঁকে সূচীত হয় তার দেহ কিংবা মনের পরিবর্তন, পরিমার্জন । কিন্তু যথার্থ পরিবর্তন-পরিমার্জন আকস্মিক বা আরোপিত কোনো বহিরঙ্গ নয় । মানুষের জীবনে দ্বান্দ্বিকতার যে সত্য লক্ষণীয়, সাহিত্যেও তা পরোক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে । সমাজে ও ব্যক্তিজীবনে যেমন, শিল্প-সাহিত্যেও অবিরাম দ্বন্দ্বের একটি বাস্তব আর্থ-সামাজিক পটভূমি সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান । খুব সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, গতানুগতিকতার সঙ্গে প্রবহমানতার দ্বন্দ্ব । গতানুগতিকতা কালক্রমে ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে পর্যবসিত হয়, প্রবহমানতা চলিষ্ণুতারই নামান্তর ।

শিল্প সাহিত্যে এই দুই শক্তির অবিরাম দ্বন্দ্ব অন্তহীন বলেই এগুলির কোন একটির জয় বা পরাজয় চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত, এমন ঘোষণা বস্তুত প্রায় অসম্ভব । কিন্তু বলাই বাহুল্য ক্ষয়িষ্ণু শক্তি চলিষ্ণু শক্তিকে শেষ পর্যন্ত প্রতিহত করতে পারে না । চলিষ্ণু শক্তিই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতিশক্তি । এই শক্তিই জয়ী হয় । কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু শক্তির অবশেষ নির্মূল হয় না সহজে । তা মুমূর্ষুবৎ রক্ষা করে তার অস্তিত্ব, সুযোগ পেলেই নানাভাবে, নানা আকারে আয়তনে বার বার আত্মপ্রকাশ করে । প্রবহমানতার পক্ষে সংগঠিত কাজের শক্তি ও উদ্যোগে যখনই ভাঁটা পড়ে, তখনই আপাতপ্রচ্ছন্ন রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়ার শক্তি আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পায় ।

সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষেও এই নির্ণয় সমপবিমাণেই সত্য । দেশবিদেশেব সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিশিষ্ট লেখকেরা সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাতেই সাহিত্যের রূপ-রীতি বিষয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাহিত্যের ভাণ্ডারকে নব নব ক্ষেত্রে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন । সাময়িকপত্রের এই চরিত্রটিই ফুটে উঠেছে ভারী সুন্দরভাবে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর লেখনীতে —

> এটি কখনো মন জোগাতে চায়নি, মনকে জাগাতে চেয়েছিলো । চেয়েছিলো নতুন সুবে নতুন কথা বলতে ; কোনো-এক সন্ধিক্ষণে যখন গতানুগতিকতা থেকে অব্যাহতির পথ দেখা যাচ্ছে না, তখন সাহিত্যের ক্লান্ত শিরায় তরুণ রক্ত বইয়ে দিয়েছিলো—নিন্দা-নির্যাতন বা ধনক্ষয়ে প্রতিহত হয়নি । এই সাহস, নিষ্ঠা, গতির একমুখিতা, সময়ের সেবা না করে সময়কে সৃষ্টি করার চেষ্টা—এইটেই লিটল ম্যাগাজিনের কুলধর্ম । ...... আজকের দিনে যাদের কণ্ঠ লোকের কানে পৌঁচচ্ছে না, যারা পাঠকের পুরোনো অভ্যাসের তলায় প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাদের এগিয়ে আনা, ব্যক্তি করে তোলাই সাহিত্যপত্রের কাজ ।[১]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ সাময়িক পত্রিকাকে আশ্রয় করে একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন এক প্রতিভাশালী সাহিত্যিক, যিনি বিশেষ আদর্শে বিশ্বাসী, শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে যার স্থির ধারণা আছে, যুগমানসে ও সমাজ-পরিপার্শ্ব সম্পর্কে যিনি সচেতন—তাঁর সম্পাদনায় সেই সাময়িকপত্রের এক বিশেষ চেহারা ও লক্ষণ ফুটে ওঠে । সমমনোভাবাপন্ন একদল লেখককে সঙ্গে নিয়ে তিনি একটি

পত্রিকা গড়ে তোলেন—মতবাদে হোক, আদর্শে হোক, রুচিতে হোক তৎকালীন সাহিত্য পরিবেশকে যা ভীষণভাবে নাড়া দেয়, প্রাণস্পন্দন জাগিয়ে তোলে। পরবর্তীকালে সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করে, সাহিত্যের গতিপথ নির্দেশ করে অথবা আন্দোলনের মাধ্যমে এক বিশেষ খাতে, নিশ্চিত ধারায় এগিয়ে নিয়ে যায়। এইসব আন্দোলন যেমন বিষয়বস্তুর দিক থেকে; ঠিক তেমনি কখনো বা আঙ্গিকের দিক থেকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধানে অগ্রসর হয়। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা সাহিত্যের গতিপরিবর্তনের যেমন সহায়তা করেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে মিলিয়ে গতিশীল করে তুলেছে। বস্তুতপক্ষে, ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে শিক্ষিত বাঙালির চিন্তাচেতনায় যে নব নব প্রশ্ন ও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তারই প্রকাশ ঘটল সাহিত্যে এবং যা ক্রমশ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে এক একটি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করল।

বাংলা সাহিত্যে সাময়িকপত্রের ঐতিহাসিক সার্থকতা নির্দেশ করে সুধী সমালোচক অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন —

> ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আজ অবধি দেখিতেছি যে বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য (এবং বাঙ্গালা আধুনিক সাহিত্য) প্রধানত সাময়িক পত্রিকার আশ্রয়েই বাড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা গদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের বাহন হইয়াই সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ভারতী, জ্ঞানাঙ্কুর, আর্যদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, সাধনা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও সবুজপত্র ইত্যাদির নাম বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়াছে।[২]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধাত্রীর ভূমিকায় সাময়িক পত্রের মূল পরিচয় এখানেই সুপরিস্ফুট।

'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮) থেকে বাংলা সাময়িকপত্রের আবির্ভাব হলেও, সাময়িকপত্রকে আশ্রয় করে প্রথম সচেতনভাবে একটি লেখকগোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যে এক সাহিত্য-আন্দোলনের সূচনা করলেন বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্ব 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে। 'বঙ্গদর্শন' পূর্ববর্তী 'সংবাদ প্রভাকর' বা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ওঠা ভাব-আন্দোলনকে আমরা গ্রহণ করিনি, কেননা উক্ত দুটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বেঁধেছিল, তা প্রকৃতপ্রস্তাবে সাহিত্য-আন্দোলন নয়। পরবর্তীকালে 'বঙ্গদর্শন' ছাড়া কয়েকটি পত্রিকাগোষ্ঠীর উদ্যোগে প্রধানত সাহিত্যিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। আমরা আমাদের গবেষণাকর্মের প্রথম অধ্যায়ে 'প্রাক্-বঙ্গদর্শন' পর্বে বাংলা সাময়িকপত্রের ভূমিকা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২), তৃতীয় অধ্যায়ে 'ভারতী' (১৮৭৭), চতুর্থ অধ্যায়ে 'সবুজপত্র' (১৯১৪), পঞ্চম অধ্যায়ে 'কল্লোল' (১৯২৩), ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'পরিচয়' (১৯৩১) পত্রিকা অবলম্বনে গঠিত কয়েকটি সাহিত্য-আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ও গতি-প্রকৃতি বিষয়ে আমাদের পর্যালোচনা উপস্থাপিত করব।

উল্লেখপঞ্জি

১) বুদ্ধদেব বসু : সাহিত্যপত্র, দেশ সুবর্ণজয়ন্তী, প্রবন্ধ সংকলন, তৃতীয় মুদ্রণ, আনন্দ, পৃ ১৫১।
২) সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, পৃ ৩৯।

প্রাক্‌-বঙ্গদর্শন পর্বে বাংলা সাময়িকপত্রের ভূমিকা

আধুনিক বাংলা সাহিত্য সামযিকপত্রের হাত ধরেই ক্রমশ সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে শিক্ষিত বাঙালির চিন্তাচেতনায় যে নব নব জিজ্ঞাসা ও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তাঁর বাহন ছিল সাময়িক পত্র। সাময়িক পত্র তাই আধুনিক বাঙালির নবচেতনা উন্মেষের প্রধান ধাত্রী এবং সেখানেই কালক্রমে গড়ে উঠল বাংলা সাহিত্যের নব নব পরীক্ষা।

বাংলা সাময়িকপত্র প্রসঙ্গে সাময়িকপত্রের বিশিষ্ট গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন :

> বাংলা সাহিত্যের প্রসারের সহিত বাংলা সাময়িক-পত্রের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে ; ১২২৫ (ইং ১৮১৮) সালে প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।[১]

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত মন্তব্য ঐতিহাসিকভাবে যথার্থ। বাংলা গদ্য-ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম যুগের সাময়িক পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে ১৮১৮ সনটি সবিশেষ স্মরণীয়। বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সমালোচক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে :

> বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে ১৮১৮ সনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এই বৎসব একখানি মাসিক ('দিগ্‌দর্শন') এবং দুখানি সাপ্তাহিক ('সমাচার দর্পণ', 'বাঙ্গাল গেজেটি') প্রকাশিত হলে বাঙালিসমাজ এই অভিনব ব্যাপারের প্রতি আকৃষ্ট হল এবং ক্রমে ক্রমে, সাময়িক পত্র সম্পাদনা ও প্রকাশনে প্রস্তুত হল।[২]

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম মাসিক পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন'-এর জন্মলাভ ঘটে। শ্রীরামপুর মিশন থেকে পত্রিকাটি হত। পত্রিকাটি মূলত ছিল শিক্ষার্থীদের উপযোগী। স্কুলেব ছাত্রদের পাঠোপযোগী বলে এর অনেকগুলি খন্ড স্কুল বুক সোসাইটি কিনে নিতেন। পরে এই মাসিক পত্রিকাটির বাংলা-ইংরেজি ও ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির বিশেষ গুরুত্ব এই জন্য যে এটি 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ' ও তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে প্রচারিত হয়। তখন বাংলা গদ্য সদ্য তৈরি হয়ে উঠছে, নানা শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রবর্তন হচ্ছে। এইসব বিষয়কে নবজাত গদ্যের মাধ্যমে পরিবেশন করার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ছিল 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকা। প্রথম দুটি সংখ্যার সূচি যথেষ্ট লক্ষণীয় :

'আমেরিকাব দর্শন বিষয়, হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ, হিন্দুস্থানের বাণিজ্য, বলুন দ্বারা সাদলর সাহেবের আকাশগমন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবরণ, শঙ্কর তবঙ্গের কথা, উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার কথা, ভারতবর্ষে জন্মে অথচ ইংল্যান্ডে না জন্মে যে বৃক্ষ তাহারদের বিবরণ, ইংলন্ডের বাদশাহের পৌত্রীর মৃত্যু বিবরণ, বাষ্পের দ্বারা নৌকা চালানোর বিষয়, কোমিল্লার পাঠশালার বিষয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের কথা।'

উক্ত নিবন্ধ গুলির তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে পত্রিকাটি যুবকদের মানসিক উৎকর্ষসাধনে বিশেষ যত্নবান হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেকালে যেসব বিষয়ের প্রতি পাঠকের কৌতূহল সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন ছিল সেইসব বিষয়ই এতে সন্নিবেশিত হয়েছিল। সর্বোপরি এর ভাষাও প্রথমাবধি ছিল শুদ্ধ ও প্রাঞ্জল, যেমন 'আমেরিকার দর্শন বিষয়' রচনাটির সূচনা :

'পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত আছে ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেবিকা। ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্র দ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপ হইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিন শত ছাবিবশ বৎসব হইল আট শত আটানববই শালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূবের্ব আমেরিকা কোন লোককর্তৃক জানা ছিল না। এই নিমিত্তে তাহার প্রথম দর্শনের বিবরণ লিখি।'

আশ্চর্য লাগে প্রথম সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় যে বাংলা গদ্যরীতির সূচনা হল তা আজকের বাংলা গঠন-রীতি থেকে খুব স্বতন্ত্র নয়। অথচ সাময়িকপত্রের বাইরে বাংলা গদ্য এত উচ্চমানের ছিল না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতেবা যদিও আরবী-ফারসীর প্রভাব থেকে বাংলাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁদের হাতে বাংলা ভাষা আবার বহুক্ষেত্রে অতিমাত্রায় সংস্কৃতানুসারী হয়ে পড়ে। কিন্তু সাময়িকপত্রের আঙিনাতেই বাংলার নিজস্ব গদ্যরীতি গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয়। যেহেতু বিষয়-বৈচিত্র্যেই সাময়িকপত্রের প্রাণ এবং পাঠক নানা শ্রেণীর, তাই প্রতিবেদন রচনার জন্য সকলের বোধগম্য সহজ ভাষার অনুশীলনের চেষ্টা সক্রিয় ছিল। আসলে মার্শম্যান নামেমাত্রই পত্রের সম্পাদক ছিলেন, বেতনভুক বাঙালি পন্ডিতেরাই বচনা ও মুদ্রণ নির্বাহ করতেন। তাই এই পত্রিকার গদ্য এত প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। বিচক্ষণ মার্শম্যান জানতেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে তরুণদের মন আকৃষ্ট হতে পারে, সেই মতো তাঁর নির্দেশে বিষয়গুলি নির্ধারিত হত এবং পন্ডিতেরা সেই নির্দেশ অনুসারে বাংলায় লিখে ফেলতেন। তবে অনেকের মতে মার্শম্যান নিজেও লিখে দিতেন এবং পন্ডিতেরা মিশনাবী রচিত বাংলা রচনা সংশোধন করে সাধারণ বাঙালি পাঠকেব পাঠযোগ্য করে তুলতেন। সে যাইহোক, রীতিশুদ্ধ প্রাঞ্জল বাংলা গদ্যের যাত্রাও শুরু হল 'দিগ্‌দর্শন'-এর হাত ধরে। এছাড়াও সমকালীন নানা শিক্ষা, ধর্ম ও সামাজিক আন্দোলনের সংবাদ এতে ছাপা হত। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার সময় এই পত্রিকা থেকে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

একই সময়ে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের, ২৩ মে শনিবার জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় 'সমাচার-দর্পণ'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথমবারের প্রথম সংখ্যাব বিজ্ঞপ্তি থেকে স্পষ্ট

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

২১ অগ্রহায়ণ ১২৬২

বিজ্ঞাপন।

উত্তম কেষ্টরাইল বিক্রী।

সংবাদপ্রভাকর

২১ অগ্রহায়ণ শনিবার ১২৬২।

'সংবাদ প্রভাকব' পত্রের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

বোঝা যায় যে 'এতদ্দেশীয় লোকেদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয়'— এই অভিপ্রায়েই দর্পণের সূচনা হয়েছিল। সম্পাদক হিসেবে ক্লার্ক মার্শম্যানের নাম মুদ্রিত থাকলেও দেশীয় পন্ডিতরাই পত্রিকা প্রকাশের প্রধান সহায়ক হয়েছিলেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রথম দিকে 'সমাচার দর্পণ'-এর সম্পাদনায় সহযোগিতা করেছিলেন। পরে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনায় বৃত হয়ে ক্রমে তিনি 'দর্পণ'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই পত্রিকাটিই একদা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র বলে বিবেচিত হত। সমকালীন বাঙালি জীবনের জীবন্ত দলিল হিসেবে তার অনন্য মূল্য অবিস্মরণীয় হয়ে আছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক তিনখন্ডে সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নামক 'সমাচার দর্পণ'-এর শ্রেণীবদ্ধ সংবাদ সংকলনে। বস্তুত সমসাময়িক বাংলাদেশের ভাষা-সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি জাতীয় জীবনের সর্বমুখী বিকাশের দিকে 'সমাচার দর্পণ'-এর কৌতূহল ছিল। 'সমাচার দর্পণ'-এর পৃষ্ঠাতেই আমরা যেমন নারীশিক্ষা, সতীদাহ নিবারণ চেষ্টা প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিচয় পাই, তেমনি এখানেই পাই নিত্য-নূতন গ্রন্থ রচনার খবর, পাই আদর্শ রচনার নিদর্শন। সবকিছু মিলিয়ে আত্মসচেতন বিচার-নিষ্ঠ এক নতুন জাতির অভ্যুদয়ের নিভৃত পরিচয় ধরা আছে এই তথ্যরাজির গভীরে। যদিও এই পত্রিকা কোন সমাজ, সাহিত্য বা ধর্মের গঠনমূলক কোন আদর্শ তৈরি করে তুলতে পারেনি, তথাপি এর বাংলা গদ্যরীতি প্রায় সর্বত্রই ছিল বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছন্দ। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির হাতে রীতিশুদ্ধ গদ্য গতিশীল হয়ে উঠল 'সমাচার-দর্পণ'-এর পৃষ্ঠাতেই। সাহিত্যের, ইতিহাসের আলোচনায় বিশেষভাবে স্মরণীয় 'দর্পণ'-এ প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান' জাতীয় রচনা। 'বাবুর উপাখ্যান'-এ সহজ ভাষার দৃষ্টান্ত :

> বাবু লেখাপড়া কিছু শিখিলেন না অথচ সর্বত্র মান্য এবং পন্ডিতেরা কহেন আপনি সর্ব শাস্ত্র বিচার করিতে পারেন এবং সূক্ষ্ম বুঝিতে পারেন এই সকল কথার দ্বারা বাবু মহাভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাঙালিব দ্বারা ব্যবহার বিদ্যা নিয়ম ইত্যাদি সকলি শিখা হইয়াছে এবং তদনুযায়ী কর্মও সকল করা হইয়াছে। এই ক্ষণে সাহেব লোকের মত হইব এবং ধারা ব্যবহার পুরুষার্থ ধার্মিকতা সৌজন্য বিচারবাক্য সেই প্রকার প্রকাশ করিত।[৩]

এখানে ভাষা কথ্যরসের আমেজ সৃষ্টি করেছে। 'নববাবু বিলাস' কিংবা টেকচাঁদ-হুতোম রচিত সামাজিক ব্যঙ্গাত্মক নকশার মুখবন্ধ এখানেই। নিছক ব্যঙ্গাত্মক নকশা বলেই নয়, আলোচ্য রচনাবলীর মধ্যে যে সরল কৌতুকবোধ, সে সূক্ষ্ম সমাজসন্দর্শন ক্ষমতা এবং যে আত্মবিচারণার চেষ্টা রয়েছে তারই ঐতিহাসিক পরিণতি পরবর্তীকালে উপন্যাস সৃষ্টির উপযোগী মানসিকতা গঠনের উপলক্ষ হয়েছিল।

'সমাচার-দর্পণ'-এর আর একটি বিবৃতিমূলক সহজ ভাষার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

> এই স্কুলসোসৈয়িটি স্থাপন হওয়াতে বালকেরদের যত উপকার হইয়াছে এতাবৎ পূর্বে হওনের সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতো হিন্দু কালেজের ছাত্রদের যে পর্যন্ত জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বর্ণনা কবিবার আবশ্যকতা নাই যেহেতুক ঐ ছাত্রেরদের মধ্যে গত বৎসর কেহ সংভ্রান্ত ও বিশ্বস্ত পদপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারদের মধ্যে একজন এক প্রধান দপ্তরে তর্জমাকারক আর একজন মোং নাটোরের কালেক্তরি কাছারিব প্রধান কেরাণী হইয়াছে এবং যাহারা এখন

কালেজে আছে তাহারদের মধ্যে কতক বালক এই প্রকার কর্ম পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে। ঐ কালেজের বালকেরা অন্য লোকেরদের শিক্ষা দিবার নিমিত্তে আপনারদের মধ্যে এক পাঠশালা করিয়াছে, বৈকালে সেখানে তাহারা একত্র হইয়া অন্য ২ বালকেরদিগকে বিনা মূল্যে বিদ্যা দান করে।[৪]

এখানে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এ রচনা কোনো সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতের হলেও এ ভাষার সহজবোধ্যতা ও প্রবহমানতা পরবর্তীকালের 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সমালোচকের বিচারটি অবশ্যস্মরণীয় :

সব মিলিয়ে 'সমাচার-দর্পণে'র পৃষ্ঠাতেই সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির হাতে রীতিশুদ্ধ গদ্য গতিশীল হয়ে উঠেছে, একথা স্বীকার করতেই হয়।[৫]

'সমাচার-দর্পণ'-এর ইতিহাসে তিনটি পর্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্বে ১৮১৮-১৮৪১, ৩০ ডিসেম্বর। ৩০ ডিসেম্বর তারিখে 'সমাচার দর্পণ -এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মার্শম্যান মিশনের কাজে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে সাপ্তাহিকটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এবং রামগোপাল ঘোষের নির্দেশে 'সমাচার-দর্পণ'-এর দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হল (১৮৪২-৪৩)। এটি তখন আর মিশনারী সমাজের মুখপত্র রইল না, এর চরিত্রেরও বদল হল। এতে হিন্দু সমাজের কল্যাণকর ও প্রগতিমূলক নানা আলোচনা প্রকাশিত হতে লাগল, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, যেটি মিশনারি দর্পণের অত্যাজ্য অঙ্গ হয়ে পড়েছিল, তাও বর্জিত হল। অবশ্য এই দ্বিতীয় পর্যায়ের 'সমাচার-দর্পণ' কলকাতায় বেশিদিন জীবিত ছিল না, সম্ভবত ১৮৪৩ সনের গোড়ার দিকেই দর্পণের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু দর্পণের নামটির মধ্যে এমন একটি আকর্ষণ ছিল যে আবার শ্রীরামপুর মিশনারীরা এটিকে তৃতীয়বার প্রচলনের চেষ্টা করলেন। তাঁদের চেষ্টায় ১৮৫১ সনের ৩ মে শনিবার থেকে নবপর্যায় 'সমাচার-দর্পণ' প্রকাশিত হতে লাগল, কিন্তু এঁরাও সাপ্তাহিকটিকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না। ১২৬০ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ (১২ এপ্রিল, ১৮৫৩) 'সংবাদ প্রভাকর'-এ এই সংবাদ প্রকাশিত হয় :

'অগ্রহায়ণ মাসে (১২৫৯) ইংরাজি ১৮৫২ সনে সমাচার দর্পণ পত্র শ্রীরামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণত্যাগ করে।'

'সমাচার দর্পণ' মিশনারী সমাজের মুখপত্র ছিল, সুতরাং হিন্দু সমাজের সঙ্গে হৃদ্য সম্পর্কে থাকা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু প্রায়শই হিন্দুধর্মবিরোধী চিঠিপত্র প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষ কলকাতার হিন্দুসমাজকে প্রতিকূল করে তুলেছিলেন। তবে এই সাম্প্রদায়িক অনুদারতা বাদ দিলে 'সমাচার দর্পণ'কেই প্রথম যথার্থ সাংবাদিকতার বীজ বলে গণ্য করতে হবে। সুধী সমালোচকের মন্তব্যটি এই প্রসঙ্গে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

দেশীয় সমাজে কোথায় কী ঘটছে, কোথায় সমাজের উৎকর্ষাপকর্ষ দেখা দিচ্ছে, শিক্ষাসংস্কার, গ্রন্থপরিচয় প্রভৃতি সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণ' অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সাংবাদিকতার আদর্শ মেনে চলেছে। পরবর্তীকালে রামমোহন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইয়ংবেঙ্গল' যুবগোষ্ঠী, ঈশ্বর গুপ্ত, নীলরত্ন হালদার (বঙ্গদূত) প্রভৃতি দক্ষ সম্পাদকেরা বাংলা সাময়িকপত্র ও সাংবাদিক বৃত্তিকে উচ্চ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করলেও 'সমাচার দর্পণ'-এর সাংবাদিক স্বরূপ কখনো

ন্যূন কবা সম্ভ ব নয় ।[৬]

শ্রদ্ধেয় সমালোচক অধ্যাপক ড. সুকুমার সেনের বিচারটিও এক্ষেত্রে নিঃসংশয়ে স্মরণীয় :

> বাঙ্গালায় আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে সমাচার দর্পণ পত্রিকার প্রকাশ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা বিশিষ্ট দিক্‌চিহ্ন ।[৭]

শ্রীরামপুরের মিশনারিদের চেষ্টা ছাড়াও একই সময়ে বাঙালির নিজস্ব চেষ্টায় সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হতে পেরেছিল । 'সমাচার দর্পণ' যখন প্রকাশিত হয় প্রায় সেই সময়ই কলকাতাতেও 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রের সৃষ্টি হয়েছিল । এটিই বাঙালি পরিচালিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র । হরচন্দ্র রায় এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের প্রবর্তনায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের সম্ভবত ১৪ মে সাপ্তাহিক 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয় । সাময়িক পত্র হিসেবে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র পরিকল্পনা যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দেশীয় চিন্তাসঞ্জাত, তাতে সন্দেহ নেই । 'বাঙ্গাল গেজেটি'র কোনো সংখ্যা এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি এবং বছরখানেক চলবার পরই এর প্রচার বন্ধ হয়ে যায় ।

স্বল্পায়তন এই সাপ্তাহিক পত্রে সরকারী বিজ্ঞাপন, আইন ও কর্মচারী-নিয়োগ সংক্রান্ত নানা সংবাদ ও সরল বাংলায় স্থানীয় লোকের রুচিকর নানা কথা প্রকাশিত হত । সমকালীন সাময়িক-পত্র (Asiatic Journal, July 1819, P. 69) থেকে আরও জানা যায়, ১৮১৮ খ্রী. প্রকাশিত সহমরণ বিষয়ে রামমোহন রায়ের 'প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল ।

সেকালের বাংলাদেশে 'সমাচার-দর্পণ'-এর প্রকাশ নানা দিক থেকেই বহুল অভ্যর্থিত হলেও এই পত্রিকারই পৃষ্ঠায় 'কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশ হইতে কয়েক পত্রে প্রশ্ন সম্বলিত' একটি পত্র ১৪ জুলাই, ১৮২১ তারিখে প্রকাশ করেন । রামমোহন রায় এই পত্রটিকে মিশনারীদের তরফ থেকে হিন্দুধর্মের প্রতি অযথা আক্রমণ রোধে প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করেছিলেন । তিনি 'শিবপ্রসাদ শর্মা' ছদ্মনামে 'সমাচার দর্পণ'-এ উক্ত আক্রমণের প্রতিবাদ পাঠালেন এবং প্রসঙ্গ ক্রমে মিশনারিদের হিন্দুধর্ম বিদ্বেষের সমালোচনাই করলেন । ফলে 'দর্পণ' সম্পাদক মার্শম্যান পত্রটি মুদ্রিত না করে তাঁকে উপদেশ দিলেন :

> 'সবর্ব সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই ।'

সুতরাং রামমোহন মিশনারিদের পরধর্ম বিদ্বেষের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য নিজেই পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত করলেন । ১৮২১ সনের ২১ Brahmunical Magazin. The Missionary and the Brahman No. 1 এবং 'ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিশনারি সম্বাদ নং ১' নামে একটি দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করলেন। এর এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও পরের পৃষ্ঠায় তার ইংরেজি অনুবাদ থাকত ।

শিবপ্রসাদ শর্মার নামে প্রকাশিত হলেও, রামমোহন রায়ই যে প্রকৃতপক্ষে 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র লেখক — এ কথার উল্লেখ রামমোহনের প্রতিপক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার-

চন্দ্রিকা'য় পাওয়া যায় । ভবানীচরণ লিখেছিলেন —

'... সহমরণ রহিত বিষয়ে তাঁহাকে (রামমোহন রায়কে) ইঙ্গরেজী সমাচারপত্র— প্রকাশকেরা প্রশংসা দিতেছেন তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি... তিনি ব্রাহ্মণীকেল মেকজিন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সেবধি প্রভৃতি গ্রন্থ করিয়া মিসনারি প্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ানেরদিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন...।' (১২ ডিসেম্বর, ১৮২৯, 'সমাচার দর্পণ')

১৮২১ সালে প্রকাশিত 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র প্রথম তিন সংখ্যার সন্ধান পাওয়া গেছে, সম্ভবত এর আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি । 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র প্রথম তিনটি সংখ্যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যদিও রামমোহন হিন্দুদের পৌরাণিক বহুদেববাদ মানতেন না এবং বেদান্ত-উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বই মূল হিন্দুধর্ম বলে স্বীকার করতেন, তবু মিশনারিদের অযৌক্তিক আক্রমণের যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিলেন এবং খ্রীষ্টানদের ত্রিতত্ত্ববাদের হিন্দুদের বহুদেববাদের মতোই সংযত ভাষায় সমালোচনা করলেন । মাসিক 'Friend of India'-য় কিন্তু মিশনারিরা রামমোহনের বক্তব্যকে যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিহত করতে পারলেন না, ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আক্রমণ করলেন। এ বিষয়ে সাধারণ শিক্ষিত পাদ্রী এবং সুশিক্ষিত মার্শম্যানের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না । পত্রিকাটি যথাসম্ভব ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় এক গুরুত্ব প্রায় কিছুই ছিল না ।

পরধর্মের হীনতা প্রতিষ্ঠা বা খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করা 'সমাচার-দর্পণ'-এর উদ্দেশ্য না হলেও প্রথমদিকে তাতে এমন কতকগুলি 'প্রেরিত পত্র' প্রকাশিত হয়, যাতে হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতা, কুলীনদের প্রতি কটাক্ষ প্রভৃতি ছিল । এই কারণে বাঙালি পরিচালিত একটি বাংলা সাময়িক-পত্রের অভাব অনেকে অনুভব করেছিলেন। ঠিক এই সময়ে কলুটোলা নিবাসী দেওয়ান তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে মিলে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশে অগ্রসর হন । এই পত্রিকাটির নাম 'সম্বাদ কৌমুদী' এর প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল ৪ ডিসেম্বর, ১৮২১ (২০ অগ্রহায়ণ, ১২২৮) ।

'সম্বাদ কৌমুদী'র ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্গীয় পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদনে স্পষ্ট করে জানান হয়, ধর্ম-নীতি ও রাষ্ট্র-বিষয়ক আলোচনা অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী, দেশ-বিদেশের সংবাদ ও জ্ঞাতব্য তথ্য-সম্বলিত প্রেরিত পত্রাবলী প্রকাশ—এক কথায় লোকহিত সাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের প্রধান লক্ষ্য । পত্রিকার শিরোভাগে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হত :

দর্পণে বদনং ভীতি দীপেন নিকটস্থিতং
রবিনা ভুবনং তপ্তং কৌমুদ্যা শীতলং জগৎ ।।

'সম্বাদ কৌমুদী' প্রতি মঙ্গলবারে, এবং ১৬শ সংখ্যা (১৬ মার্চ, ১৮২২) থেকে মঙ্গলবারের বদলে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হত । যদিও তারাচাঁদ ও ভবানীচরণ প্রথমে পত্রিকার পরিচালক ছিলেন, কিন্তু রামমোহনই ছিলেন প্রধান পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক । ১৮৩৩ সালের জানুয়ারি-এপ্রিল মাসের 'Asiatic Journal'-এ বলা হয়েছে :

The Cowmoody set up by Baboo Ram Mohun Roy[৮]

সুতরাং রামমোহন এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, এই মন্তব্য থেকে সেরকম ইঙ্গিতই পাওয়া

যাচ্ছে। প্রথম দিকে রামমোহন এই পত্রে প্রবন্ধ লিখে সাহায্য করতেন। কিন্তু যখন তিনি সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন তখন তাবাচাঁদ ও ভবানীচরণের সঙ্গে তাঁব মত ও পথের দারুণ পার্থক্য দেখা দিল। ভবানীচরণ ১৩টি সংখ্যা পরিচালনার পর 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পর্ক ত্যাগ করে 'সমাচার-চন্দ্রিকা' নামে রক্ষণশীল মতের সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন, ৫ মার্চ, ১৮২২। কিন্তু তারাচাঁদ দত্তের পুত্র হরিহর দত্তের নামে কৌমুদী চলতে লাগল। অবশ্য নামে না হলেও কার্যত রামমোহনই কৌমুদীর সম্পাদনা পরিচালিত করতেন। মাস তিনেক কৌমুদী চালিয়ে এর আর্থিক ঝুঁকির জন্য রামমোহন সম্পাদনা ত্যাগ করেন এবং গোবিন্দচন্দ্র কোঙার এই পত্রিকার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন ১৪মে, ১৮২২। অবশ্য এর চার মাস পরে কৌমুদী বন্ধ হয়ে গেল। এতে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলে রক্ষণশীলসমাজে এর প্রভাব অতি দ্রুত হ্রাস পেতে লাগল। ইতিমধ্যে ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হলে কৌমুদীর রক্ষণশীল স্বভাবের গ্রাহকের কৌমুদী ত্যাগ করে 'চন্দ্রিকা'র গ্রাহক হলেন। যদিও এর পরেও কৌমুদী একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু এর প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসছিল; ১৮৩৩ সালে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

সিল্ক বাকিংহাম 'Calcutta Journal'-এ 'কৌমুদী'র দু-সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সংবাদের ইংরেজিতে যে চুম্বক দিয়েছিলেন তাতে অনেকগুলি গঠনমূলক প্রস্তাব ছিল। যেমন পনের বছরের হিন্দু বালকদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হলে সমাজের সমূহ ক্ষতি সংবাদপত্রের দ্বারা দেশ ও সমাজের সেবা; শ্রাদ্ধাদি কার্যে অকারণে অর্থের অপচয় নিন্দা এবং সেই অর্থে শিক্ষাব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা; বিচারে জুরি প্রথার প্রবর্তন; স্নানের ও শ্মশানঘাট নির্মাণের জন্য সরকারকে অনুরোধ; বিদেশে বাংলাদেশে চাল রপ্তানি নিষেধের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ চিকিৎসার অভাবে মধ্যবিত্ত রোগীদের অত্যন্ত অসুবিধা; কৌলিন্য প্রথার বিরোধিতা; দুর্নীতিপূর্ণ (immoral) যাত্রাভিনয়ে কলকাতার যুবকদের আকর্ষণের জন্য কঠোর সমালোচনা, বিদ্যাশিক্ষার মূল্য ও উপযোগিতা ঘোষণা; গঙ্গায় মৃতদেহ নিক্ষেপের ফলে জল দূষিত হচ্ছে তা নিষেধের জন্য সরকারকে অনুরোধ; সামরিক বিভাগে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যের মৃত্যু হলে তার স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের ব্যবস্থা আছে, দেশীয় সিপাহীদের জন্যও সেই ব্যবস্থা থাকা উচিত; জ্বালানি কাঠের দাম তিনগুণ বর্ধিত হওয়ায় জনসাধারণের কষ্ট; বালকদের শিরে প্রথমেই ইংরেজি ভাষার ভার না চাপিয়ে তাদের বাংলা শেখানোর জন্য সরকারকে অনুরোধ; জাতিভেদের জন্য হিন্দু সমাজের অধোগতি; হিন্দু বালক ও কিশোরদের শুধু নকলনবিশ ও কেরানিগিরিতে অভ্যস্ত করা নয়, তাদের আধুনিক উদারনৈতিক (liberal) শিক্ষা দান—এই সমস্ত সমাজ ও লোকহিতকর ব্যাপারে সরকারের বিশেস, দায়িত্ব আছে—রামমোহন 'কৌমুদী'তে সেই মর্মে মন্তব্য প্রকাশ করতেন। বাঙালি প্রজা ও ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকদের মধ্যে বোঝাপড়া হওয়া প্রয়োজন নইলে শাসক ও শাসিতের সুসম্পর্ক বজায় থাকে না, রামমোহন একাধিক নিবন্ধে স্পষ্টভাবে তা প্রকাশ করেছেন।

পত্রিকার ভাষাভঙ্গিমা বেশ সহজ সরস ও পরিচ্ছন্ন ছিল। প্রচারধর্মী রচনা ও প্রতিদ্বন্দ্বীর

সঙ্গে বিতর্কে রামমোহন যে ধরনের ভারি এবং সময়ে সময়ে কৃত্রিম ধরনের বাগ্‌বিন্যাস করেছেন, 'কৌমুদী'তে তার চিহ্ন নেই। আসলে সর্বসাধারণের জন্য প্রচারের উদ্দেশ্যে নিবদ্ধ বলে সেকালের সাময়িক পত্রের ভাষা যথেষ্ট সহজ হয়েছে, যদিও গ্রন্থের ভাষায় আড়ষ্টতা রয়ে গেছে।

রামমোহন যতদিন 'কৌমুদীর' সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন ততদিন এই পত্রিকায় প্রগতিবাদী আধুনিক বিষয়সমূহ আলোচিত হয়। রামমোহন তাঁর সাপ্তাহিকে দেশ ও সমাজের হিতকর নানা সংবাদ তথ্য সমস্যা এবং তার সমাধান নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর এই সমস্ত আলোচনায় তাঁর কালের প্রাচীনপন্থী মনোভাবের চেয়ে সতন্ত্র এক যৌক্তিক মানসিকতা এবং বিজ্ঞানমনস্কতা লক্ষ্য করা যায়। 'ব্রাহ্মণ সেবধি' যেমন ধর্মীয় প্রচার ও মিশনারিদের হিন্দু বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়েছিল; কৌমুদী ঠিক সে জাতীয় পত্রিকা নয়। পরবর্তীকালে 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'তত্ত্ববোধিনী'র পূর্বে 'কৌমুদী'তেই প্রথম হিন্দুর একদেবতাবাদের পক্ষে ও সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। ফলে তাঁকে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের আনুকূল্য হারাতে হয়েছিল এবং অচিরেই বন্ধ হয়ে গেছিল। তবে পত্রিকার গুরুত্ব নিরূপণ করে সমালোচক বলেছেন—

> দৃষ্টিভঙ্গির উদারতার জন্য ইংরেজিশিক্ষিত 'নব্যবঙ্গ' সমাজের সর্বমুখী বিকাশে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল ব্যাপক।[১]

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সংযোজন 'সমাচার-চন্দ্রিকা' (১৮২২)। 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত কিছু অভিমতের প্রতিবাদে 'সম্বাদ কৌমুদী'র আবির্ভাব ঘটে, আবার 'সম্বাদ কৌমুদী'র বিপক্ষতার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয় 'সমাচার-চন্দ্রিকা'। রামমোহন 'সম্বাদ-কৌমুদী'তে সতীদাহ প্রথা নিবারণের উদ্দেশ্যে আন্দোলন করেছিলেন সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই ছিল 'সমাচার-চন্দ্রিকা'র প্রধান উদ্দেশ্য। 'সমাচার-চন্দ্রিকা' সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমাবধি তার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার শিরোভাগে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হত :

> সদা সমাচারজুষাং ফলার্পিকা, পদার্থচেষ্টাপরমার্থদায়িকা।
> বিজৃম্ভ তে সবর্বমনোনুরঞ্জিকা শ্রিয়া ভবাণীচরণস্য চন্দ্রিকা।

ভবানীচরণ রক্ষণশীল হিন্দু ছিলেন; তাঁর সম্পাদিত 'সমাচার-চন্দ্রিকা' রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্রস্বরূপ হয়েছিল। এর গ্রাহকসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'সম্বাদ কৌমুদী' এবং 'সমাচার-চন্দ্রিকা'র বাগযুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে সমকালীন বাংলার সমাজজীবনে তীব্র উত্তেজনায় সৃষ্টি করেছিল। এমনকি এই বিবাদের ফলে উভয় পত্রিকাতেই পরস্পরের প্রতি আক্ষেপসূচক অশোভন নিন্দাবাদ প্রচারিত হতে থাকে। ৩০ মার্চ, ১৮২২ তারিখের 'সমাচার-দর্পণ'-এ একজন পত্রপ্রেরক মন্তব্য করেন :

> সম্বাদ কৌমুদীকারক মহাশয়েরা পূবের্ব এক হইয়া কাগজ প্রকাশ করিতেছিলেন পরে ১৪ সংখ্যাতে তাহারা ভিন্ন হইয়া সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা নামে দুই কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব ২ কাগজে

ছাপাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে যেহেতুক সম্বাদ আর সমাচার নামে খ্যাত কাগজ। নানাদেশীয় নানাবিধ নূতন ২ সুশ্রাব্য বিষয় রহিত হইয়া কেবল পরগ্লানিসূচক হইলে নামের বিপরীত হয়।[১৮]

তবে বাদানুবাদের উত্তেজনাই চন্দ্রিকার একমাত্র উপজীব্য ছিল না। বিভিন্ন প্রসঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কে সমকালীন আগ্রহের পরিচয় পত্রিকাটি সার্থকভাবে প্রকাশ করেছে। তবে 'সমাচার-দর্পণ' ও যেমন কোন নির্দিষ্ট সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি যদিও বাংলা সাহিত্যে এক খোলা হাওয়ার উন্মোচন করেছিল; 'সমাচার-চন্দ্রিকা' ও তেমনি কোন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি।

বাংলা ভাষার আর একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছিল 'বঙ্গদূত'। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মে নীলরত্ন হালদারের সম্পাদনায় পত্রটি প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ পত্রটির পরিচালকমন্ডলীর মধ্যে ছিলেন। 'বঙ্গদূত' পত্রের শিরোভাগে নিম্নোক্ত কবিতাটি থাকত —

সংগোপনেল্পবিবৃতিং প্রবদন্তি দূতাঃ সর্ব্বে ন তত্র সুজনা হিতমুভ্যপেতাঃ।
কিঞ্চাখিলার্থকলনাদ্বহুদেশ ভূত প্রাজ্ঞামর়ং বিতনুতে খলু বঙ্গদূতঃ॥

....

অন্যঅন্যদূতগণ, সামান্য যে বিবরণ, সেইমাত্র কহে সংগোপনে।
তাহাতে সচরাচরে, তত্ত্ব না জানিতে পারে, মুগ্ধ রহে মর্ম অন্বেষণে॥
অতএব সাধারণ, সর্ব্বজন প্রয়োজন, স্বদেশ বিদেশ সমুদ্ভূত।
সমাচার সমুচ্চয়, প্রকাশ করিয়া কয়, হিতকারী এই বঙ্গদূত॥

পত্রটিতে সমকালীন বাংলার রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা তথা সর্বমুখী জীবন জিজ্ঞাসার প্রকাশ ঘটেছিল। মানবমনের সর্বাত্মক কৌতূহলের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই ধরনের পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠায় সুলভ। আলোচ্য পর্যায়ে যে জীবনজিজ্ঞাসা নিছক 'তথ্য' এবং 'সংবাদ' রূপে সীমাবদ্ধ ছিল পরবর্তীকালে তাই সাহিত্যগুণান্বিত শিল্পরূপ লাভ করেছে। আর তারই সফল নিদর্শন ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর'।

১৮৩১ সালে ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় 'সংবাদ-প্রভাকর' বাংলায় সাহিত্য-আন্দোলনের এক সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিয়েছিল। প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে বারত্রয়িক, অবশেষে দৈনিকরূপে, 'সংবাদ-প্রভাকর' বাংলার বিকাশশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির উপরে প্রভাকর কিরণ বর্ষণ করেছিল। তবে ১৮৫৩ সাল থেকে ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর একটি মাসিক সংস্করণ প্রকাশ করতে শুরু করেন যা সর্বাংশেই ছিল সাহিত্য পত্রিকা। 'সংবাদ-প্রভাকর' ছিল বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতীক। কলকাতার নবীন ও প্রবীণ উভয় দলই এই পত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাধাকান্ত দেববাহাদুর, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রামকমল সেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, অক্ষয়কুমার দত্ত—সকলেই এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঈশ্বব গুপ্ত এহেন উজ্জ্বল শিষ্যদলেব সাহায্যে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁকে ঘিরে এই যে তরুণ লেখকের দলটি তৈবি হয়েছিল, তাঁদের দ্বারাই আবার পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি অনেকখানি নির্ধারিত

হয়েছিল। এঁরা ছাড়াও প্রভাকরের নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, গৌরশঙ্কর তর্কবাগীশ, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ প্রভৃতি পুরাতনপন্থী পন্ডিতের দল এবং আধুনিক মতাবলম্বীদের মধ্যে নীলরত্ন হালদার, গোপালকৃষ্ণ মিত্র, বিশ্বম্ভর পাইন, গোবিন্দচন্দ্র সেন, কানাইলাল ঠাকুর, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রায়বাহাদুর রামলোচন ঘোষ, হরিমোহন সেন, জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, সীতারাম ঘোষ, গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্যামাচরণ বসু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ শীল, শম্ভুনাথ পন্ডিত। 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতী', 'সবুজপত্র' প্রভৃতি যেমন লেখকগোষ্ঠী তৈরি করেছিল 'সংবাদপ্রভাকর'-এর কীর্তি ছিল তারই পূর্বসূচনা।

ইংরেজি শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চার অনুপ্রেরণা এনেছিল 'সংবাদ-প্রভাকর'। আসলে 'সংবাদ-প্রভাকর' সেকালের বাঙালিকে কয়েকটি বিষয়ে আত্মঅবহিত করতে চেয়েছিল। যার মধ্যে প্রধান আপন সমাজকে ভালবাসা, আপন সংস্কৃতিব প্রতি অনুরাগ এবং সাহিত্যচর্চায় নিরন্তর উৎসাহদান। এই পত্রিকাতেই সচেতনভাবে ঈশ্বর গুপ্ত সমাজপ্রেক্ষণমূলক মানবমুখী কবিতা লিখে পুরনো কাব্যরীতিকে বদলে দিলেন। আধুনিক বাংলা কবিতার যথার্থ জনক ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর অঙ্গনেই তাঁর কবিমনকে উন্মুক্ত করেছিলেন। বলা যেতে পারে, 'সংবাদ-প্রভাকর' পরিবর্তনশীল সমাজের মুখপত্র হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণটি স্মরণ করা যেতে পারে :

> সত্য কথা বলতে কি, একদা 'সংবাদ প্রভাকরই' বাঙালির নিজস্ব পত্রিকায় পরিণত হয়েছিল। সমাচার দর্পণ, সমাচার চন্দ্রিকা—সমস্তই কোনো-না-কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। গুপ্ত কবি ব্রাহ্মসমাজ, বামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হলেও নিজে কোনো বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। নিজে উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' (সাপ্তাহিক, বারত্রয়িক, মাসিক ও দৈনিক) মধ্যমশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত—সকলেরই চিত্তবিনোদন ও জ্ঞানবিবর্ধনে সমর্থ হয়েছিল।[১১]

'সংবাদ-প্রভাকর'-এর সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজি ছাঁদে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু দেশীয় নারীশিক্ষার বিশেষ সমর্থক ছিলেন। সিপাহি যুদ্ধকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি, বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহও তাঁর মনঃপূত হয়নি, কিন্তু তাই বলে রাধাকান্ত দেববাহাদুরের অনগ্রসর অভিমতও মানতে পারেননি, পদ্যে তাঁকেও আক্রমণ করেছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলদের বাড়াবাড়ি এবং ধর্মসভার রক্ষণশীলতা—দুই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব তিনি সমর্থন করতে পারেননি, গুপ্তকবি সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতেন। আসলে ইংরেজি ভাষায় কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকলেও তিনি আধুনিকতার স্বরূপ যথার্থই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যার স্বাক্ষর 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায় যথেষ্ট।

অর্থনীতি, শিল্পবাণিজ্য, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রভাকরেব নবকালচেতনা যে রূপে প্রকাশ পেয়েছে তা সর্বক্ষেত্রে আধুনিকতা ও অগ্রগামিতার মানদন্ডে উত্তীর্ণ না হলেও, নৈরাশ্য ও পশ্চাদমুখী দৃষ্টির বিশেষ আভাসও তার মধ্যে পাওয়া যায় না।

অর্থনীতি বিষয়ে প্রভাকরের রচনাগুলির মধ্যে অতীতকাতর মনোভাবের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। বরঞ্চ তা অনেক বেশি আধুনিক। প্রভাকরের আন্তরিক অভিলাষ ছিল বাংলাদেশে

আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হোক । আধুনিক বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি ও কলকারখানার সাহায্যে পণ্য-উৎপাদনের ও শিল্প বিস্তারের গুরুত্ব তখন অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেননি । কিন্তু প্রভাকর সম্যক উপলব্ধি করেছিল আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা । আমাদের দেশে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও যন্ত্রের অনুশীলন সর্বাগ্রে প্রয়োজন কারণ পশ্চিমের ইংরেজ ও অন্যান্য জাতি বিজ্ঞানবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে সমাজের উন্নতিসাধন করেছে ।

স্বাধীন বাণিজ্য ও যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভাকর দেশবাসীর কাছে বহুবার মুক্তকণ্ঠে আবেদন করেছে । বাংলাদেশে বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও শিল্পোন্নতির পথে অন্তরায় কি তাও স্থিরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখাতে সে কুণ্ঠিত হয়নি । সমুদ্রপথে বিদেশ যাত্রা করা শাস্ত্রমত বিরুদ্ধ বলে এদেশের লোক বাণিজ্যের জন্য ইংল্যান্ডে বা ইয়োরোপে যেতে চান না ; এই হল প্রভাকরের বক্তব্য । এছাড়াও কুলগত ও জাতিগত বৃত্তি ছেড়ে ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করলে জাতিচ্যুত হতে হয় বলে কোনো জাতির লোক স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সাহস পেতেন না । 'সংবাদ-প্রভাকর' কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের স্বার্থে, দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য, এই সামাজিক অনুশাসন অমান্য করার পক্ষপাতী ছিল । প্রভাকর বিত্তশালী বাঙালিদের বাণিজ্য-বিমুখতাও শিল্পোন্নতির পথে অন্যতম বাধা বলে নির্দেশ করেছিল । কারণ সঞ্চিত ধন তাঁরা যক্ষের মতন রক্ষা করে রাখতে চান, তাই অনিশ্চিত মুনাফার লোভে অনির্দিষ্ট কালের জন্য শিল্পক্ষেত্রে তা বিনিয়োগ করার চেয়ে নিশ্চিন্তে কোম্পানির কাগজ কিনে সুদ লাভের দিকেই তাদের আগ্রহ ছিল সুদখোর মহাজনী মনোবৃত্তি বর্জন না করলে এবং অবাধ বাণিজ্যের পথে সমাজের জাতিকুলগত অন্তরায় দূর না হলে বাঙালির সৌভাগ্যের উদয় হবে না । তাই ১৮৫৪ সনের আগস্ট সংখ্যার সম্পাদকীয়তে প্রভাকর লিখছে :

'বাঙালিদিগের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রসাদে বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যশালি হইয়াছেন তাহারা সুদ অর্থাৎ বৃদ্ধির দ্বারা উপার্জন করণেই অধিক যত্নশীল, সুতরাং স্বাধীনরূপে বাণিজ্য করণের নিয়ম এদেশে একেবারে রহিত হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত বাণিজ্য প্রতিযোগী, ঘৃণিত নিয়মাদির উচ্ছেদ না হইবেক সেই পর্য্যন্ত এই বঙ্গদেশবাসি প্রজাবৃন্দের সৌভাগ্যের উদ্দীপক হইবেক না ।'

কেবল অবাধ বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারের জন্য ওকালতি করে প্রভাকর ক্ষান্ত হয়নি । সুযোগ্য শিক্ষিত বাঙালির চাকরির জন্য (বিশেষ করে সরকারী চাকরি) প্রভাকর যথাসাধ্য লেখালেখি করেছে । শিল্পবাণিজ্য ধনিক ও বণিক বাঙালির জন্য, সরকারী চাকরি শিক্ষিত বাঙালির জন্য । তাই প্রভাকর লিখেছে :

'যে পর্য্যন্ত আমাদিগের রাজপুরুষেরা সম্ভ্রান্ত রাজকীয় পদে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য লোকদিগকে নিযুক্ত করণের নিয়ম নির্ধারণ না করিবেন এবং সাধারণে স্বাধীন রূপে বাণিজ্য করনে প্রবৃত্ত না হইবেন তদবধি, এই বঙ্গরাজ্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবেক না ।'

(সম্পাদকীয়, নভেম্বর ১৮৫৩)

এদেশের কৃতবিদ্য লোকদের 'সম্ভ্রান্ত রাজকীয় পদে' নিয়োগের জন্য প্রভাকর সর্বপ্রকারে সরকারের কাছে আবেদন করেছে । তার জন্য একাধিকবার 'বেঙ্গল হরকরা' প্রভৃতি ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রের সঙ্গে তার প্রচন্ড মতবিরোধও হয়েছে ।

ধনিক মালিকের পোষকতায় প্রভাকর দীর্ঘকাল পরিচালিত হলেও, দেশের ধনিকশ্রেণীর নির্লজ্জস্তাবকতা সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত অথবা তাঁব উত্তরাধিকারী কখনো করেননি। বহু রচনার মধ্যে বাংলার কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি প্রভাকরের গভীর সমবেদনা ফুটে উঠেছে। চব্বিশ-পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন করে প্রজাদের প্রতি অবিচার করায় চার-পাঁচশ কৃষক লাঙল কাঁধে করে গভর্ণমেন্ট হাউসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। এ বিষয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে প্রভাকর কৃষকদের দাবি সমর্থন করেছে এবং লিখেছে :

'দুঃখি কৃষাণরা অতিশয় যন্ত্রণা না পাইলে কদাচ এতদূর পর্য্যন্ত আদ্দাঁস করণে সাহসবিশিষ্ট হইত না।' (২৩ ফাল্গুন, ১২৫৮ সন)

কৃষকদের প্রতি তো বটেই দেশের জনসাধারণের প্রতিও প্রভাকরের সহানুভূতিশীল সমদৃষ্টির অভাব ছিল না। সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ প্রভাকরের পৃষ্ঠায় সম্পাদকের শক্তিশালী লেখনীতে প্রায়ই মুখর হয়ে উঠত। গভর্ণমেন্ট একটার পর একটা কর (Tax) চাপিয়ে রাজস্ববৃদ্ধির চেষ্টা করছেন দেখে প্রভাকর তার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে লেখে :

'এইক্ষণে বাড়ীর কর, গাড়ীর কর, পথের কর, গুদামের কর, লবণের কর, ষ্ট্যাম্পের কর প্রভৃতি বিবিধপ্রকার কর স্থাপন করিয়া রাজ্যেশ্বরের সহস্রকর প্রভাকরের ন্যায় ক্লেশকর প্রচন্ডকর বিস্তারপূর্ব্বক প্রজানিকরের শোণিত শোষণ করিয়া দুঃখাকর হইতেছেন, তাহার উপর আবার এই নূতন প্রকার কর গ্রহণের নিয়ম হইলে প্রজাদিগের ক্লেশের সীমা থাকিবেন না।' (২৫ আগস্ট, ১৮৫৯)

এরকম নির্ভীক শ্লেষাত্মক সমালোচনা করা প্রভাকরের পক্ষেই তখন সম্ভব ছিল।

নীলকরের অত্যাচার সম্পর্কে যে আলোচনা 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ পাওয়া যায় তা বিশেষ মূল্যবান। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও প্রভাকর অবিশ্রান্ত লেখনী চালনা করেছে। ব্রিটিশ শাসন ও বিচার ব্যবস্থা এই অত্যাচার দমন করতে একেবারে অক্ষম হয়। 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর মতে তার কারণ :

'নীলকরদিগের মধ্যে অনেকেই ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষের হস্ত ধরিয়া সেকেহ্যান করেন, ...ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ঘরের লোক বোধ করিয়া থাকেন।' (২.৩.১২৫৫)

'দুঃখী প্রজাদের বেগার ধরিয়া নীল বীজ বপন করিয়া, বলের দ্বারা জমিদারের জমিতে চাষ করিয়া লাঠির বলে তাহা কাটিয়া লওয়া হইত। এই সব নীলকরের মকদ্দমায় পক্ষপাত প্রভৃতি অনাচার গভর্ণমেন্ট বিশেষ লক্ষ্য করার প্রয়োজন করেন নাই.....কতকগুলি দুর্বল চোর-ডাকাত ধরিলেই কি রাজ্যশাসিত হয়।' (৪.৭.১২৬১)

'নীলপ্রধান প্রদেশের মধ্যে প্রজাদের অবস্থা আমেরিকার ক্রীতদাসদের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিতে হইবে।' (৩০.৩.১৮৬৪; ১৮.১২.১২৭০)

সমাজসংস্কারের ব্যাপারে প্রভাকরকে উদার মধ্যপন্থী বলা যেতে পারে। যেমন বিধবাদের পুনর্বিবাহ 'সংবাদ-প্রভাকর' সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য মনে না করলেও কেবল শাস্ত্রীয় অজুহাতে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলেও মনে করেনি। ১২৬৩ সন, ১ মাঘ তারিখে প্রকাশিত 'স্ত্রীশিক্ষা তথা বিধবাবিবাহ' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে যে সমাজের প্রকৃত সংস্কারের জন্য আগে

বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, না স্ত্রীশিক্ষা প্রয়োজন ? প্রশ্নের বিচার করে বলা হয়েছে যে স্ত্রীশিক্ষার সুব্যবস্থা করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন । প্রভাকর বরাবরই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিল । বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর প্রভাকর সানন্দে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে ৭ মে, ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত 'স্ত্রীবিদ্যা' প্রবন্ধে ।

নব্যশিক্ষার সৌধ মাতৃভাষার দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভাকর অবিরাম সংগ্রাম করেছে । কোন ভাষায় এদেশে লোককে শিক্ষা দেওয়া উচিত, ইংরেজিতে না বাংলায়, এ বিষয় নিয়ে যখন দেশি-বিদেশি শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলছে, প্রভাকর তখন মুক্তকণ্ঠে মাতৃভাষার সপক্ষে প্রচারে প্রবৃত্ত হয় । 'বহুশাস্ত্রজ্ঞ সুবিজ্ঞোতম' রেভারেন্ড জে. লঙ সাহেব এদেশের ভাষা ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে সর্বত্যাগী হয়ে দিবারাত্র পরিশ্রম করছেন বলে প্রভাকর-সম্পাদক তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন :

'যৎকালীন আমরা ভিন্নদেশীয় কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ভিন্নদেশের কোন উপকারের কার্য্যে বিশেষ উৎসুক দেখিতে পাই, আহা । তৎকালীন আমাদিকের অন্তঃকরণ কি এক অদ্ভুত আহ্লাদ মিশ্রিত কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইতে থাকে ।' (১৮ জানুয়ারি, ১৮৫১)

বাংলাভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসারের পথে প্রধান অন্তরায় । এজন্য প্রভাকর বাংলাভাষায় বিদেশি গ্রন্থের অনুবাদের জন্য বারবার ব্রিটিশ সরকার ও শিক্ষিত বাঙালিদের কাছে আবেদন করেছে । কিন্তু অনুবাদ করার মতন ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সুপন্ডিত ব্যক্তি কোথায় ? এই প্রসঙ্গে প্রভাকর পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ করে লিখেছে 'সংস্কৃত, বঙ্গ ও ইংরেজী ভাষায় অতি সুনিপুণ' এই একব্যক্তিই এই কাজের যোগ্য হতে পারেন ।

প্রভাকর বার বার আবেদন করেছে এই বলে যে গভর্ণমেন্ট ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাগ্রে কর্তব্য, দেশীয় ভাষায় উন্নতিসাধন করা । ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় যে রকম উপাধি পরীক্ষার রীতি আছে, বাংলা ভাষাতেই সেই রীতি প্রচলিত হওয়া আবশ্যক । তাহলে দেশের মানুষ মাতৃভাষায় অধিকতর আগ্রহী হবেন । মাতৃভাষার সমৃদ্ধির জন্য প্রভাকরের এই আন্দোলন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মর্তব্য ।

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় এ সব বিষয় ছাড়াও আরও নানারকমের সংবাদ ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে । এছাড়াও বাংলাদেশের লুপ্তপ্রায় কবিজীবনী ও কবিসংগীত সংগ্রহের জন্য ১৫ জুলাই, ১৮৫৪ ঈশ্বর গুপ্ত 'এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির প্রতি' নিম্নোক্ত আবেদনটি প্রকাশ করেন :

'এতদ্দেশীয় যে সকল প্রাচীন কবি মহাশয়েরা বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রণীত পুরাতন কবিতা ও সঙ্গীত সকল এবং সেই সেই পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া যিনি আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা মহোপকার স্বীকার পূর্ব্বক যাবজ্জীবন তাঁহার স্থানে কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ রহিব এবং তাঁহাকে দেশহিতৈষি দলের প্রধান শ্রেণীমধ্যে গণ্য করিব ।'

এভাবেই কবিগান, আখড়াই গান, হাফ-আখড়াই, পাঁচালি, টপ্পা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত

তথ্য সংগ্রহ করে কবিজীবনীসহ অনেকগুলি নিবন্ধ লিখেছিলেন, যা আজও তৎকালীন যুগ-সাহিত্যের দৃষ্টান্তস্থল হয়ে আছে। তিনি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, কবিওয়ালা, হাফ-আখড়াই গায়ক, পাঁচালীকার, টপ্পা রচনাকার প্রভৃতি সম্বন্ধে এখন সমস্ত দুষ্প্রাপ্য তথ্য উদ্ধার করে গেছেন যে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসকার বলা যেতে পারে। কতকগুলি বিষয়ে তাঁর সংগৃহীত তথ্য ছাড়া এখনও নতুন কোনো তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তিনি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ না করলে উনিশ শতকের একটা প্রধান সাহিত্যশাখা বিলুপ্ত হয়ে যেত।

'সংবাদ প্রভাকর'ই প্রথম বাঙালি জীবনে স্বাজাত্যবোধের প্রেরণা এনে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বিশ্লেষণটি অবশ্য স্মরণীয় :

> 'সংবাদ-প্রভাকর' গুপ্তকবির এই জাতিপ্রেম এবং স্বাভিমান-বোধকে উগ্ররূপে বাংলার সমাজজীবনে ছড়িয়ে দিয়েছিল। 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর যুগ থেকেই বাঙালি সমাজ চেতনায় অন্য নিরপেক্ষ জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-বোধেরই ক্রমপরিণাম। এমনি করেই 'সংবাদ-প্রভাকর' এবং 'গুপ্তকবি' ঈশ্বর গুপ্ত অনাগত জীবন পথের একটি বৃহৎ সম্ভাবনাকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন।[১২]

ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা গদ্যরীতিতে লঘু সুরের আমদানি করেছিলেন। বাংলাভাষাকে সংস্কৃতের জটিলতা থেকে মুক্ত করে তাকে স্বচ্ছ করে তুলেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। ভবানীচরণ 'নববাবু-বিলাসে' যে ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন পরবর্তীকালে তাই আলালি রীতির জন্ম দেয়। কিন্তু এর মাঝখানে বাংলা গদ্যের বন্ধন মুক্তির পিছনে 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর অবদান কম ছিল না। স্বয়ং, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন —

'ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্তাকর্তা বিধাত ছিলেন, প্রভাকর বা-ঙ্গালা রচনা রীতিও অনেকটা পরিবর্তন করিয়া যান।' (ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহের ভূমিকা)

'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা রচনাবীতির যে পরিবর্তন করে তা হল বাংলা গদ্যে শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি অলংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগ। তাছাড়াও তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশি শব্দ, স্ল্যাং এবং প্রবাদের সংমিশ্রণ। বাংলা গদ্য হয়ে উঠল অনেক বেশি জীবনের ঘনিষ্ঠ। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একে বলেছেন 'গদ্যের জড়তা মুক্তি' (উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৮৫)।

'সংবাদ প্রভাকর'-এর এই জড়তাবিহীন গদ্যরীতি উদাহরণ হল—

> 'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা একে মনসা তাহাতে আবার ১৮৫০ সালের ক্ষমতাবৃদ্ধি আইনরূপ ধুনার গন্ধ পাইয়া একেবারে নাচিয়া উঠিয়াছেন।' (৬.৫.১২৬১)

শুধু তো ভাষার ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য সৃষ্টির একটি সুশৃঙ্খল পরিমন্ডল রচনা করে 'সংবাদ প্রভাকর'।

বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে সকৃতজ্ঞ চিত্তে সেকথা স্মরণ করেছেন —

'আর একটি ধরণ ছিল যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা এসকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়।'

(ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহের ভূমিকা)

বাংলাভাষার অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরে শিক্ষানবিশ ছিলেন। বঙ্কিমের সুললিত গদ্য রচনার নির্দেশপত্র 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে বর্তমান। বঙ্কিমের মতন দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখের কবিপ্রতিভার প্রাথমিক বিকাশক্ষেত্র ছিল 'সংবাদ প্রভাকর'।

সাময়িকপত্র বিষয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদ-প্রভাকর'কে 'সে যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র'[১৩] বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং সেই পথে অগ্রসর হয়ে তাকে রূপদান করার কোনো প্রচেষ্টা না থাকায় 'সংবাদ প্রভাকর' কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি।

'জ্ঞানান্বেষণ' এ যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। ১৮৩১খ্রিষ্টাব্দের ১৮ জুন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন। এটি ছিল ইয়ংবেঙ্গলদের মুখপত্র। প্রথম সংখ্যার 'অনুষ্ঠান'-এ পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল—

'সংপ্রতি এতন্মাহানগরে নানাবিধ সমাচারপত্র দ্বারা নানা দেশীয় সমাচার প্রচার হইতেছে তাহাতে এই পত্র প্রস্তুত করা কেবল নানা দেশীয় গুহ্যাগুহ্য বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার নিমিত্তে এমত নহে পরন্তু অন্য প্রয়োজন অনেক আছে।

এক প্রয়োজন এই যে এতদ্দেশীয় বিশিষ্ট বংশোদ্ভব অনেক মহাশয়েরা লোকের প্রপঞ্চ বাক্যেতে প্রতারিত হইতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের কোনরূপেরই ভাল হইবার সম্ভাবনা না দেখিয়া খেদিত হইয়া বিবেচনা করিলাম যে নানা দেশ প্রচলিত বেদবেদান্ত মনুমিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনাদ্বারা তাঁহারদিগের ভ্রান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয়তঃ এই যে এতদ্দেশনিবাসি অনেকেই আপন জাতিবিহিত ধর্ম্মের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলে যথাশাস্ত্রানুসারে কহিয়া থাকেন কিন্তু সেই মহাশয়েরা এমত কর্ম্ম করেন যে তাহা কোন বিশিষ্ট লোকেরই কর্ত্তব্য নহে ইহার কারণ কি তাহাও বিবেচনা করিতে হইবেক।

তৃতীয়তঃ এই যে ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ যদ্যপি এতদ্দেশে দেশান্তরীয় ও বঙ্গদেশীয় ভাষায় নানাপ্রকারে প্রকাশ হইয়াছে তথাপি সে অতিবিস্তারিত রূপে প্রচার হয় নাই অতএব সকলের আশু বোধের নিমিত্তে সেই সকল গ্রন্থ আমরা বঙ্গদেশীয় ভাষায় ক্রমে প্রকাশ করিব। এবং অন্য বিষয় যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক তাহাও উপস্থিতানুসারে প্রকাশ করিতে ত্রুটি কবিব না ইতি।'

পত্রিকাটি ছিল উদারপন্থী তরুণদের পত্রিকা। এ কারণেই সেকালের সকল প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলন এবং সংস্কার কর্মে এই পত্রের উৎসাহ ছিল সমধিক। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কিছুদিন 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের বাংলা বিভাগের সম্পাদনা করেছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় 'জ্ঞানান্বেষণ' তৎকালীন নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপন প্রগতিশীল আধুনিক অভিমতকে ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রায় দশ বছর এই পত্রিকা শিক্ষিত বাঙালির নেতৃত্ব করেছিল, যদিও গ্রাহক সংখ্যা বেশি ছিল না। নানা কারণে পরিচালকবর্গ কার্যান্তরে ব্যাপৃত হয়ে পড়লে পত্রিকার প্রচার বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিতে হয়। শ্রদ্ধেয় সমালোচক অধ্যাপক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে :

এটি বাঙালির সাংবাদিকতার ইতিহাসেব দুর্ঘটনাই বলতে হবে ।[১৪]

এই পত্রিকার বাংলা রচনার মধ্যে যে পরিমাণ সামঞ্জস্য ও পাকা হাতের স্পর্শ পাওয়া যায় তার সমস্ত গৌরব প্রাপ্য গৌরীশঙ্ক র ভট্টাচার্যের । ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত তিনি 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর সঙ্গে যুক্ত থেকে এর যাবতীয় বাংলা কার্য নির্বাহ করতেন । সংযত ও পরিমিত ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গিতে 'জ্ঞানান্বেষণ' যে মানসিক উদারতার সঞ্চার করেছিল বাংলার নব্যযুবকদের অন্তরে তার মূল্য ছিল সুদূর-প্রসারী ।

এই প্রসঙ্গেই 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রটির উল্লেখ প্রয়োজন । লন্ডন থেকে ১৮২৮ সালে প্রকাশিত 'Spectator' সাপ্তাহিক পত্রটি রবার্ট স্টিফেন রিন্টাউল সম্পাদনা করেছিলেন । সম্ভ বত তারই অনুসরণে নব্যযুবকেরা ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসে রামগোপাল ঘোষের সম্পাদনায় দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন । এদের এই পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ছিল "রীতি ব্যবহারের উত্তমতা এবং বিদ্যা, কৃষিকর্ম ও বাণিজ্যাদির বৃদ্ধি আর রাজ্যশাসন কার্যের সুনিয়ম হইয়া প্রজাদিগের সর্বপ্রকারে উন্নতি বিধান ।" যদিও তখন এদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রায় কিছুই ছিল না এবং ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণের দল ইংরেজ শাসকের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু দেশ ও সমাজের হিতসাধনই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য তা তাঁরা প্রথম সংখ্যাতেই বিশদভাবে বর্ণনা করেছিলেন । ১৮৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই পত্রিকা মাসিক থেকে পাক্ষিকে এবং ১৮৪৩ সালের মার্চ মাস থেকে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয় । এই সময়ে দাসপ্রথার বিরোধী নেতা ও ভারতপ্রেমিক জর্জ টম্পসন দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে কলকাতায় আসেন এবং নবীন ছাত্রদের সঙ্গে পরিচিত হন । তাঁর উত্তেজনামূলক বক্তৃতা নিয়মিতভাবে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এ প্রকাশিত হত । ফলে এই নব্যযুবকের দল রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং ইংরেজের সদিচ্ছার প্রতি মোহ থেকে ক্রমে ক্রমে মুক্তি পেলেন । সম্পাদক রামগোপাল ঘোষ এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করেছিলেন এবং উত্তপ্ত বাগ্মিতার দ্বারা শিক্ষিত সমাজে রাজনৈতিক অধিকারবোধ সঞ্চারিত করেছিলেন । অবশ্য অর্থাভাবে পত্রিকাটিকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখা যায়নি এছাড়াও গ্রাহকসংখ্যা খুব পরিমিত ছিল, সাধারণ মানুষ 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এর বড় একটা আগ্রহী ছিল না । তাই স্পেকটেটরের সর্বশেষ সংখ্যায় (১৮৪৩ সালের ২০ নভেম্বর) অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লেখা হয় 'যে অভিপ্রায়ে এ পত্র সৃষ্টি অর্থাৎ এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকে পাঠ করিবে এবং সকলে নানা বিষয়ের উপর লিখিবে তাহা হইল না ।' সুতরাং একটা মহৎ প্রচেষ্টার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গেল । কিন্তু এই পত্রে সমাজ, শিক্ষা ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে যে সমস্ত প্রখর সমালোচনা প্রকাশিত হত তাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমশ জীবনের বাস্তব পরিপেক্ষিত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন । শিক্ষিত মানুষকে স্বাদেশিকতাবোধে উদ্বোধিত করাও ছিল এই পত্রিকার অন্যতম ভূমিকা ।

১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মুখপত্ররূপে প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় ঘটনা । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন :

বেদ বেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করা আমার যে মুখ্য সংকল্প ছিল, তাহা এই

পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল।[১০]

সুতরাং ১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট (১৭৬৫ শকের ১ ভাদ্র) 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করল। দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী'কে সম্পূর্ণ ধর্মমূলক পত্রিকা করে তুলতে। প্রথম সংখ্যা থেকেই 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ১২ বছর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। মূলত ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র রূপে ধর্ম সম্পর্কীয় তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য মহর্ষি এই পত্রিকার পরিকল্পনা করলেও অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় এটি আধুনিক আলোচনারও বাহক হয়ে উঠল, শুধু ধর্মতত্ত্ব ও সাধনার মধ্যে বন্দী হয়ে রইল না, শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের চিন্তা ও চেতনাকে নানা দিকে প্রবাহিত করেছিল।

আধুনিক বাস্তব জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বাসী অক্ষয়কুমারের পরিচালনায় 'তত্ত্ববোধিনী'র অন্যতম আদর্শ ছিল প্রগতিশীল সমাজসংস্কার। হিন্দু বিবাহপ্রথার সংস্কার সাধনে, বিধবাবিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদিব সপক্ষে; বহুবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতির বিপক্ষে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করেছে। এই সংগ্রামে অক্ষয়কুমারের পাশে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কার কর্মে অবতীর্ণ হয়েছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী' সভা ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার ভেতর দিয়ে। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার ঐতিহাসিক গৌরব হল প্রথম এই পত্রিকাতেই বিদ্যাসাগর 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না' প্রস্তাবটি প্রকাশ করেছিলেন ১৭৭৬ শকের ১৩৯ সংখ্যায়। এর ঠিক পরবর্তী সংখ্যায় ১৭৭৬ শকের ১৪০ সংখ্যায় অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী'তে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে প্রস্তাব সমর্থন করেন। 'নিরবচ্ছিন্ন যুক্তিপথ আশ্রয়' করে তিনি বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করতে অগ্রসর হন।

বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হলে (অক্টোবর, ১৮৫৫) তার 'উপক্রম' ও 'উপসংহার' ভাগ মন্তব্যসহ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় উদ্ধৃত হয় অগ্রহায়ণ, ১৭৭৭ শক, ১৪৮ সংখ্যায়। তার শেষে বলা হয়—

'বিধবা স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ নিরবলম্ব যুক্তি অনুসারে সর্ব্বতোভাবেই কর্তব্য, তাহা সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রানুসারেও সম্পূর্ণ বিধেয় বলিয়া অবধারিত হইল। অতএব এক্ষণে উহা প্রচলিত করিয়া তাহাদিগের অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা ও ঘোরতর পাতকরাশি নিবারণ করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নহে।'

সুতরাং বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহে আন্দোলনে প্রধান সহায় ছিল 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা। যে সময় আন্দোলন আরম্ভ হয়, অর্থাৎ ১৮৫৫-৫৬ সালে, তখন বাংলা পত্রিকা ক্ষেত্রে প্রগতিশীল সংস্কারকামী পত্রিকার অভাব ছিল। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা শুধু যে সেই অভাব পূরণ করেছিল তা নয়, বিদ্যাসাগর যুগের সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে, প্রায় একক সংগ্রামের দ্বারা অগ্রগামী ও খরস্রোতা হতে সাহায্য হতে সাহায্য করেছিল। বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ আইন পাস হবার পরেও 'তত্ত্ববোধিনী' এই সংস্কারকর্মের গতির প্রতি লক্ষ্য রেখেছে এবং প্রত্যেকটি বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠাবার্তা অভিমতসহ স্থান পেয়েছে। শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের প্রথম বিধিসম্মত বিধবাবিবাহের সংবাদ (৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৬) এবং পরদিন পানিহাটি নিবাসী মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে কলকাতার ঈশানচন্দ্র

মিত্রেব দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যার বিবাহ-সংবাদ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (পৌষ ১৭৭৮ শক, ১৬ সংখ্যা) দীর্ঘ আলোচনাসহ মুদ্রিত করে ।

বিধবাবিবাহের সপক্ষে যেমন, বহুবিবাহ ও কৌলিন্যপ্রথার বিপক্ষেও তেমনি 'তত্ত্ববোধিনী' লেখনী ধারণ করেছে । স্ত্রী জাতির অধিকার, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা, সুরাপান-নিবারণ ইত্যাদি বিষয়েও 'তত্ত্ববোধিনী' অবিরাম সংগ্রাম করেছে । প্রকৃতপক্ষে কোন প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের পক্ষ সমর্থন করতে কখনও সে দ্বিধাবোধ করেনি ।

স্বদেশানুরাগ ছিল 'তত্ত্ববোধিনী'র সামাজিক আদর্শের মূলপ্রেরণা, তাই নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর বিজাতীয় ভাবধারা, আচার-ব্যবহার ও ধ্যানধারণা ছিল তার একান্ত অনভিপ্রেত । 'সমাজ সংস্কার (কার্তিক ১৭৮৯ শক) নামক প্রবন্ধে স্বদেশানুরাগের কথা সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে । নব্যশিক্ষিতরা পাশ্চাত্যসমাজের যে সভ্যতার আদর্শপ্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছিলেন তাকেই 'কাকের ময়ূর-সজ্জবৎ' সভ্যতা বলে উক্ত প্রবন্ধে আখ্যা দেওয়া হয়েছে । তথাকথিত স্বদেশানুরাগের বশবর্তী হয়ে যাঁরা বাছা বাছা মন্দগুলিকেও স্বদেশী ঐতিহ্যের মুকুট পরিয়ে লোকসমক্ষে তুলে ধরেন 'তত্ত্ববোধিনী' সেই বিচারবোধশূন্য হিতাহিতজ্ঞাশূন্য স্বদেশানুরাগের সমর্থক ছিল না । তাই উক্ত প্রবন্ধেই বলা হয়েছে—

'আমরা এরূপ বলিতেছি না যে স্বদেশানুরাগে অন্ধ হইয়া স্বদেশের দোষ দর্শন পরান্মুখ হইয়া থাক; সেরূপ কথা যথার্থ স্বদেশানুরাগীর লক্ষণ নহে ।'

'স্বদেশানুরাগ' প্রবন্ধেও আবার পরিষ্কার করে স্বদেশচিন্তার স্বাভাবিক রূপটিকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা হয়েছে—

'এক্ষণে বিদ্বান লোকদিগের মনে স্বদেশানুরাগের ক্রমশ উদ্দীপন দেখিয়া হৃদয় পুলকে পূর্ণ হইতেছে । কিন্তু যে পর্যন্ত না আমাদিগের জাতীয় উন্নতি সম্পূর্ণরূপে জাতীয় আকার ধারণ করে সে পর্যন্ত আমাদিগের সুস্থির হইবার কোন কারণ নাই ।'

বলা যেতে পারে স্বদেশচিন্তার ক্ষেত্রেও 'তত্ত্ববোধিনী'র বলিষ্ঠ যুক্তি ও সত্যপ্রকাশের সৎসাহস দেখে বিস্মিত হতে হয় ।

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে 'তত্ত্ববোধিনী'-র মূল্যায়ন প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় গবেষক ও সমালোচক বলেছেন :

> 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) ও 'ভারতী' (১৮৭৭) প্রকাশিত হবার পূর্বে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা (১৮৪৩) অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল ।[১৬]

'বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল' (রবীন্দ্রনাথ) ঠিক, কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'-এর অশুভ আবির্ভাবকে সম্ভাব্য করে তুলেছিল 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা, একথাও যথার্থ । 'বঙ্গদর্শন'-এর যুগে প্রতিভাশালী লেখকদের রচনা যেমন তার পৃষ্ঠা অলংকৃত করত, তেমনি 'তত্ত্ববোধিনী' যুগেও অসাধারণ শক্তিশালী লেখকদের রচনাই পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করত । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ মনীষীরা দীর্ঘকাল 'তত্ত্ববোধিনী'-র নিয়মিত লেখক ছিলেন । 'তত্ত্ববোধিনী' প্রথম বাংলা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা প্রকাশ করেছিল । মাইকেল দত্তের বিখ্যাত 'আত্মবিলাপ' কবিতা (আশ্বিন, ১৭৮৩ শক, ২১৮

সংখ্যা) এবং রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রথম প্রকাশের সাহিত্যিক গৌরব 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাব প্রাপ্য তো বটেই; বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত জ্ঞানগর্ভ রচনা প্রকাশের কীর্তি ও খ্যাতিও তার বাংলা সাময়িকপত্রের মধ্যে সর্বাগ্রে প্রাপ্য।

অক্ষয়কুমারের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক স্মরণীয় গ্রন্থটি 'তত্ত্ববোধিনী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা' শীর্ষক রচনাটিও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে তিনটি মাসিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'বিজ্ঞান' ও 'বিজ্ঞাবার্তা' শিরোনামে ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে রচনা 'তত্ত্ববোধিনী'-র পৃষ্ঠায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। এমনকি ১৮৭৩ সালের পত্রিকাতে দেখা যায়, যে নৃতত্ত্ব বিষয়ে 'মানুষের ক্রমবিকাশ' (Evolution of man) সম্বন্ধে রচনা আদিম মানুষের করোটি-চোয়াল ইত্যাদির চিত্রসহ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে (১৭৯৫ শক, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ইত্যাদি)। এর মাধ্যমেই বোঝা যায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির ব্যাপকতা ও গভীরতা। বাংলা ভাষাকে সকল বিষয় আলোচনা উচ্চ স্থান নির্ধারণের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব। বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক ড. ভবতোষ দত্তের মতে :

> তত্ত্ববোধিনীতেই বাংলা সাহিত্যের উঁচুমান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম।[১৭]

ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রেও 'তত্ত্ববোধিনী' আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করেছিল। ইতিহাস আলোচনার ধারা যে পরিবর্তন করা প্রয়োজন এ চেতনা সম্প্রতি ইতিহাস অনুরাগীদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে। ইংরেজদের প্রয়োজনে ও তাদেরই শিক্ষার ফলে আমরা কালানুক্রমিক রাজবংশবৃত্তান্ত লিখতে অভ্যস্ত হয়েছি, যার জন্য দেশের ও দশের ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতা ক্রমেই আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা লিখছে :

'আমাদের এক্ষণকার সর্ববিদ্যাশালী ব্যক্তিগণ অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত ইঙ্গলন্ড- ফ্রান্স ও আমেরিকার ইতিহাস ও ভূগোল বৃত্তান্ত তন্ন তন্ন করিয়া অধ্যয়ন ও শিক্ষা করেন কিন্তু তাঁহাদের বীরভূম অথবা বাঁকুড়া জেলার কোন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কিছুই বলিতে পারিবেন না।' (ইতিহাস সংগ্রহ, ১৭৬৪ শকাব্দ)

তাই দৃষ্টান্তস্বরূপ হিজলী অঞ্চলের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত প্রকাশ করা হয়েছিল (১৭৬৪ শক, ভাদ্র,আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৭৬৫ শক বৈশাখ) 'হিজলীর বৃত্তান্ত' নামে। ইতিহাসের এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। কেবল অধীত বিদ্যার সাহায্যে এই ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়, তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সরেজমিনে অনুসন্ধানও আবশ্যক। নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস এই তিন বিদ্যার মহামিলন না হলে এই ইতিহাস রচনা সার্থক হয়ে ওঠে না। প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে 'তত্ত্ববোধিনী'-র এই ইতিহাস পর্যালোচনা রীতিমতো বিস্ময়ের উদ্রেক করে। শ্রদ্ধেয় গবেষক শ্রীবিনয় ঘোষের মতে :

> জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস সর্বক্ষেত্রে এরকম যুগসম্মত পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রকাশ, সেযুগে তো বটেই, এ যুগেও বাংলা সাময়িকপত্রের ক্ষেত্রে সহজলভ্য নয়।[১৮]

'তত্ত্ববোধিনী'র গদ্যভাষাও ছিল ঋজু ও স্বচ্ছন্দ। বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে গদ্যের

আদর্শ তৈরি করেছিল 'তত্ত্ববোধিনী', যদিও তার পেছনে ছিল অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীর বিদগ্ধ লেখনী। বাংলা গদ্যের আসন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী'-তে। 'তত্ত্ববোধিনী'তে বিভিন্ন লেখকের লেখা প্রকাশিত হলেও স্টাইল বা গদ্যরীতির মৌলিক তফাৎ খুব একটা দেখা যায় না। বাংলা গদ্যে পদলালিত্যের সুরঝঙ্কারের সঙ্গে হৃদয়াবেগের প্রথম প্রকাশ ঘটে 'তত্ত্ববোধিনী'-র গদ্যে। যদিও সেই গদ্যের স্রষ্টা দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর, যেমন দেবেন্দ্রনাথের একটি রচনা 'নিশীথের ব্রহ্মস্তোত্র' থেকে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে —

'হে সর্ব্বশক্তিমৎ পরমাত্মন। প্রাতঃকালের সুমন্দ সমীরণে, মধ্যাহ্ন সময়ের উজ্জ্বল সূর্য কিরণে তোমার মঙ্গল কিরণ বিকীর্ণ হইয়া যেমন মেদিনীর অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করত তোমার মহিমাকে মহীয়ান করিয়াছে, এই ঘোর নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর রজনীতেও সেইরূপ তোমার যশঃ কুসুম প্রস্ফুটিত, হইয়া চতুর্দ্দিক শোভা ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিতেছে।' (শ্রাবণ ১৭৮৪ শক)

এই সুবিন্যস্ত ও সুপরিচ্ছন্ন গদ্য শুধু দেবেন্দ্রনাথের নয় 'তত্ত্ববোধিনী'-র সকল রচনাতেই লভ্য।

'তত্ত্ববোধিনী' বাংলা সাময়িকপত্রের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি করেছিল। ইংরেজি শিক্ষিত নব্যবুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বাংলা সংবাদপত্র সম্পর্কে অবজ্ঞা ছিল। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় নানা উচ্চাঙ্গের বিষয় স্থান পাওয়াতে ইংরেজি শিক্ষিত সমাজেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন —

'ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল পীড়াজনক বিষয় বাহির হইত যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল তখন তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন।'

(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ১৯৯-২০০)

এইভাবেই 'তত্ত্ববোধিনী' ধর্মসম্প্রদায়ের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়েও সমকালের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠেছিল।

আচার্য সুকুমার সেনের 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পর্কিত মূল্যায়নটি যথার্থ—

> ১২৫০ সালের (১৮৪৩) ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া সাময়িকপত্রের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করিল। সম্পাদক হইলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। ধর্মব্যাখ্যান ছাড়া ইহাতে নীতিগর্ভ বিজ্ঞানবিষয়ক এবং অধ্যাত্মতত্ত্বঘটিত জ্ঞানোদ্দীপক প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। সরল সহজবোধ্য রচনাগুলি বাঙ্গালা গদ্যে দৃঢ়তা ও স্পষ্টতা আনিল। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকের রচনামন্ডিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাঙ্গালা সাময়িকপত্রের যে আদর্শ স্থাপন করিল, পরে তাহাই বিবিধার্থসংগ্রহ-বঙ্গদর্শন-ভাবতীতে অনুসৃত হইয়াছিল।[১৯]

অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—

> তত্ত্ববোধিনী ও বঙ্গদর্শন আধুনিক বাঙালির যথার্থ আত্মদর্শনরূপে গৃহীত হতে পারে।[২০]

'তত্ত্ববোধিনী'-র পর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১) অন্যতম বিশিষ্ট পত্রিকা। পত্রিকাটির উদ্দেশ্যই ছিল সুরুচির মান বজায় রেখে সর্বশ্রেণীর পাঠকের

মনোরঞ্জন। বাংলায় এটিই প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিজে ছিলেন অসাধারণ পন্ডিত। কিন্তু পান্ডিত্যের তুলনায় সাহিত্যবোধ কম ছিল। পান্ডিত্যের সঙ্গে শিল্পবোধের যে মণিকাঞ্চন যোগ 'তত্ত্ববোধিনী'-তে হয়েছিল, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের হাতে, বিবিধার্থে তা সম্ভব হয়নি। রাজেন্দ্রলাল নিজে ঐতিহাসিক ছিলেন তাই তাঁর সকল রচনাতেই ঐতিহাসিক সমস্যা ও বিচার থাকত। পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মনীষীদের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থস্থানের বৃত্তান্ত, বাণিজ্য দ্রব্যের উৎপাদন, নীতিগর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নতুন গ্রন্থের সমালোচনা ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনায় 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' পূর্ণ থাকত। কিন্তু এই সকল বিষয় বস্তুতপক্ষে হয়ে উঠেছিল সংবাদমূলক, অধিকাংশই ছিল শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত। গভীর তত্ত্বানুসন্ধান, বিশ্লেষণাত্মক, চিন্তাশীল প্রবন্ধ সাধারণত এতে থাকত না। প্রথম সচিত্র এই পত্রিকাতেই মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম কাব্য রচনা শুরু করেন 'তিলোত্তমা সম্ভব'। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বিবিধার্থ প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে সুখ-স্মৃতি রোমন্থন করে লিখেছেন :

> রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ-সংগ্রহ বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিকপত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার বার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর ঔপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনে মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে। এই ধরনের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন।[১১]

সাধারণ পাঠককে অবসর যাপনের জন্য মাঝারি শ্রেণীর একটি সাময়িকপত্র হিসাবে বিবিধার্থ তার কর্তব্য সম্পাদন করে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে সুসাহিত্যের পাঠক বৃদ্ধির দুরূহ কর্মে ব্রতী হয়ে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' এক বড় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্তব্য সম্পাদন করেছিল।

বিবিধার্থের পর প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪)। সাধারণের জন্য বিশেষ করে স্ত্রীলোকের জন্য এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। উদ্যোক্তারা প্রথম সংখ্যায় ঘোষণা করেন :

'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতে প্রস্তাবসকল রচনা হইবেক।'

'মাসিক পত্রিকা'-র প্রবন্ধগুলির বিষয় ছিল সহজ চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। ভাষাও ছিল যথাসাধ্য কথ্যরীতির অনুযায়ী লেখ্য ও কথ্য ভাষার একপ্রকার মিশ্রণই ছিল 'মাসিক পত্রিকা'-র প্রধান বিশেষত্ব। বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে মৌলিক উপন্যাস প্রকাশের অভিনবত্ব প্রথম দেখা গেল এখানেই। আলালের ভাষা পুরোপুরি গ্রহণ না করলেও 'মাসিক পত্রিকা'-র অন্যান্য রচনার ভাষা 'তত্ত্ববোধিনী' যুগের গদ্য থেকে ব্যতিক্রমী। স্ত্রীলোকদের জন্য প্রকাশিত বলেই এর ভাষা ছিল ঝরঝরে, সহজ। প্যারীচাঁদ বাংলা গদ্যে যথাসম্ভব কথ্যভাষা প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃতানুসারী গদ্য লেখকদের গদ্য যে সাধারণের থেকে দূরবর্তী তা প্যারীচাঁদ উপলব্ধি করেছিলেন। সমসাময়িক প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে সেটি ছিল সাময়িকপত্রের প্রচন্ড বিদ্রোহ। কারণ 'মাসিক

পত্রিকা'-র এই রচনারীতি উত্তরকালের বাংলা গদ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল । মাসিক পত্রিকার ভাষারীতির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে —

'ব্রাহ্মদের মধ্যে কুলীনে মেয়ে দিলে যেমন বাপমার মুখ উজ্জ্বল হইত । এই নিমিত্তে ছেলে তখন লড়াইয়ে যাইত, মা আপনি তাহার হাতে ঢাল তলবার দিতেন। দিয়া বলিতেন — বাপু তুমি লড়াইয়ে যাও ।' (জুন, ১৮৫৭)

সরল বাক্যরীতির সংক্ষিপ্ত বাক্য নির্মাণই এই গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য । বাংলা গদ্যে যথাযথ ছেদ বা যতিচিহ্নের প্রবর্তন করে যান বিদ্যাসাগর, কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী' ছেদচিহ্ন ব্যবহার করলেও কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি যতিচিহ্নের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন । 'মাসিক পত্রিকা'য় সর্বপ্রথম কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার হয়েছে । সুতরাং বাংলা গদ্য 'মাসিক পত্রিকা'য় ক্রমে হয়ে দাঁড়াল অনেক বেশি জীবনসম্পৃক্ত । 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'মাসিক পত্রিকা' উভয়ের ভাষাদর্শের সমন্বয় ঘটিয়ে 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র আবার নতুন ভাষাদর্শের সূচনা করেছিলেন। নবযুগের বাংলা কথাসাহিত্যের সাধন পথ উন্মুক্ত করে 'মাসিক পত্রিকা' ।

এরপর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'রহস্য সন্দর্ভ' (১৮৬৩) কিংবা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮) পত্রিকাগুলি ছিল সমকালীন সংবাদ, রাজনীতি, নীতিশিক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত । 'সোমপ্রকাশ'-এ প্রথম রাজনীতি আলোচনা আরম্ভ হয় । 'সোমপ্রকাশ' চেষ্টা করেছিল কয়েকজন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে রাজনীতিকে আবদ্ধ না রেখে সর্বসাধারণকে সচেতন করে তুলতে । তবু এরই মধ্যে বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'পূর্ণিমা' (১৮৫৯) এবং যোগেন্দ্রনাথের 'অবোধবন্ধু' (১৮৬৩) পত্রিকা দুটি বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রকাশিত হয়েছিল । বিহারীলালের বহু রচনা 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'বঙ্গসুন্দরী', 'সুরবালা কাব্য' প্রভৃতি 'অবোধবন্ধু'তে প্রকাশিত হয় । এছাড়া হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইন্দ্রের সুধাপান', কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'পৌলভর্জ্জিনী', 'নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত' 'অবোধবন্ধু'-তে প্রকাশিত হয় । এই পত্রিকাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য । তিনি লিখেছেন—

'বাংলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিকপত্র বাহির হইয়াছিল যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদবৈচিত্র্য পাওয়া যাইত । বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রাণসঞ্চারের ইতিহাস যাঁহারা পর্যালোচনা করিবেন তাঁহারা অবোধবন্ধুকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না । বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যুষের শুকতারা বলা যাইতে পারে ।' (সাধনা, আষাঢ় ১৩০১, পৃ: ১২৭)

প্রাক্-বঙ্গদর্শন পর্বের বাংলা সাময়িকপত্রগুলি বাঙালি মানসকে নব নব জিজ্ঞাসায় উদ্বোধিত করে তুলেছিল । সাময়িক পত্রগুলিতে ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে নবীনে-প্রবীণে দ্বন্দ্ব, দল-উপদলের ক্রিয়াকলাপ, পুরাতনপন্থী ও আধুনিকতাবাদীদের সংঘাত, শিক্ষা-সভ্যতার মান-নির্ণয় সম্পর্কে প্রবল মতবিরোধ এমন একটি মানসিক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে যে, পরস্পরবিরোধী ভাবদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে বাঙালি মনোলোকের উদয়দিগন্তে নবজীবনের আলোকরেখা ফুটে উঠতে লাগল । এককথায় বাঙালি মানসের বিকাশ ও বিবর্তনে সাময়িকপত্রগুলির

দান বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য বহন করছে। এছাড়াও বাংলা গদ্য যে শুধু আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কের ভাষা নয়, তার মধ্য দিয়ে মননের নবরূপ যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি ভাষা যে কত তীক্ষ্ণ ও দ্রুতগামী হয় তারও নজির তৈরি হল। বলা যেতে পারে, বাংলা গদ্যেরও জড়তামুক্তি ঘটল। সাময়িকপত্রেই বাংলা কথাসাহিত্যেরও দুয়ার উন্মুক্ত হল এবং এর পরেই রবীন্দ্রনাথের কথানুসারে 'বঙ্গদর্শন' বাংলা সাহিত্যে প্রথম সূর্যোদয় নিয়ে এল, যা ইতিপূর্বে কোনো পত্রিকার পক্ষেই সম্ভবপর হয়নি।

মনীষার বঙ্গদর্শন (১৮৭২)

বাংলা সাময়িকপত্র ও সাহিত্যের ইতিহাসে 'বঙ্গদর্শন' আপন অর্জিত মহিমায় ভূষিত। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য ভাষা, শিক্ষা, সভ্যতা ও মননশীলতার আলোকেমধ্যযুগীয় বাঙালির আধুনিক জীবনের নব নব জিজ্ঞাসা, চিন্তা, সমাজকথা, পরিবার ও ব্যক্তির জীবনাদর্শ সম্পর্কে আগ্রহের ক্ষুধা নিবৃত্তির দায়িত্ব নিয়েছিল 'বঙ্গদর্শন'। বাঙালির মনকে মননের দ্বারা সুদৃঢ় করে, সংস্কারকে যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে, প্রাচীন ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করে স্বাদেশিক চেতনায় উদ্দীপ্ত করে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি মানসকে আধুনিক যুগের প্রাণবাণীতে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বলা যেতে পারে, বাঙালি মানসকে মধ্যযুগের গুটি কেটে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদার-প্রাঙ্গনে মুক্ত করবার আন্দোলনে নেমেছিল 'বঙ্গদর্শন'। তাই 'বঙ্গদর্শন' শুধু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত নয়, এই পত্রিকা বাঙালি জাতির সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসেও অগ্রগণ্য ভূমিকার অধিকারী হয়ে আছে। বিশেষ করে যেখানে 'বঙ্গদর্শন'-এর পূর্বের অধিকাংশ পত্রিকাই মুখ্যত কোনো বিশেষ পক্ষের সমর্থনে বা কোনো সম্প্রদায়বিশেষের মতামত প্রচারের উদ্দেশ্যে, কিংবা নেহাতই সমকালীন সংবাদ পরিবেশনের লক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে 'বঙ্গদর্শন'-এর চরিত্র ও উদ্দেশ্য ছিল অনেক মুক্ত ও আধুনিক।

পত্রসূচনায় স্বয়ং সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছিলেন যে, প্রথমত 'আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙালির পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব।

দ্বিতীয়ত, 'যাহাতে এই পত্র সর্বজন পাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য'।

এছাড়াও 'এই পত্র কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই'।

বিশেষত শিক্ষিত সম্প্রদায় 'বঙ্গদর্শন'-এর মাধ্যমে তাঁদের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিল, যাতে তাঁদের উক্তি সমগ্র বাংলাদেশে জ্ঞানের প্রচার করে। এমনকি পাঠোপযোগী পরস্পর বিরোধী মতবাদ প্রকাশের মাধ্যমেও 'বঙ্গদর্শন' এক নিবপেক্ষ উদার চরিত্র হবার সংকল্প নিয়েছিল। পত্রিকা প্রকাশের তৃতীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক জানিয়েছিলেন —

> যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।[১]

অর্থাৎ নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপামর সাধারণের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে পত্রিকাটি দায়িত্ব পালন করবে। পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছিলেন যে, 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের অনেকগুলি কারণ অব্যক্ত থাকল। সেই অব্যক্ত কারণগুলি 'বঙ্গদর্শন'-এর বিভিন্ন বর্ষের সূচীপত্র থেকে অনুমান করা যায়। যেমন, প্রথমত সম্ভব হলে বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ

ইতিহাস রচনা—অন্যথায় সে ইতিহাস রচনায় বঙ্গবাসীকে অনুপ্রাণিত করা;জাতির মধ্যে ইতিহাস-চেতনা সঞ্চার করা।

দ্বিতীয়ত, বাংলার সামাজিক সমস্যাগুলির পুনর্বিচার এবং সম্ভ বক্ষেত্রে তার সমাধান।

তৃতীয়ত, জাতিচিত্তে জাতীয়তা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা উৎপাদন ও ঐক্যবোধ জাগ্রত করা;আবেগবর্জিত উন্নয়নমূলক স্বদেশচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করা;প্রজার অধিকার সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করা;অর্থনীতি সম্পর্কে কৌতূহল উদ্দীপন।

চতুর্থত, দেশের অতীত সংস্কৃতি-দর্শন-জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে শ্রেষ্ঠতাবোধ জাগানো এবং এভাবেই দেশবাসীর হীনমন্যতা দূর করা।

পঞ্চমত, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় সাধন, পাশ্চাত্য দর্শনবিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দান ; পারলৌকিক চিন্তার চেয়ে ইহলৌকিক চিন্তার প্রয়োজনীয়তা বোঝানো সর্বোপরি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনের উপযুক্ত সমন্বয়ে উপযুক্ত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি না সে বিষয়ে সন্ধান।

ষষ্ঠত, বাঙালির সাহিত্যক্ষুধা জাগানো, সাহিত্যসৃষ্টিতে উৎসাহিত করা; সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা ; সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ নিরূপণ করা, পাঠকের রুচি সংস্কার করা।

মোট কথা, বঙ্গদেশ সম্পর্কে সামগ্রিক চিন্তার সূত্রপাত করতে চেয়েছিলেন তিনি। বলা যায় জ্ঞানের যে আলো এতদিন মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাকে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে প্রতিফলিত করার ব্রত নিয়েছিল 'বঙ্গদর্শন'। বস্তুতপক্ষে, এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের সময় কল্পনা করা হয়েছিল যে, সুশিক্ষিতরাই অশিক্ষিতদের শিক্ষিত করে তুলবেন, কিন্তু সেই ফিলট্রেশন থিয়োরি অনুমিত ফল দেয়নি। তারই প্রতিবিধান মানসে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যথার্থ বলেছেন—

> বঙ্গদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্য কি ? Knowledge filtered down করিতে হইবে অর্থাৎ জ্ঞানবিস্তার করিতে হইবে।[২]

আসলে, বাংলার সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনই ছিল 'বঙ্গদর্শন'-এর উদ্দেশ্য। পত্রিকার নামকরণের মধ্যেও এই মনোভাব নিহিত। গতানুগতিক 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এর অনুকরণে নামটি আহরণ করা হয়নি। বিশেষ্য 'দর্শক' যে ভাবক্রিয়াবাচক 'দর্শন'-এ পরিণত হয়েছিল, তা লক্ষণীয়। স্পেকটেটর শব্দে জোর পড়ে যে দেখে তার উপর, ব্যক্তি বা পত্রই সেখানে প্রধান, দর্শন বললে জোর পড়ে দেখা নামক ব্যাপারটি ও দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর। দ্রষ্টব্য বিষয় এবং দেখার ভঙ্গির গুরুত্ব প্রতিপাদনের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র পত্রের নাম দিয়েছিলেন 'বঙ্গদর্শন'—'বঙ্গদর্শক' নয়। দর্শনের ব্যঙ্গার্থটিও হয়ত তাঁর অভিপ্রেত ছিল। পত্রখানির মাধ্যমে তদানীন্তন বাঙালির চিন্তা-চেতনা পর্যালোচনা করে বাঙালির জীবনদর্শন অনুসন্ধান করা তাঁর অভিপ্রায় ছিল। বাংলাদেশ

বঙ্গদর্শন

মাসিক পত্র সমালোচন

১ম খণ্ড	১লা বৈশাখ, ১২৭৯	১ম সংখ্যা

পত্রসূচনা

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা পাঠে বিমুখ। ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখক মাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপি-কৌশল-শূন্য ; নয় ত ইংরাজিগ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় ত অপাঠ্য, নয় ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র ; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি ? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানা রূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব ?

ইংরাজি ভক্তদিগের এই রূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদের "ভাষায়" যেরূপ শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা "বিষয়ী লোক" তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে দিয়াছেন, বহি পড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর। সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্ত-বয়ঃ-পৌর-কন্যা, এবং কোন কোন নিষ্কর্ম্মা রসিকতা-ব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই এক জন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকাপর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

লেখা পড়ার কথা দূরে থাক্, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্চর, এড্রেস, প্রোসিডিংস, সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজী জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয় ; কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদিও ইংরাজিতে পঠিত হইবে।

ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহু বিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানো-

বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম সংখ্যার একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

এবং বাঙালিকে জানবার আকাঙক্ষা শুধু ভৌগোলিক অথবা ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যেরই চরিতার্থতা খোঁজেনি, এ দেশের সমাজ, জীবন, ধর্ম, দর্শন;এককথায় তার পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের রূপ ও রহস্যকেই উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছিল। বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক ড. সত্যনারায়ণ দাশের মতে—

সামাজিক এবং সাহিত্যিক এই দুই তাগিদে প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গদর্শন—যা ছিল বহুধাবিক্ষিপ্ত, বহুসমস্যা জর্জরিত বঙ্গদেশকে সমগ্র দৃষ্টিতে পর্যালোচনার প্রথম মুখপত্র।[৩]

তাই 'বঙ্গদর্শন' নিছক একটি পত্রিকা নয়। 'বঙ্গদর্শন' একটি দৃষ্টিভঙ্গি, একটি মূল্যবোধ, যা পরবর্তী বাঙালি জাতিকে গড়েছে।

'বঙ্গদর্শন'-এর এই বিরাট কর্ম-আন্দোলনে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর যাদের প্রবন্ধ বা উপন্যাস পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরা হলেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণনাথ পন্ডিত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রামদাস সেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হৃষীকেশ ভট্টাচার্য এবং আরও কয়েকজন অজ্ঞাতনামা লেখক।

যাঁদের কবিতা 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁরা হলেন—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সেন, ভুবনমোহিনী দেবী, বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কারও কারও লেখা ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি ছদ্মনাম পাওয়া যায়—দর্পনারায়ণ পুতিতুন্ড, শ্রীভজরাম ও মনুষ্য-খদ্যোৎ; হরপ্রসাদের দুটি—গ্রাডুয়েট, যৌবনে সন্ন্যাসী; সঞ্জীবচন্দ্রের একটি—প্রমথনাথ বসু। এছাড়া অনেকের নাম প্রকাশিত হয়েছিল সংক্ষিপ্ত আকারে—অক্ষয়চন্দ্র—শ্রী অঃ, তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—তা. প্র. চ.; পূর্ণচন্দ্র বসু—শ্রী পূঃ রামদাস সেন—শ্রী রা. দ. স; নবীনচন্দ্র সেন—শ্রী নঃ, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রী ঈঃ, শ্রীঈশান;এবং কয়েকজন অজ্ঞাতনামা লেখক—শ্রী যঃ, শ্রী নীঃ;—এভাবে নাম স্বাক্ষর করেছেন।

তবে 'বঙ্গদর্শন'-এর অধিকাংশ রচনাতে লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি। 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদক যে লেখকের নাম বাদ দিয়ে রচনা প্রকাশ করা পছন্দ করতেন, তা নয়। অনেক লেখকই ইচ্ছাকৃতভাবে নাম প্রকাশ করতেন না, এমন কি রচনায় স্বাক্ষর পর্যন্ত করতেন না। হরপ্রসাদের উক্তি থেকে তা অনুমান করা যায়—

আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কখনও নাম সই করি না। সেইজন্য এখন সেই সকল লেখা আমার তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে।[৪]

তবে সকল লেখকেরই চিন্তার মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র লক্ষ্য করা যায়। তার কারণ তাঁরা অনেকেই একই ধরনের ভাবনার ভাবুক ছিলেন, যা একান্তই 'বঙ্গদর্শন'-এর উদ্দেশ্য ও আদর্শের সঙ্গে সমীকৃত ছিল। 'বঙ্গদর্শন'-এর এই উদ্যোগই উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে—

বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ কবিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল। পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম তাহা দুই কালের মধ্যে দাঁড়াইয়া

আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পাবিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার সেই সুপ্তি—কোথায় গেল সেই 'বিজয়বসন্ত', সেই 'গোলেবকাওলি', সেই সব বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক,এত আশা,এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ' ।....বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।[৫]

ইতিপূর্বে প্রকাশিত নেহাত্‌ই সংবাদ পরিবেশন বা ধর্মীয় জ্ঞান-বিতরণের সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যে আবদ্ধ সাময়িক পত্রিকাগুলির থেকে এখানেই 'বঙ্গদর্শন'-এর মহত্তর আদর্শের স্বাতন্ত্র্য । 'বঙ্গদর্শন'-এর সাহিত্য-আন্দোলন বুঝিয়ে দিল মাতৃভাষা ও সাহিত্য জাতীয় সংস্কৃতির মেরুদন্ড।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করেন প্রথম চার বছর (বৈশাখ, ৭৯—চৈত্র, ৮২) । ১২৭৯ বঙ্গাব্দে পত্র সূচনাতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'এই 'বঙ্গদর্শন' কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদবুদ স্বরূপ ভাসিল; নিয়ম বলে বিলীন হইবে ।'

আর চার বছর পরে 'বঙ্গদর্শন'-এর বিদায় গ্রহণ কালে তিনি লিখেছিলেন—

'বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদবুদ বলিয়াছিলাম । আজি সেই জলবুদবুদ জলে মিশাইল।'

এই নশ্বর জগতে সকল কিছুই জলবুদবুদের মতন । আবির্ভাব, তিরোভাব, পুনরায় আবির্ভাব—এ সকলই বিশ্বের নিয়ম; 'বঙ্গদর্শন'ও তার ব্যতিক্রম নয় ।

আত্মীয়বিরোধ ও পারিবারিক অশান্তি প্রভৃতির জন্য 'বঙ্গদর্শন'-র প্রচার বন্ধ হয়েছিল । তারপর একবছর 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রচার বন্ধ থাকে । 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রচার বন্ধ হওয়াতে যাঁরা আনন্দিত হয়েছিলেন বা যাঁদের আনন্দিত হবার সম্ভাবনা ছিল তাঁদের উদ্দেশ্যে সম্পাদক জানিয়েছিলেন—

'তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সংবাদ শুনাইতে আমি বাধ্য হইলাম । 'বঙ্গদর্শন' আপাতত রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনো যে এই পত্র পুনর্জীবিত হইবে না, এমন অস্বীকার করিতেছি না। প্রয়োজন দেখিলে স্বত বা অন্যত ইহা পুনর্জীবিত করিব, ইচ্ছা রহিল ।'

এক বছর পরে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় ১২৮৪ সাল থেকে আবার 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হল । মূলত বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন সর্বময় কর্তা । তিনি নিজে তো লিখতেনই, অন্যের লেখা সংশোধন, পরিমার্জন ইত্যাদিও করতেন । চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি বলেছিলেন—

বঙ্গদর্শনের জন্য কতরাত্রি যে জাগিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই । ঘাড়ে ভূত চাপার মত, আমার বিশ্রাম-সুখ লালায়িত অবসন্ন শরীর-মনকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিবারাত্রি খাটাইয়াছি ।[৬]

কিন্তু তবুও 'বঙ্গদর্শন'-এর আর তেমন প্রতিপত্তি থাকল না । এর জন্য দায়ী ছিল সম্পাদকের অমনোযোগ । কয়েকবছর চলার পর শেষে 'বঙ্গদর্শন'-এর অপঘাত মৃত্যু হল । ১২৯০ কার্তিক সংখ্যা থেকে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রকাশিত হতে থাকে । কিন্তু চন্দ্রনাথ বসুর 'পশুপতি সম্বাদ' প্রকাশে অসন্তুষ্ট হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র মাঘ সংখ্যার পর

'বঙ্গদর্শন'-এর প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ খন্ড-প্রবন্ধ রচনা করতে থাকেন। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে রচিত হত প্রবন্ধ। এই সব প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তি ছিল ব্যাখ্যা করার শক্তি। এগুলির মধ্যে যেমন অন্তর্দৃষ্টি আছে, তেমনি সমস্যা বোঝবার নিপুণ প্রতিভাও আছে। এইসব প্রবন্ধ গুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকটা নব্যবঙ্গের উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন। নব্যবঙ্গের মননশক্তি, জাতিস্বভাবকে বোঝবার আবেগ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তুলনাত্মক প্রসারিত দৃষ্টি, পাশ্চত্য সভ্যতা থেকে নবজীবনমন্ত্র গ্রহণ করবার আগ্রহ—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ গুলি এইসব দিক দিয়ে নব্যবঙ্গেরই অনুরূপ। 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রকাশকাল থেকে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র নব্যবঙ্গদলের স্বাধীন মুক্ত চিন্তার উত্তরাধিকার বহন করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর চিন্তা কয়েকটি স্থির মূল্যবোধে রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রথম পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র কোনো সুসম্বন্ধ সামগ্রিক জীবনদর্শন গড়ে তোলেননি। বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক চিন্তাকে মাতৃভাষা বাংলায় ছড়িয়ে দিয়ে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার মূলে বঙ্কিমচন্দ্র সচেতনভাবে এই আদর্শ দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

আধুনিক সাহিত্যের সেই প্রস্তুতিপর্বে সাহিত্যবিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে 'বঙ্গদর্শন'-এর সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। 'বঙ্গদর্শন'-এর মতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। সমাজ সংস্কার করা বা উপদেশ দেওয়া সাহিত্যের কাজ নয়—

কাব্যের উদ্দেশ্য সমাজ-সংস্করণ নহে।[৭]

অপরদিকে, শুধু চিত্ত-বিনোদনও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'উত্তরচরিত' (জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন, ১২৭৯) প্রবন্ধে বলেছেন—

'চিত্তবিনোদনই যদি সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয় তবে শতরঞ্চ খেলার সঙ্গে তার পার্থক্য থাকে না। ...শতরঞ্চের আমোদ অবিশুদ্ধ কিসে?'

সুতরাং চিত্তবিনোদন ব্যতিরেকে সাহিত্যের ভিন্ন উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। উক্ত প্রবন্ধেই বঙ্কিম বলেছেন, উৎকৃষ্ট সাহিত্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি, কিন্তু নীতির সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। নীতিশিক্ষা কাব্যের উদ্দেশ্য নয়। সত্য, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যা উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। নীতিজ্ঞান মানুষের চিত্তশুদ্ধি ঘটায়, কাব্যও সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করে। তবে চিত্তশুদ্ধিজনন সাহিত্যের গৌণ উদ্দেশ্য। সুতরাং সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি। এ প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনের কয়েকটি উক্তি এখানে স্মরণীয়—

'সৌন্দর্যসৃষ্টিই কাব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য'। (নৈষধ সমালোচনা, বৈশাখ, ১২৮৭)

'কাব্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি। বৃত্রসংহারের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি।'

(বৃত্রসংহার সমালোচনা, মাঘ, ১২৮১)

সম্ভবত, 'বঙ্গদর্শন'-এর বক্তব্য এই ছিল যে, সৌন্দর্যসৃষ্টিই কবির লক্ষ্য, কিন্তু তা

থেকে লোকে শিক্ষাও পেয়ে থাকে। যে পদ্ধতিতে সাহিত্যের সৌন্দর্য মানুষের চিত্তশুদ্ধি ঘটায় বলে 'বঙ্গদর্শন' মনে করেছিল, তা মনস্তাত্ত্বিক। কাব্যাকারের প্রত্যক্ষ উপদেশ বা নৈতিক বক্তৃতা না থাকলেও তা পাঠকের শুভ চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে। এ সম্বন্ধে 'বঙ্গদর্শন'-এর একটি প্রবন্ধের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

> ধার্মিক ব্যক্তি যদি উপদেশ দেন যে, 'বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, নবকভোগ করিতে হইবে' তাহা হয়তো শুনিয়াও শুনি না; কেন না ধর্মোপদেশকের মুখে নরকটা কেবল কথার কথা মাত্র—নরকের ভাব মনোমধ্যে স্পষ্টীকৃত করা ধর্মোপদেশকের সাধ্যাতীত। কিন্তু কবির উপদেশ সেরূপ নহে। বিশ্বাসঘাতকতা করিলে নরকে যাইতে হইবে এইরূপ অকার্যকর অর্থবিহীন বাক্য কবি প্রয়োগ করিলেন না। সেই নরকের এক অপূর্বদৃশ্য দেখাইলেন।... ভীত হইলাম।... এ অপূর্ব নরকচিত্র হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া রহিল। এমন জীবন্ত উপদেশ স্মৃতি থাকিতে ভুলা যায় না।[৮]

এজন্য উদ্দেশ্য ও সফলতার দিক থেকে বিচার করে, 'বঙ্গদর্শন' সমাজতাত্ত্বিক, নীতিবেত্তা, দার্শনিক ইত্যাদির উর্ধ্বে কবির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিল। প্রখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক ড. ভবতোষ দত্তের মতে—

> বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে সমাজ ভাবনা মগ্ন বাঙালি মনীষা সাহিত্যশিল্পকে অন্য নিরপেক্ষরূপে দেখতে অভ্যস্ত হয়নি। এইজন্য সাহিত্যে কল্যাণ ও নীতির চিন্তা এসেই গিয়েছে। সেকালে বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্যতা নিশ্চয়ই সেখানেই বলব, যেখানে সৌন্দর্য সৃষ্টিকেই তিনি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য বলে নির্দেশ করেছিলেন।.... জীবনকে সাহিত্যে রূপ দেওয়াই সৌন্দর্যসৃষ্টি—এই সৃষ্টিতেই চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির বিকাশ। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস, সত্যিই যদি জীবনকে সমগ্ররূপে ফুটিয়ে তোলা যায় তবে পাঠকের মনে সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র বুদ্ধির অবসান ঘটবেই। মনের এই প্রসারই সার্থক কাব্যপাঠের ফল।[৯]

বস্তুতপক্ষে, 'বঙ্গদর্শন'-এর মতে, কাব্য যদি পাঠককে রসানুভূতির উচ্চতর স্তরে নিয়ে না যায়, যেখানে প্রবৃত্তির উন্মাদনা শান্ত ও বিস্মৃত হয়ে আসে, তবে সে কাব্য সার্থকই নয়। এই চিত্তশুদ্ধির অবস্থায় না নিয়ে কাব্য যদি নিম্নতর চেতনার জন্যই ইন্ধন সংগ্রহ করে তবে স্বভাবতই সে কাব্য উদ্দেশ্যমূলক এবং ব্যর্থ। উনিশ শতকের সাহিত্য অঙ্গনে 'বঙ্গদর্শনে'-এর এই সাহিত্যভাবনা যথার্থই অভিনব ও নূতন পথের দিশারী।

'বঙ্গদর্শন' সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী দুই মতবাদকে সজ্ঞানে সমন্বিত করতে চেয়েছিল। 'বৃত্রসংহার' (দ্বিতীয় খন্ড) সমালোচনার সময় বলা হয়েছিল—

'কাব্যের উদ্দেশ্য যে শিক্ষা ইহা সচরাচর বোধহয় স্বীকৃত নহে। বিলাতী সমালোচকদিগের প্রচলিত মত এই যে সৌন্দর্যসৃষ্টিই কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য ছাড়িয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে কাব্য অপকর্ষ (তা) প্রাপ্ত হয়। ইহা সত্য বটে এবং অসত্যও বটে।'

এখানে স্পষ্টতই কাব্যের সঙ্গে সৌন্দর্য ও শিক্ষার সমান মর্যাদা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। 'বঙ্গদর্শন'-এর এই মতের সঙ্গে শেলীর চিন্তার সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। শেলী মনে করতেন সাহিত্যের প্রাথমিক ধর্ম তার কল্পনাকার্য, কিন্তু তার পরিণামধর্ম শিক্ষাদান। সাহিত্যের

মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না ।[১০]

গেটেও কাব্যকে চিত্তশুদ্ধির সহায়ক বলে মনে করতেন ।[১১]

আবার 'বঙ্গদর্শন'-এর মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান । রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যসৃষ্টির সঙ্গে নীতিশিক্ষার ব্যাপরটিকে স্বীকার করেননি ।[১২]

সাহিত্যের সামগ্রী বিষয়েও 'বঙ্গদর্শন'-এর অভিমত ছিল—

'সাহিত্যরসের সামগ্রী মানুষের হৃদয় । মনুষ্যহৃদয় বা তার 'সঞ্চালক' ছাড়া অন্য কিছুই সাহিত্যের সামগ্র নয় ।' (দানবদলন কাব্য সমালোচনা, বঙ্কিমচন্দ্র, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০)

এছাড়া 'বৃত্রসংহার' সমালোচনাতেও তিনি বলেছিলেন যে মনুষ্যজীবন সৌন্দর্যের উৎস, এজন্য তা সাহিত্যের বিষয় বটে । আলোচ্য প্রবন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন যে সাহিত্যের সৌন্দর্যের মূল মানবপ্রকৃতি নৈতিকতত্ত্বে নিহিত । নৈতিকতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হলে আপাত অসুন্দর কাজও সুন্দররূপে প্রতিভাত হয় । অর্থাৎ নীতি ও সুন্দরের এক ঐক্যসাধন চিন্তা 'বঙ্গদর্শন'-এর সাহিত্যাদর্শের পিছনে সক্রিয় ছিল ।

'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে (দানবদলন কাব্য সমালোচনা, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০) বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে মানুষের মনই কাব্যরসের সামগ্র; যা মানুষের হৃদয়ের অংশ বা তার সঞ্চালক, তাছাড়া আর কিছুই কাব্যের যথার্থ উপজীব্য নয় । এই অন্তর্নিহিত অনুভব কখনো ক্রিয়ায় ও কথায় পরিস্ফুট, কখনো অস্ফুট । সাহিত্যের মূল উপকরণ মানবচরিত্র; অতিমানব বা দেবচরিত্র নয়; যা অতিপ্রাকৃত তার সঙ্গে আমাদের সহৃদয়তা গড়ে উঠতে পারে না, পার্থিব ও অপার্থিবের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থেকে যায় । যেসব মহাকবি দৈব বা অতিপ্রাকৃত চরিত্র নিয়ে সার্থক মনোগ্রাহী কাব্য রচনা করেছেন, তাঁরা অতিমানুষদের পাঠকের বিশ্বাসের সীমানায় পৌঁছে দিয়েছেন, দেব চরিত্র সেখানে মানব চরিত্রের অনুসারী ।

আধুনিক সাহিত্যের সেই উন্মেষলগ্নে সাহিত্যের বিবিধ শাখা যথা গীতিকাব্য, নাটক, আখ্যানকাব্য প্রভৃতির রূপ ও রীতি সম্পর্কীয় ভাবনাও আলোচিত হয়েছে 'বঙ্গদর্শন'-এর বিভিন্ন প্রবন্ধে । গীতিকাব্য সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায় নবীনচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী' (বৈশাখ, ১২৮০) সমালোচনাকালে । উক্ত প্রবন্ধে বঙ্গিমচন্দ্র কাব্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছিলেন—দৃশ্যকাব্য, আখ্যানকাব্য এবং খন্ডকাব্য । গীতিকবিতা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত ।

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন; গীত থেকে গীতিকবিতার জন্ম এবং গীতের জন্ম মনের বেগ প্রকাশের আগ্রহ থেকে । কিন্তু গীতের পারিপাট্যের জন্য দুটি গুণের আবশ্যক—; স্বরচাতুর্য এবং শব্দচাতুর্য । এই দুটি গুণ সচরাচর একজনের ঘটে না বলেই ক্রমশ অগেয় গীতিকাব্য রচিত হতে লাগল । যদিও সঙ্গীত এবং গীতিকবিতার উদ্দেশ্য এক এবং তা হল অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, অন্যের অননুমেয় ভাবসকলকে প্রকাশিত করা । হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও বলেছেন—'যখন হৃদয়ে শোক বা আনন্দ ধরে না তখন তাহাকে কাব্যকারে বাহির করে দেওয়াই গীতিকবিতা ।'

(কালিদাস ও সেক্ষপীয়র ; বৈশাখ, ১২৮৫)

এজন্য গীতিকবিতা আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয় । কিন্তু তাই বলে বহির্বিশ্বেও সেখানে উপেক্ষিত

নয় । তাই 'বঙ্গদর্শন'-এর অভিমত—

'বহিঃপ্রকৃতি যখন বর্ণনীয় তাহা অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া-সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য । যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয় তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়াসমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য । যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি । (মানসবিকাশ, বঙ্কিমচন্দ্র, পৌষ, ১২৮০)

তাই 'বঙ্গদর্শন'-এর মতে বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের রচনা, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য ।

গীতিকবিতার উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধেও 'মানসবিকাশ' সমালোচনা কালে বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । ভিন্ন ভিন্ন শাখার উৎপত্তির পটভূমি বিশ্লেষণ করে বঙ্কিম বলেছেন—

'সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থা ভেদে অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয় । সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল দুর্জ্ঞেয় সন্দেহ নাই, এ পর্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই । .... তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র ।'

বঙ্কিম শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে বাংলাদেশের অবস্থা ও বাঙালির জাতীয় চরিত্র গীতিকাব্যেরই অনুকূল । স্মরণীয়, 'বঙ্গদর্শন' যখন গীতিকবিতার স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করেছিল তখনও রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চা প্রকাশিত হয়নি এবং আধুনিক গীতিকবিদের কবিতাও প্রকাশিত হয়নি ।

নাটকের প্রকৃতি বিষয়েও বিবিধ চিন্তা 'বঙ্গদর্শন'-এর পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করা যায় । নাটক বিচার কালে 'বঙ্গদর্শন' শেক্সপীয়রের নাট্যাদর্শকেই গ্রহণ করেছিল । সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে নাটক নিয়ে নানা কথা বলা হলেও নাটকের মূল বিষয়ের প্রতি আলংকারিদের উদাসীনতা দেখে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আক্ষেপ করেছিলেন । নাটকের প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন যে মনুষ্য-হৃদয়ের পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় নাটকে । তার প্রধান বস্তু হল সংঘাত । (কালিদাস ও সেক্সপীয়র, বৈশাখ, ১২৮৫) । এছাড়াও 'বঙ্গদর্শন'-এর বিভিন্ন প্রবন্ধে নাটক বিষয়ে নানাবিধ মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়—

'অন্তঃপ্রকৃতির ঘাতপ্রতিঘাত চিত্র করাই নাটকের উদ্দেশ্য'—(সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, মাঘ, ৮০) ।

'নাটকের উদ্দেশ্য হৃচ্চিত্র'— (উত্তরচরিত, জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন, ১২৭৯) ।

'বঙ্গদর্শন'-এর মতে, উৎকৃষ্ট নাটক রচনার জন্য নাট্যকারকে কয়েকটি দিকে দৃষ্টি দিতে হবে । প্রথমত, 'ক্রিয়া-ক্রিয়ার বাহুল্য, পারস্পর্য এবং শীঘ্র সম্পাদন চিত্তকে মুগ্ধ করে । ক্রিয়া নাটকের প্রধান গুণ ।'—(উত্তরচরিত)

দ্বিতীয়ত, নাটকে কোন অনাবশ্যক কাজ বা দৃশ্য বা উক্তি থাকবে না । 'যাহা কিছু নাটকের প্রতিকৃত হইবে তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত ।'—(উত্তরচরিত)

তৃতীয়ত, ঘটনার মধ্যে কালগত নৈকট্য থাকা প্রয়োজন । এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট মন্তব্য নেই । তবে উত্তরচরিত-এ এর অভাবকে বঙ্কিমচন্দ্র দুর্বলতা বলেছেন।

চতুর্থত, সংলাপ-নাটক অভিনয়ের জন্য রচিত হওয়ায় সংলাপ সরল ভাষায় নির্মিত হবে, সংলাপে অপ্রসিদ্ধ শব্দ বা সমাজবদ্ধ শব্দ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। যা কিছুতে অর্থবোধের হানি হয় নাটকে তাই দোষ। তাতে অভিনয়োপযোগিতা নষ্ট হয়—(উত্তরচরিত)।

সুতরাং নাটকের রূপ-রীতি বিষয়ে 'বঙ্গদর্শন' যা বলেছিল, তা একদিকে যেমন মৌলিক, তেমনি নাটক সংক্রান্ত সমস্ত দিক্‌গুলিকেও তা ব্যাপ্ত করে ।

সমাজবৈচিত্র্য আখ্যানকাব্য সৃষ্টির অনুকূল । অথচ বাংলার সমাজে বৈচিত্র্যের অত্যন্ত অভাব । এই চিরস্থিতিশীল সমাজে বৈচিত্র্য হাসির কথা, স্বানুবর্তিতা পাগলামী । সুতরাং বাংলার সমাজ আখ্যানকাব্য সৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত নয় । তবুও যখনই এই চিরস্থিতিশীল সমাজের অটুট বন্ধনগুলো কালের নিয়মে এক একবার শিথিল হয়েছে অমনি আখ্যানকাব্যের জন্ম হয়েছে । বৈদেশিক ভাব যখনই এসেছে তখনই আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছে, কারণ সমাজ তখন বৈচিত্র্যের মহিমা বুঝেছে। সেইজন্য উনিশ শতকের পাশ্চাত্য ভাবপ্রবাহের প্রতিক্রিয়ায় এ দেশে আখ্যানগুলির সৃষ্টি হয়েছিল ।

আখ্যানকাব্যের প্রকৃতি বিষয়ে 'বঙ্গদর্শন'-এর অভিমত ছিল পৌরাণিক বা কাল্পনিক উপাখ্যানই আখ্যান কাব্যের উপযুক্ত । 'পলাশীর যুদ্ধ' (কার্তিক, ১২৮২) সমালোচনায় আখ্যানকাব্যের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শন' সচেতনতা দেখিয়েছিল—

প্রথম, আখ্যানকাব্যের প্রধান গুণ নাটকীয়তা । এ জন্য কোনো অপ্রয়োজনীয়তা ঘটনা এতে থাকবে না । সমালোচনায় বলা হয়েছিল—'এই সর্গ যে কাব্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা আমাদের বোধ হয় নাই' ।

দ্বিতীয়, কাহিনী গতিশীল হবে । এজন্য সমালোচনায় বলা হয়েছিল 'এই কাব্যের কার্য অতি মন্দগামী ।'

তৃতীয়, কবির দীর্ঘ মন্তব্য আখ্যানকাব্যের পক্ষে অনুপযুক্ত । 'উপাখ্যানকাব্যে এতাদৃশ দীর্ঘ মন্তব্য, আমাদিগের বিবেচনায় যথাস্থানে নিবিষ্ট নহে' ।

উপন্যাস সম্পর্কেও 'বঙ্গদর্শন' বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছিল । 'ক্ষুদ্র উপন্যাস সমালোচনা' (শ্রাবণ, ১২৮৯) প্রবন্ধে চন্দ্রনাথ বসু লিখেছিলেন যে, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো উপন্যাসও মানুষের হৃদয়ের চিত্র । তাই ঘটনার সঙ্গে অন্তরের যোগ স্থাপন করা ঔপন্যাসিকের অন্যতম কর্তব্য । চরিত্র সৃষ্টি সম্পর্কেও বলা হয়েছিল যে প্রধান চরিত্রগুলির সার্বিক পরিস্ফুটন প্রয়োজন । এমনকি উপকাহিনীকে মূল কাহিনীর সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত করাও অবশ্য কর্তব্য ।

কাব্য-নাটক-আখ্যানকাব্য-উপন্যাসের রূপ-রীতি সম্পর্কে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উষালগ্নে 'বঙ্গদর্শন' যে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন আদর্শ নির্মাণ করে দিয়েছিল তা ভবিষ্যতে সাহিত্য-শাখাগুলির বিবর্তনের পথে অনেকাংশেই সাহায্য করেছিল । 'বঙ্গদর্শন'-এর এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে এক সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধের পরিচায়ক ।

সাহিত্য-সমালোচনায় 'বঙ্গদর্শন' এক নতুন পথ প্রদর্শন করেছিল । 'বঙ্গদর্শন'-এর পূর্বে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ'-এ বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার সূত্রপাত হয়েছিল কিন্তু সাহিত্যতত্ত্ব

সম্পর্কে কোনো সুবিন্যস্ত চিন্তা বা সাহিত্য-সৌন্দর্য বিষয়ে কোনো জ্ঞান সেখানে পাওয়া যায় না। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন আদর্শে বিশ্বাসী, বিবিধার্থের কাছে 'অন্নদামঙ্গলে'র চেয়ে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' লঘু প্রতিপন্ন হয়েছিল কারণ রঙ্গলালের কাব্য পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট। এ সকল কারণেই বিবিধার্থের সমালোচনার উদ্যম প্রশংসনীয় হলেও সমালোচনার প্রকৃত আদর্শ গড়ে ওঠেনি।

সাহিত্য-সমালোচনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রাচ্য আদর্শকে পুরোপুরি পরিহার করেছিল। অলংকারশাস্ত্র সম্মত খন্ড খন্ড বিচারে যে প্রকৃত সাহিত্যরস আস্বাদন করা যায় না, 'বঙ্গদর্শন' তা জানিয়েছিল। 'উত্তরচরিত' আলোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছিলেন যে, এক একটি প্রস্তর বা বৃক্ষকে পৃথক পৃথকভাবে দেখলে যেমন তাজমহল বা উদ্যানের সৌন্দর্য কিছুই বোঝা যায় না, তেমনি খন্ডাংশবিচারে সাহিত্যেরও প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা অসম্ভব। অট্টালিকার সৌন্দর্য বুঝতে গেলে যেমন সমগ্র অট্টালিকাটি একনজরে দেখতে হয়, সাগরগৌরব বুঝতে গেলে যেমন তার অনন্ত বিস্তার 'এককালে চক্ষে গ্রহণ' করতে হয়, তেমনি কাব্যনাটক সমালোচনার সময়ও সামগ্রিক দৃষ্টির প্রয়োজন। রসাস্বাদনের এই নবীন তুলাদন্ড নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্য দেশ থেকে আহৃত। এ দেশে আধুনিক কালের সমস্ত প্রকার সাহিত্যকর্মের জন্ম যেহেতু পাশ্চাত্য আদর্শে হওয়া উচিত ছিল তা 'বঙ্গদর্শন' উপলব্ধি করেছিল। সেজন্য বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্য-সমালোচনার আগে সেই বিশেষ সাহিত্য-কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি বিবৃত হত এবং পরে সেই মানদন্ডে গ্রন্থ সমালোচিত হত।

'বঙ্গদর্শন'ই প্রথম সাহিত্য-সমালোচনায় ব্যক্তির স্থান স্বীকার করে নিল। ইতিপূর্বে ঈশ্বর গুপ্ত জীবনী সংগ্রহ করেছিলেন বটে, কিন্তু জীবনচরিত আলোচনার দ্বারা সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। সাহিত্য-আলোচনায়, সাহিত্যকারের জীবনীর প্রয়োজনীয়তার কথা 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রথম শোনা গেল। বলা যেতে পারে, সাহিত্য পর্যালোচনায় এ এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি, যার প্রাধান্য অদ্যবধি স্বীকৃত।

সামগ্রিক দৃষ্টির জন্য 'বঙ্গদর্শন' কাব্যের খন্ড বিচারে অগ্রসর হয়নি। এই কারণেই 'বৃত্রসংহার' প্রথম খন্ড সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র অসুবিধা বোধ করেছিলেন। কাব্যটির অসম্পূর্ণতাহেতু তার প্রকৃত সমালোচনা যে সম্ভবপর নয়—একথা পাঠককে তিনি জানিয়েছিলেন। 'উত্তরচরিত' সমালোচনায় তিনি ভবভূতির কবিত্বশক্তি, তাঁর সৃষ্টিকৌশল, চরিত্রচিত্রণের নিপুণতা সমস্ত পৃথকভাবে আলোচনা করে একথা স্বীকার করেছিলেন যে, 'উত্তরচরিত'-এর সমালোচনা পদ্ধতি প্রকৃত নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও 'মেঘদূত' (ফাল্গুন, ১২৮৯) সমালোচনায় সামগ্রিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর মতে—

'যক্ষের প্রবল বিরহভাবের সহিত অন্য অন্য সঞ্চারী ভাব মিশ্রিত হইয়া, জড়িত হইয়া, উহাকে যেরূপ পল্লবিত সুশোভিত করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা মেঘদূতের প্রকৃত সমালোচনা।'

বঙ্কিমের 'উত্তরচরিত' সমালোচনায়, চন্দ্রনাথ বসুর 'অভিজ্ঞান শকুন্তল', শ্রীশচন্দ্র

মজুমদারের 'মেঘনাদবধ সম্পর্কে কয়েকটি কথা'য় চরিত্র বিশ্লেষণের প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়।

আলংকারিক কথিত স্থায়ীভাব এবং রসতত্ত্বেও 'বঙ্গদর্শন'-এর সমর্থন ছিল না। কেন না মানুষের চিত্তবৃত্তি অসংখ্য অথচ স্থায়ীভাবের সংখ্যা নটি, ব্যাভিচারী ভাব তেত্রিশটি। এদের মধ্যে রসত্বপ্রাপ্তি ঘটে নটির। আদিরস অলংকারশাস্ত্রে প্রথমে স্থান পেয়েছে, কিন্তু স্নেহ-দয়া-প্রেম ইত্যাদি ভাবের স্থান নেই, তদ্জ্ঞাপক রসও নেই। এই অসম্পূর্ণ রসতালিকা দ্বারা সাহিত্যের সমালোচনা হতে পারে না বলে 'বঙ্গদর্শন' মনে করেছিল। 'বঙ্গদর্শন'-এর মতে, এভাবে সমালোচনা করলে ম্যাকবেথের উচ্চাশা, হ্যামলেটের প্রতিহিংসা স্বীকৃতি পায় না, অথচ ঐ গ্রন্থগুলি রসাংশে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের পর্যায়ে পড়ে। তাই মুষ্টিমেয় নটি ভাবরসের বন্ধনে আবদ্ধ না থেকে 'বঙ্গদর্শন' মুখ্য চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কাব্যরস আস্বাদন করতে চেয়েছিল।

'বঙ্গদর্শন'-এর সমালোচনায় সাহিত্যতত্ত্ব, আঙ্গিক ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'অবকাশরঞ্জিনী' আলোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকবিতার উদ্ভব, তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'দানবদলন' কাব্য সমালোচনার পূর্বেও কাব্যে অতিপ্রাকৃত সংযোজনার কৌশল, উদ্দেশ্য, উপকার, অপকার ইত্যাদির আলোচনা এবং পরে সেই মানদন্ডে বিচারের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। 'মানসবিকাশ' আলোচনাকালে সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্ক, বাংলা গীতিকবিতার শ্রেণীভেদ, তার প্রবণতা, কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পাশ্চাত্যের তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে এক নতুন সাহিত্য-সমালোচনা ধারার উৎসমুখ 'বঙ্গদর্শন' খুলে দিয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতির উত্তরচরিতের তুলনায় ম্যাকবেথের ক্রিয়ার বাহুল্য এবং গতির প্রশংসা করেছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেমের সঙ্গে রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমের সাদৃশ্য দেখেছিলেন। কালিদাস ও শেক্সপীয়রের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এ জাতীয় আলোচনার আরও দৃষ্টান্ত বঙ্কিমের 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা' (বৈশাখ, ১২৮২), শ্রীশচন্দ্রের 'মিরন্দা ও কপালকুন্ডলা' (শ্রাবণ, ১২৮৭) ইত্যাদি।

'বঙ্গদর্শন'-এর সাহিত্য-সমালোচনার একটি বিশেষ দিক এই যে, সাহিত্য-বিচারে নৈতিক মানদন্ড ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহৃত হয়েছিল। সৌন্দর্যসৃষ্টি ব্যতীত সাহিত্য-সমালোচনায় অন্য এক মহত্তর বস্তুর সন্ধানে 'বঙ্গদর্শন' আগ্রহী ছিল। এর পশ্চাতে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যের রুচি বিকৃতির প্রতিক্রিয়া থাকা অসম্ভব নয়। সম্ভবত পাঠকের নিম্নমানের রুচি অবসানের উদ্দেশ্যেই নীতির কথা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। যে সংস্কার আন্দোলন ছিল 'বঙ্গদর্শন'-এর অভীষ্ট, এই প্রয়াস হয়তো তারই এক অন্যতম প্রকাশ।

তাই দেখা যায়, নৈতিকতার মানদন্ডে 'বৃত্রসংহার', 'পলাশীর যুদ্ধ' অপেক্ষা উচ্চাসন লাভ করেছিল। এই মাপকাঠিতে শচী প্রমীলা অপেক্ষা মহীয়সী সৃষ্টি বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নীতিশিক্ষার দিক থেকে বঙ্কিমের সাহিত্য বিচার করে তাঁকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নীতিশিক্ষার প্রসঙ্গ গুরুত্ব পাওয়ায় সাহিত্যকর্ম থেকে একটি তত্ত্ব উদ্‌ভাবনের প্রবণতাও 'বঙ্গদর্শন'-এ লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রনাথ বসু 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল'-এ (জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র-পৌষ; ১২৮৭) ছয়টি শিক্ষণীয় তত্ত্ব উদ্ধার করেছিলেন এবং দুষ্মন্ত-শকুন্তলাকে পুরুষ-প্রকৃতি প্রতিপন্ন করে নাটকটিকে সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তবে একথাও সত্য, তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস থাকলেও 'বঙ্গদর্শন'-এর সমালোচনা নীরস তত্ত্ব-সর্বস্ব হয়ে ওঠেনি, তা সবসময়ই সাহিত্য-রসাস্বাদী হয়ে রসিক পাঠককে তৃপ্তি দিয়েছে।

'বঙ্গদর্শন'-এর যুগে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হত তার অধিকাংশের মধ্যে নতুনত্ব কিছু ছিল না, সবই ছিল পুরনো ভাবের চর্বিতচর্বন। গ্রন্থকারদের অনেকের বাংলা লেখার ক্ষমতা যেমন ছিল না, তেমনি সাহিত্য সম্পর্কে কোনো বোধও ছিল না। 'বঙ্গদর্শন' বাংলা সাহিত্যকে মনেপ্রাণে ভালোবাসত। এইসব রচনা পড়ে তার মধ্যে বিতৃষ্ণা জেগেছিল। প্রকৃত সমালোচনার পথ ত্যাগ করে এইসব ক্ষেত্রে 'বঙ্গদর্শন' ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে সমালোচনার পথ বেছে নিয়েছিল। মাতৃভাষা এবং সাহিত্যকে যিনি ভালবাসেন তাঁর পক্ষে এ ছাড়া সহজপথ আর কী-ই বা হতে পারে, কমলাকান্তের প্রথম পত্রটিকেও (পৌষ, ১২৮৪) 'বঙ্গদর্শন'-এর পুস্তক সমালোচনার যথার্থ নিদর্শন বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

'বঙ্গদর্শন'-এ এবং বঙ্কিমের রচনায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক যুগের আদর্শকে প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে সব্যসাচী আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। একহাতে তিনি যেমন অগ্নি জ্বেলেছিলেন তেমনি অন্যহাতে তার ধূম অপসারণেও নিযুক্ত ছিলেন। উন্নত মানের সাহিত্যসৃষ্টির জন্য তাঁকে যেমন দৃষ্টি দিতে হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি নিকৃষ্ট রচনার জঞ্জাল দূর করতেও তাঁকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তিনি নিজে বঙ্গভাষাকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন, অন্যেও ঠিক তেমনি শ্রদ্ধা করবে—এটাই তিনি প্রত্যাশা করতেন। রবীন্দ্রনাথের মতে—

> রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিমচন্দ্র একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত গতিতে পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।[১৩]

নবীন লেখকদের তিনি নিজে যেমন উৎসাহ দিয়েছেন তেমনি মূল্যবান উপদেশও দিয়েছেন। এইভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র দেশব্যাপী এক ভাবের আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন যা বঙ্গসাহিত্য এবং ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষ উপকার সাধন করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের রাজপথ খনন করিয়া দিয়া গিয়াছেন।[১৪]

ইতিহাস ও রোমান্সের রহস্যময় দূরের জগত থেকে সরে সমসাময়িক বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সমস্যাকে আশ্রয় করে সমাজ ও পরিবারকেন্দ্রিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু হল, যাব মাধ্যমে বাংলা উপন্যাসে এক নবযুগের সূচনা হল। 'বঙ্গদর্শন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের মুহূর্তে বিষবৃক্ষ কিভাবে সকল পাঠককে তার মোহিনী মায়ার সুরে মজিয়ে রেখেছিল, তার বর্ণনা পাই রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে—

তখন 'বঙ্গদর্শন'-এর ধূম লেগেছে — সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল, কী হবে, দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা। 'বঙ্গদর্শন' এলে পাড়ায় দুপুরবেলায় কারো ঘুম থাকত না।[১৫]

যদিও বিষবৃক্ষের পূর্বেও বাংলায় সামাজিক কথাসাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা সূচিত হয়েছিল। 'সমাচার-দর্পণ'-এর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ক্ষুদ্রায়ত 'বাবুর উপাখ্যান' থেকে শুরু করে 'নববাবুবিলাস', 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ' (১৮৫২), মাসিকপত্রে প্রকাশিত 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) ও 'সুশীলার উপাখ্যান' পর্যন্ত অনেক রচনাই সমাজসমস্যামূলক। তথাপি এগুলি উপন্যাস হিসাবে যথার্থ শৈল্পিক সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি। বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর মতে —

কিন্তু বলিতে দ্বিধা নেই, এদের কোনটিই উপন্যাস নয়। যথার্থ বাংলা সামাজিক উপন্যাস বঙ্গদর্শনেই প্রথম বেরোল—'বিষবৃক্ষ'।[১৬]

সুতরাং এদিক থেকে 'বঙ্গদর্শন' বাংলা উপন্যাসে প্রথম পালাবদলের সংকেত বয়ে এনেছিল। যদিও বিষবৃক্ষের পূর্বে বঙ্কিম তিনখানি উপন্যাস রচনা করেছিলেন, তথাপি প্রাক্-'বঙ্গদর্শন' পর্বের বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে বিষবৃক্ষের তুলনা করে তার স্বাতন্ত্র্য ও সার্থকতা সম্পর্কে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'-তে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুন্ডলা, মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী ইংরেজীতে যাকে বলে রোম্যান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদেব ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ। ... বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।[১৭]

রবীন্দ্রনাথের এই সুচিন্তিত অভিমত সর্বজনস্বীকৃতি। তথাপি এর অর্থ এই নয় যে, 'বিষবৃক্ষ'-এর পর আর তিনি রোমান্স ও ইতিহাসকে আশ্রয় করে উপন্যাস লেখেননি। 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাজসিংহ' (১৮৮২), 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪), 'দেবী চৌধুরানী' (১৮৮৪) —উপন্যাসে ইতিহাস ও রোমান্সের উপকরণ আছে। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' রচয়িতার বাস্তব বোধ ও যুগচেতনা পরবর্তী রোমান্সধর্মী উপন্যাসগুলিকেও প্রভাবিত করেছিল। তাই 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) যেখানে পাঠকমনে নিছক দূর জগতের রোমান্সের স্বপ্ন ঘনিয়ে তোলে সেখানে 'চন্দ্রশেখর' কিংবা 'দেবীচৌধুরানী'তে রোমান্টিক ইতিহাসের বিস্ময়কর ঘটনার পাশাপাশি বাঙালির পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পরিচিত অভিজ্ঞতার মর্মস্পর্শী চিত্র প্রতিফলিত। আসলে, এই পর্বের উপন্যাসে অনেকক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা ও জীবনাদর্শই মুখ্য, তাকে যথাযথ ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যই ইতিহাস ও রোমান্সের পটভূমি নির্মাণের প্রয়াস। সেইমুহূর্তে যুগনায়ক বঙ্কিমের কাছে শিল্পসৃষ্টির ন্যায় জীবননীতি এবং সামাজিক ও

জাতীয় আদর্শকে রক্ষা করাও পরম কর্তব্য ছিল। এইভাবে এই দুই প্রবণতার সমন্বয় প্রয়াসেই বঙ্গ দর্শন পর্বে রোমান্সের রূপান্তর ঘটে উপন্যাসের শিল্পরূপেব জন্মলাভ হয়েছিল।

গ্রন্থের নামকরণের মধ্য দিয়েও লেখকের মনের প্রবণতার বেশ কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য। প্রাক্-বঙ্গদর্শন পর্বের উপন্যাস তিনটির নামকরণ করা হয়েছিল তিনটি প্রধান নারী চরিত্রের নামে— 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুন্ডলা' ও 'মৃণালিনী'। তিনটি নারীকে ঘিরেই রোমান্সের রহস্যময় স্বপ্নজাল। 'বঙ্গদর্শন' পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমশ যে অনেক বেশি পরিমাণে স্বদেশ, সমাজ ও সমকাল বিষয়ে সজাগ হয়েছিলেন, তার কিছুটা আভাস মেলে এই পর্বে রচিত রোমান্সধর্মী ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসগুলির শিরোনামের দিকে তাকালে—'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ', 'দেবীচৌধুরানী' ইত্যাদি। শেষোক্ত নামকরণটি নারীচরিত্রের দ্যোতক হলেও এর মধ্যে রোমান্টিক স্বপ্নালুতার চেয়ে ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠতার আভাসই বেশি পরিমাণে ফুটে উঠেছে।

'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ছাড়াও পূর্ণচন্দ্রের 'শৈশব সহচরী' (আষাঢ়, ১২৮২-ফাল্গুন, ১২৮৪), সঞ্জীবচন্দ্রের 'মাধবীলতা' (কার্তিক, ১২৮৫-বৈশাখ, ১২৮৮), হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'কাঞ্চনমালা' (আষাঢ়, ১২৮৯-মাঘ, ১২৮৯) উপন্যাসসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু বিষয় বা আঙ্গিক কোনো দিক থেকেই এগুলি বঙ্কিম উপন্যাসের সমুচ্চতায় উন্নীত হতে পারেনি। বস্তুতপক্ষে 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রধান কান্ডারী বঙ্কিমের লেখনীর মাধ্যমেই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নতুন পথের সূচনা হল 'বঙ্গদর্শন'-এর পৃষ্ঠায়।

সাহিত্যচর্চায় ন্যায় 'বঙ্গদর্শন' শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যথার্থ ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত করেছিল। ইতিপূর্বে যথার্থ ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়নি। কেরির 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) বা মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলি' (১৮০৮) যথার্থ ইতিহাস গ্রন্থ নয়, ইতিহাস অংশ এতে অল্প এবং ইতিহাস এখানে ভাষাকে উপস্থাপিত করার একটা অবলম্বন হিসেবে ব্যবহৃত। 'বঙ্গদর্শন'-এর পূর্বে প্রকৃত ঐতিহাসিকের দৃষ্টি, সত্যনিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাই রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনায়। তাঁর 'শিবাজীর চরিত্র'(১৮৬০), 'মেবারের রাজেতিবৃত্ত' (১৮৬১) এবং 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর প্রবন্ধসমূহ ইংরেজিতে লিখিত হলেও বাংলার ইতিহাসের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েনি। এমন সময় 'বঙ্গদর্শন' বিক্ষিপ্তভাবে নয়, আর্যজাতি ও আর্যসভ্যতা বিশেষত বাঙালির সামগ্রিক ইতিহাসকে সুশৃঙ্খলভাবে রূপদানে প্রয়াসী হল।

'বঙ্গদর্শন'-এর মুখ্য কান্ডারী বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন বাঙালির ইতিহাসচেতনা জাগ্রত না হলে জাতি কখনও উন্নতি করতে পারবে না। ইতিহাস চেতনার অভাব জাতির মানস পঙ্গুতার লক্ষণ। পুরনো গৌরব—অগৌরবের আলোচনার মাধ্যমে বাঙালি তার উপযুক্ত পথ ও নীতি বেছে নিতে পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। জাতির অতীতের প্রতি কৌতূহল, অতীত গৌরবের অনুসন্ধান এবং তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস রেনেসাঁসেরই ফল। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন—

'বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।'

(বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা : অগ্রহায়ণ, ১২৮৭)

বাঙালি বা ভারতবাসীর নানা আপাতকলঙ্ক, তাদের শৌর্যহীনতায় ইউরোপীয়দের বিদ্রূপ-কটাক্ষ, মুসলমান ঐতিহাসিকের পক্ষপাতমূলক বিবৃতি, বিশেষত সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয়ের উপাখ্যান তাঁকে এমন বিচলিত করেছিল যে প্রত্যক্ষ ইতিহাসকারের ভূমিকায় অবতরণ না করে তাঁর উপায় ছিল না। তিনি আশা করেছিলেন কৃতি বঙ্গসন্তানের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হবে এবং বাঙালির এই কলঙ্ক সত্বর অপসৃত হবে। তাঁর আদর্শে এবং অনুপ্রেরণায় রামদাস সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকবৃন্দ 'বঙ্গদর্শন'-এ ইতিহাস চর্চায় উদ্বুদ্ধ হন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর 'বঙ্গদর্শন'-এর অন্যান্য সকলের উদ্দেশ্য ছিল জাতির পূর্ব মহিমা কীর্তনের দ্বারা তার সুপ্তিভঙ্গ করা। আসলে 'বঙ্গদর্শন'-এর ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য যেমন ছিল সত্যানুসন্ধান, তেমনি ছিল স্বজাতি গৌরব প্রতিষ্ঠাও। এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট চিন্তাবিদের বিশ্লেষণটি অবশ্যই স্মরণীয়—

> বাংলাদেশের ইতিহাস যিনি রচনা করতে যাবেন, বঙ্কিমচন্দ্রের নাম তিনি শ্রদ্ধানম্রচিত্তে স্মরণ করবেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বাংলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেননি বটে, কিন্তু বাংলার অতীত সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলের সীমা ছিল না। এ কৌতূহল বৈজ্ঞানিকের নিস্পৃহ অনুসন্ধিৎসা থেকেই জাগে নি, এর মূলে ছিল দেশপ্রেমিকের নিবিড় অনুরাগ। ...বাংলার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত তিনি 'বঙ্গদর্শন' নাম দিয়ে মাসিক পত্র প্রকাশ করলেন। তাকে ঘিরে সৃষ্টি হল বাংলার ইতিহাস সমাজ সংস্কৃতি প্রভৃতি আলোচনার আবর্ত।[১৮]

'বঙ্গদর্শন'-এর ইতিহাস-চিন্তাকে প্রধানত দুভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে— প্রথমত, বাংলার ইতিহাস এবং দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের ইতিহাস।

বাংলার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে, বাংলাদেশে আর্য আগমনের কাল এবং বাঙালির উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' প্রবন্ধে (ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, ১২৮০) তিনি দেখিয়েছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বা তার কাছাকাছি কোনো সময়ে বাংলাদেশে আর্য অনুপ্রবেশ ঘটেনি। তাঁর মতে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাংলাদেশে আর্য ছিল না। বস্তুতপক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মণ ও আর্যকে সমার্থক বলে মনে করেছেন। বাঙালির উৎপত্তি নির্ণয়েও তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন যে, প্রথমে কোলবংশীয় অনার্য, তারপর দ্রাবিড় বংশীয় অনার্য, তারপর আর্য— এই তিনে মিলে আধুনিক বাঙালি জাতির উৎপত্তি হয়েছে।

'বঙ্গদর্শন'-এ বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনার এক প্রধান অংশ অধিকার করেছিল সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয় কলঙ্কের অপনোদন প্রচেষ্টা। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ঐতিহাসিক ভ্রম' (ভাদ্র, ১২৮১) প্রবন্ধে এই কলঙ্ক দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। 'মৃণালিনী' উপন্যাসে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র গৌড় অধিকারের পিছনে চক্রান্তের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (অগ্রহায়ণ, ১২৮৭) প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন যে সপ্তদশ অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ার খিলজী যে বাংলা জয় করেননি, তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

'মুসলমান কর্তৃক বাঙ্গালা বিজয়' (আশ্বিন, ১২৮৯) প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে বিস্তৃত

আলোচনা করে বলেছেন মুসলমান কর্তৃক বাংলা জয়ের যাবতীয় তথ্যের মূল উৎস আবু ওমর মিনহাজউদ্দীন জর্জাতির 'তাকরাত নাছিরি' নামক পারসিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা প্রচার করেছেন যে সপ্তদশ অশ্বারোহী বাংলা জয় করেছিল। এই রচনা বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতে পারেননি। তার কারণ—

প্রথমত, সতের জন সৈনিক বাংলা জয় করেছিল এ তথ্য মিনহাজ দেননি। তিনি বলেছেন সতের জন অশ্বারোহী চাতুরী আশ্রয় করে পুরীতে প্রবেশ করেছিল এবং অবশিষ্ট সেনারা তাদের পশ্চাতে এসে পুরী ও নগর দখল করেছিল।

দ্বিতীয়ত, মিনহাজ নিজেই বলেছেন যে বখতিয়ার এক বছরে বাংলা জয় সম্পন্ন করেছিলেন।

তৃতীয়ত, এক বছরে সমস্ত সেনা নিয়ে বখতিয়ার যা জয় করেছিলেন তা বাংলা নয়— লক্ষ্মণাবতী। সে সময় বাংলা যে ন-দশটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল তার একটি জয় করেই বখতিয়ার বাংলার জয়কর্তা বলে ইতিহাসে খ্যাত হয়েছেন। এছাড়াও মিনহাজের লিপিবদ্ধ করা বাংলা জয়ের ইতিবৃত্তে অজ্ঞাতবশত ভুল থাকাও বিচিত্র নয়। বাংলা জয়ের ষাট বছর পরে তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন, কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ আশ্রয় করেও তাঁর গ্রন্থ লিখিত হয়নি, কোন বিশ্বস্ত সূত্রেও তিনি তথ্য প্রাপ্ত হননি। বাংলা জয়ের নিযুক্ত যোদ্ধা বলে কথিত বৃদ্ধদের কাছ থেকে এ ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলেন। মিনহাজকে তারা সত্য কথা যদিও বা বলে থাকেন, তবুও মিনহাজ যে সে কথা যথাযথ লিপিবদ্ধ করেছেন, তার প্রমাণ কোথায়? হিন্দু ইতিহাসের অনেক ঘটনাই যে মুসলমান লেখকেরা গোপন করেছেন তার পরিচয় পাওয়া যায়, উড়িষ্যা, রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমের এই উক্তি যে অমূলক নয়, এ যুগের ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের আলোচনা থেকে তা প্রমাণিত হয়।[১৯]

মোগলযুগের ইতিহাস, বিশেষত সম্রাট আকবর সম্পর্কে বেশ অভিনব কিছু মন্তব্য শোনা যায় 'বঙ্গদর্শন'-এর পৃষ্ঠায় বঙ্কিমের লেখনীতে। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (মাঘ, ১২৮১) প্রবন্ধে তিনি বাঙালির দুঃখ দুর্দশার জন্য আকবরকে দোষারোপ করেন। মোগল শাসন অপেক্ষা পাঠান শাসনকালকে তিনি বাংলার পক্ষে কল্যাণকর বলে মনে করেছিলেন। পাঠান এদেশকে স্বদেশ বলে মনে করেছিল, ফলে বাংলার অর্থ বাংলাতেই ছিল। এছাড়া তৎকালে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে সাহিত্য-দর্শনে বাংলার সংস্কৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। অপরদিকে মোগল শাসনে সত্যই বাঙালির মনের ক্ষেত্রে কোনো নবীন শস্য সৃষ্টি হয়নি। বঙ্কিমের এই অভিযোগ আধুনিক ঐতিহাসিক সমর্থন করেন —

> Mughal rule in Bengal Preserved its character of a foreign conquest. The Viceroys and officers came and went without taking any real interest in the life of the province. A considerable part of the resources of the land was drained away to upper India in the form of presents or cash tributes.[20]

নবলব্ধ জাতীয় চেতনার আলোকে এবং স্বাজাত্যবোধের প্রেরণায় ঐতিহাসিক চরিত্র এবং ঘটনাকে বিচার করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে। পলাশির যুদ্ধ সম্পর্কে

বিপরীতধর্মী মন্তব্যের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র এ কার্য সূচনা করেছিলেন। পলাশির যুদ্ধে বাংলার যে প্রকৃত পরাজয় ঘটেনি, এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' (অগ্রহায়ণ, ১২৮৭) প্রবন্ধে।

এছাড়াও মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বের সন্ধি ক্ষণের ইতিহাসের একটি সুসঙ্গত আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম' উপন্যাসে।

প্রাচীন বাংলাদেশের ন্যায় প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনার প্রয়াসও 'বঙ্গদর্শন' করেছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষ যে শিক্ষায়, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে উন্নত ছিল এবং কোনো কোনো বিষয়ে যে পাশ্চাত্য অপেক্ষাও সভ্য ছিল তা সপ্রমাণ করতে 'বঙ্গদর্শন' আগ্রহী হয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতার মূল্যবান এবং প্রাচীনতম দলিল হল বেদ। এজন্য বেদে প্রতিফলিত সমাজচিত্র সংকলনে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল, আর্য ও দস্যুদের বর্ণ, বৃত্তি, তাদের নগর ক্রীড়াকীর্তি, আমোদ-প্রমোদ, অস্ত্রব্যবহার ইত্যাদি বর্ণনার দ্বারা তৎকালীন সভ্যতাকে এক বিশিষ্ট রূপদান করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, যার ব্যাপক নিদর্শন প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত'-এ। আটটি প্রস্তাবে ভূবৃত্তান্ত, আর্য-অধ্যুষিত ভূ-ভাগ, কালের বিবর্তনে সেগুলির নাম ও অবস্থানের পরিবর্তন রহস্য, বেদ-জ্যোতিষ-দর্শন ইত্যাদির পঠন-পাঠন, সমাজে দেব-প্রীতি, ভীতি, পরলোক সম্পর্কিত তদানীন্তন ধারণা, অন্ত্যেষ্টি-সম্পাদন, রাজধর্ম, ব্রাহ্মণ্যবর্গ, বৈশ্যবর্গ, সামরিক বৃত্তান্ত সমস্ত কিছুই উদাহৃত হয়েছে। এ জাতীয় প্রয়াসের আরেকটি নিদর্শন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'ভারতমহিমা' (মাঘ, ১২৮১) প্রবন্ধ। এতে তিনি সংখ্যালিখন আবিষ্কারে, বীজগণিত সৃষ্টিতে, জ্যোতিষ চর্চায়, রসায়ন শাস্ত্রে ভারতবর্ষ যে জগতের অন্যান্য দেশের অগ্রবর্তী ছিল এবং কালক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যে ভারতের কাছ থেকে এসব বিদ্যা শিক্ষা করেছে—সে তথ্য তিনি প্রমাণ করেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যেও ভারতের অগ্রসরতার কথা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর 'ভারতকলঙ্ক' (বৈশাখ, ১২৭৯), 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' (ভাদ্র, ১২৮০) এবং 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি' (আশ্বিন, ১২৮০) প্রবন্ধ গুলিতে প্রমাণ করেছেন যে ভারতবাসী চিরকাল হীনবল ছিল না। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান করে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে—ভারতবাসী চিরকালই effiminate নয়। বহু সমরাভিজ্ঞ জাতিকেও ভারতবর্ষ জয় করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। গ্রীকজাতি হিন্দুর রণনৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেছে এবং একথাও সত্য যে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুজাতি আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে।

এছাড়া প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' (মাঘ-চৈত্র, ১২৮০; আষাঢ়, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ১২৮১; জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ১২৮২) প্রবন্ধে, লালমোহন শর্মা (বিদ্যানিধি)-র 'ভারতবর্ষীয়দিগের আদিম অবস্থা' (ফাল্গুন, ১২৮০) প্রভৃতি প্রবন্ধে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'আমাদের গৌরবের দুই সময়' (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৪) প্রবন্ধে আর্য অনুপ্রবেশের পূর্ব থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ইতিহাসের ধারাটি স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন।

ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে 'বঙ্গদর্শন' পূর্বসূরীদের গবেষণা থেকে সহায়তা পেয়েছিল,

কিন্তু সে খুব সামান্য । তাই বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠী নিজের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সন্ধান করে প্রকৃত ঐতিহাসিকের কর্তব্য সম্পাদন করেছিল । বিদেশি পর্যটকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তাঁরা যেমন কাজে লাগিয়েছেন, তেমনি প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ, নথিপত্র, ইমারৎ, মুদ্রা, শিলালিপি ইত্যাদির গুরুত্ব বুঝেছিলেন, এমনকি সংস্কৃত গ্রন্থগুলি থেকে তাঁরা সাহায্য নিয়েছিলেন । সুতরাং উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন ।

বস্তুতপক্ষে, 'বঙ্গদর্শন' বাঙালির ইতিহাস-চেতনাকে জাগ্রত করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল । নিজ মনের আকাঙক্ষা ও প্রবণতা অনুযায়ী এবং উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির স্বদেশ-চেতনার আলোকে তাঁরা ইতিহাস-চর্চা করেছেন । 'আমার দেশ', 'আমার বাংলা' এই বোধই তাঁরা তাঁদের প্রবন্ধে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন ।

ইতিহাস-চর্চায় 'বঙ্গদর্শন'-এর সচেতনতা ও সতর্কতার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন দিকে । যেমন, 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকবৃন্দ মনে করতেন যে 'তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা এবং অনলস অধ্যবসায় নিয়ে ইতিহাসের সাধনা করা বাঞ্ছনীয় । যে কোনো বিষয়েই যত বেশি অনুসন্ধান করা যায় ততই ভাল ।

ইতিহাস-চর্চায় তাঁরা সন-তারিখের গুরুত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন । কেন না 'সনতারিখশূন্য যে ইতিহাস, সে পথশূন্য অরণ্যতুল্য ।' (বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯) । অতীতের সমস্ত ঘটনা ও তথ্যসমূহ উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই ।

সুতরাং নিরাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তথ্য-প্রমাণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে 'বঙ্গদর্শন' যে ইতিহাস চর্চার সূচনা করে বাংলা সংস্কৃতি জগতে তা আজও গৌরবের বিষয় । সর্বোপরি, সর্বপ্রথম বাঙালির ইতিহাস চেতনাকে জাগ্রত করতে তারা সমর্থ হয়েছিল । 'বঙ্গদর্শন' সাহিত্য-চর্চার ন্যায় ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও স্বাধীন আনন্দ সঞ্চারের চেষ্টার ত্রুটি করেনি । রবীন্দ্রনাথের কথায় ইতিহাসের বড় সিংহদ্বারটা খোলার কৃতিত্ব হয়ত তার প্রাপ্য নয়, কিন্তু সেই সিংহদ্বারের প্রবেশপথটি সাধারণের পক্ষে সুগম করে তোলার চেষ্টা যে 'বঙ্গদর্শন' করেছিল এবং তাতে যে সাফল্য অর্জন করেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত দেশে শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস চর্চার চেষ্টা তেমন ছিল না, পত্রিকাটি সেই বিশৃঙ্খল প্রচেষ্টাকে একটি সুশৃঙ্খল রূপ এবং পরিণতি দেবার চেষ্টা করেছিল ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মানসকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলায় প্রয়াসী হয়েছিল 'বঙ্গদর্শন' । সাহিত্য ও বিজ্ঞান উভয়েরই সমুচিত পর্যালোচনা ছাড়া মানুষ উন্নতি করতে পারে না বলে তাঁদের ধারণা ছিল । ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করা বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল । বিশেষত, আর্থিক উন্নতি তথা শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির জন্যও প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চা । বিজ্ঞানের বলেই ইংরেজ শ্রেষ্ঠত্বলাভ করেছিল, তাঁর সমকক্ষ হতে গেলে বা তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ হতে গেলে বিজ্ঞান-বলে বলীয়ান হতে হবে । সর্বোপরি 'বঙ্গদর্শন' আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা পদ্ধতিতে কয়েকটি ত্রুটি দেখেছিল । বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হত ইংরেজিতে, পাঠ্যপুস্তকগুলিও সরল ছিল না, বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া শুরু হত

ছাত্রের বেশি বয়সে। 'বঙ্গদর্শন' মনে করত, বাংলা ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান পুস্তকে চিত্রসহযোগে পরিস্কার ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত এবং ছাত্রকে বাল্যকাল থেকেই বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া বিধেয় ।

বিজ্ঞান সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শন'-এর আগ্রহের প্রমাণ ছড়িয়ে আছে বিচিত্র বিষয় আশ্রিত প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে। পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানের ধারা ও অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁরা যে বহু অধ্যয়ন করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রবন্ধ মধ্যে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর নামের ও কর্মের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় দেখে। 'বঙ্গদর্শন'-এর জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীব ও শরীরবিদ্যা, প্রাকৃতিক নিয়ম, আকাশ-অভিযান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ত্রিশটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। নিদর্শন স্বরূপ বলা যায় 'বিজ্ঞান-কৌতুক' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯), 'চন্দ্রের বৃত্তান্ত' (চৈত্র, ১২৮৫), 'সূর্যমন্ডল' (আশ্বিন, ১২৮২), নামক জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক প্রবন্ধ 'পরিমাণ-রহস্য' (চৈত্র, ১২৮০-আষাঢ়, ১২৮১) 'চঞ্চল জগৎ' (ভাদ্র, ১২৮০), 'পঞ্চভূত' নামক পদার্থবিদ্যাবিষয়ক প্রবন্ধ, 'বৈজিক তত্ত্ব' (অগ্রহায়ণ, পৌষ, চৈত্র, ১২৮৪ ; বৈশাখ, শ্রাবণ, ১২৮৫) নামক জীববিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ হিসাবে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এগুলি ছাড়াও 'ধূলা' (ফাল্গুন, ১২৭৯), 'আদিম মনুষ্য' (ভাদ্র, ১২৮২), 'অতল স্পর্শ' (ভাদ্র, ১২৭৯), 'ভাবী বসুমতী' (আশ্বিন, ১২৮২), 'সরল জ্বরচিকিৎসা' প্রভৃতি প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয়েছিল ।

বিজ্ঞান-চর্চায় 'বঙ্গদর্শন' ছিল পুরোপুরি বস্তুনিষ্ঠ, কোনরকম কল্পনাকে সে প্রশ্রয় দেয়নি। যারা বিজ্ঞানে কল্পনার মিশ্রণ ঘটায় কিংবা ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানকে জড়িয়ে ফেলে 'বঙ্গদর্শন' তাদের তিরস্কার করেছিল । আবার অসমর্থিত ও অপ্রমাণিত পদ্ধতিতে সর্পবিষচিকিৎসার কথা বলায় বিশ্ববিষ চিকিৎসার লেখককে তিরস্কৃত করা হয়েছিল 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' (ভাদ্র, ১২৭৯) প্রবন্ধে ।

'বঙ্গদর্শন'-এ প্রথম কয়েক বছরে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক চেতনা ও প্রখর যুক্তিবাদিতা অজ্ঞেয়বাদ ছাড়িয়ে প্রায় নিরীশ্বরবাদের কাছাকাছি এসেছে । বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণ নিরাবেগ, নৈর্ব্যক্তিক, পক্ষপাতহীন । 'জৈবনিক' (কার্তিক, ১২৮০) প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

'যেটি যথার্থ তাহাই মানিব । ...যিনি প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিব।'

হরিকিশোর তর্কগীশের 'ন্যায় পদার্থতত্ত্ব' গ্রন্থের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ 'জ্ঞান সম্পর্কে দার্শনিক মত' (ফাল্গুন, ১২৮১) নামক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । প্রবন্ধটি আসলে জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ । এখানে বঙ্কিমচন্দ্র একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন । যা জানি তা-ই জ্ঞান । কিন্তু প্রশ্ন এই— কিভাবে আমরা জ্ঞেয় বিষয়কে জানি, ন্যায় ও সাংখ্যদর্শনে তিনটি মাধ্যম বা প্রমাণের কথা বলা হয়েছে—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ । পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগে আমরা যা জানি তা প্রত্যক্ষজ্ঞান ।

'বঙ্গদর্শন'-এ ১২৮২ সালের বৈশাখ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 'মিল, ডার্বিন এবং হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন । প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ, যুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞাননিষ্ঠ মানসের পরিচয়

পাওয়া যায় । প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয় মুখ্যত তিনটি— ঈশ্বরের অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণ এবং হিন্দুধর্মের ত্রিদেবের উপাসনার নৈসর্গিক ভিত্তি । আলোচ্য প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনজিজ্ঞাসার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে, তাঁর জীবনের তীর্থযাত্রার সেই ইতিহাস বিচিত্র এবং বহুমুখী ।

'বঙ্গদর্শন'-এর বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য ছিল জনকল্যাণের খাতিরে বিষয়টির প্রতি সাধারণের কৌতূহল উদ্রিক্ত করা এবং এভাবে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করা । এ কারণেই প্রবন্ধগুলিকে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য করে তোলার চেষ্টাও ছিল । বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বগুলিকে বর্জন করা হয়েছিল সাধারণ পাঠকদের কথা চিন্তা করে । বিজ্ঞান আলোচনার ভাষাও ছিল সরস। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখকেরা কেউই বিজ্ঞানী ছিলেন না । বিজ্ঞান তাঁদের প্রিয় বিষয় ছিল, বিজ্ঞান শিক্ষার উপযোগিতা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন এবং স্বদেশবাসীকে সেই জ্ঞানের চর্চায় তাঁরা উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন । এখানেই 'বঙ্গদর্শন'-এর বিজ্ঞানচর্চার সর্বাধিক

বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত বা প্রাসঙ্গিক মন্তব্য থেকে 'বঙ্গদর্শন'-এর সমাজচিন্তা বা সংস্কার চিন্তা সম্পর্কিত ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় । 'বঙ্গদর্শন'-এর কোনো কোনো লেখক মনে করতেন, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য মানুষ যখন থেকে অপরের মুখাপেক্ষী হতে শুরু করেছে, সমাজের জন্ম তখন থেকেই তাছাড়া একত্র বসবাস করবার একটা সহজাত প্রবৃত্তিও মানুষকে সমাজগঠনে প্রণোদিত করেছে । এজন্য সমাজ তৈরি হয়েছে স্বাভাবিক কারণেই, স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে । সচেতন প্রচেষ্টায় কেউ সমাজ সৃষ্টি করেনি । এভাবে সৃষ্ট সমাজ ক্রমশ উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে। কিন্তু কালক্রমে তার উন্নতির সমস্ত দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায় । বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কার এবং আচার-আচরণ তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলে । সমাজ পুরোপুরি স্থানু হয়ে পড়ে । একারণেই মাঝে মাঝে সমাজে পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় ।

'বঙ্গদর্শন'-এর কালে বাঙালি সমাজব্যবস্থায় এক গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছিল । আমাদের বহুকাল প্রচলিত সামাজিক আদর্শ তখন অন্তত শিক্ষিতদের ক্ষেত্রে ভেঙ্গে পড়েছিল । কিছু কিছু নতুন আদর্শও উদ্ভুত হচ্ছিল, ফলে সেই নতুন পরিস্থিতিতে সমাজকে সংগঠিত করার, তার রূপ ও আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার একটা দায়িত্ব সম্পর্কে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন । তাছাড়া ছিল বিবিধ সামাজিক সমস্যা বিষয়ে রক্ষণশীলদের প্রতিক্রিয়াশীল ও অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত । এমতাবস্থায় 'বঙ্গদর্শন' বিবিধ সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তার মতামত ব্যক্ত করেছিল ।

তৎকালীন সমাজের একটি বহুবিতর্কিত প্রথা বাল্যবিবাহ প্রথা । বাল্য বিবাহ সম্পর্কে স্বতন্ত্র কোনো প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয়নি, তবে প্রসঙ্গক্রমে দু-এক স্থানে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিমত ব্যক্ত হয়েছে । বাঙালির শারীরিক দুর্বলতার জন্য অনেকে বাল্যবিবাহকে দায়ী করেছেন । 'বঙ্গদর্শন'-এর লেখক তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গোন্নয়ন' প্রবন্ধে এই মতকে অস্বীকার করেছেন । তিনি মনে করতেন 'বাঙ্গালীর দুর্বলতার জন্য দায়ী বাংলার জলবায়ু, বাল্যবিবাহ

নয়'। তবে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে যাঁরা সচেতন ছিলেন তাঁরা দেখেছিলেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ফলে এই প্রথা ক্রমশ দূর হচ্ছিল। তাছাড়া নব্য-সম্প্রদায় বালিকা বিবাহের পক্ষপাতী ছিল না। বাল্য বিবাহের সপক্ষে প্রাচীনপন্থীদের যুক্তি ছিল অল্পবয়সে বিবাহ না দিলে ছেলেরা দুশ্চরিত্র হয়ে যায়। 'বঙ্গদর্শন' এই যুক্তির সারবত্তা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিল।

বাল্যবিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব প্রসন্ন ছিল না। তিনি মনে করতেন বাঙালির দুর্বলতার মুলে আছে প্রজাবৃদ্ধি আর প্রজাবৃদ্ধির মূল বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহের বন্ধন জাতির মজ্জায় যেভাবে জড়িয়ে আছে তাতে এ জাতির উন্নতির সম্ভাবনা খুব কম বলেই তাঁর মনে হয়েছিল—

> যে দেশে বাপ মা ছেলে সাঁতার শিখিতে না শিখিতে বধূরূপ পাথর গলায় বাঁধিয়া দিয়া, ছেলেকে এই দুস্তর সংসার সমুদ্রে ফেলিয়া দেয় সে দেশের উন্নতি হইবে ?[১১]

লঘুচালের ঐ প্রবন্ধটি ছাড়া অন্য কোনো স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ সম্পর্কে কোনো কথা তিনি বলেননি। তিনি হয়ত আশা করেছিলেন শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং অর্থনৈতিক কারণে এ প্রথা আপনা থেকেই বিলুপ্ত হবে।

বহুবিবাহ প্রথাও সমাজের আর একটি অতি বিতর্কিত সমস্যা। 'বঙ্গদর্শন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র এ সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর রচিত বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সমালোচনা কালে বঙ্কিমচন্দ্র সে সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন 'বহুবিবাহ' (আষাঢ়, ১২৮০) প্রবন্ধে। বহুবিবাহ যে হিতকর নয় সে বিষয়ে তিনি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একমত। বহুবিবাহ সমর্থকদের তিনি কুসংস্কারাবিষ্ট বলেছেন। কিন্তু বহুবিবাহ নিরোধে বিদ্যাসাগর যে যুক্তির অবতারণা করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র সেগুলির কোনো গুরুত্বই স্বীকার করেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগরের সমালোচনা বেশ তীব্র রকমেরই হয়েছিল। এমনকি অনেক সময়ে তা সাহিত্যক্ষেত্র থেকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও প্রবেশ করেছিল। বহুবিবাহ আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত—একথা প্রতিপন্ন করা যদি বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল, তাহলে শুধু বিদ্যাসাগর নয়, তাঁর প্রতিপক্ষকেও বিরূপ সমালোচনা করা উচিত ছিল। আর বিদ্যাসাগরের আন্দোলনে কোন কাজ হয়নি এমন কথাও বলা যায় না।

১৮২৯ খ্রীঃ-এ সতীদাহ প্রথা আইন বিরুদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই এ সম্পর্কে আলাপ আলোচনাও কিছুদিনের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন পরে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'সতীদাহ' (আষাঢ়, ১২৮৪) নামে প্রবন্ধে সহমরণ আইন বিরোধী হলেও সমর্থন করেছিলেন। দুঃখের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পুড়ে মরার উপদেশ যিনি দেন, তাঁর মানবপ্রীতি সত্যই অদ্ভুত। বিধবাদের দুঃখ তাঁর প্রাণে অধিক পরিমাণে বাজলেও তাদের সুস্থ জীবনযাপনের কোনো পন্থা তিনি নির্দেশ করতে পারেননি। চন্দ্রশেখরের বক্তব্য 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমোদন লাভ করেনি। অন্যদিকে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রবন্ধটির প্রতিবাদে 'সতীদাহ' (কার্তিক, ১২৮৪) নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে চন্দ্রশেখরের হৃদয়বত্তাকে মেনে নিলেও তাঁর চিন্তার অসঙ্গতিগুলিকে নির্মমভাবে সমালোচনা করেছিলেন। প্রবন্ধটির মধ্যে

নগেন্দ্রনাথের প্রগতিশীল ও উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ।

সমকালীন সমাজের বিধবাবিবাহ বিষয়টিও 'বঙ্গদর্শন'-এর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হলেও 'বঙ্গদর্শন'-এর অধিনায়ক বঙ্কিমচন্দ্র একে হৃদয় দিয়ে সমর্থন করতে পারেননি । 'মৃণালিনী' উপন্যাসে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে তাঁর দোলাচল চিত্তবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় । বিধবা বিবাহের যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে তিনি তখনও পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি । 'মৃণালিনী'তে হেমচন্দ্র ইহকাল পরকালের ভয় দেখিয়ে মনোরমাকে বিধবাবিবাহ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছে । অন্যদিকে পশুপতি বলেছে, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করতে সে পারবে, কিন্তু মনোরমার সঙ্গে তার বিবাহে বাধা বংশ সম্পর্কিত—একজন কুলীন কন্যা, অন্যজন শ্রোত্রীয় । 'মৃণালিনী'র পটভূমিকা অতীত কালের হলেও সমসাময়িক সমাজচিন্তার ছায়াই উপন্যাসে বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গের অবতারণার কাজ করেছে। আর এ ব্যাপারে হেমচন্দ্রের মতামতকেই গ্রন্থকারের মতামত হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে ।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের (১ম/১১শ) সূর্যমুখীর পত্রে সরাসরি বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ লক্ষ্য করা যায় —

'আর একটা হাসির কথা । ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পন্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন । যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পন্ডিত তবে মূর্খ কে ?'

বস্তুতপক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্র যে বিধবাবিবাহ সমর্থন করেননি, তাতে তাঁর সমাজনীতিতে দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় । কারণ আইনমতে ও শাস্ত্রমতে বিধবার বিবাহ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও তা যে এদেশের সমাজব্যবস্থায় সমমর্যাদায় গৃহীত হবে না, সাধারণ মানুষের চিরাগত সংস্কারপুষ্ট মানসিকতা ভঙ্গ করা যে অসম্ভব, এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন । সর্বোপরি সামাজিক স্তরে শিক্ষাদীক্ষায় যথেষ্ট উন্নতি ঘটলেও বিধবাবিবাহ যে আজ তেমন স্বীকৃত হয়নি তাও সত্য।

জাতিভেদ সমাজের অত্যন্ত পুরনো প্রথা । 'বঙ্গদর্শন' বিভিন্ন জাতির উৎপত্তির কারণ, তার সুফল-কুফল, জাতির বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য, অন্যদেশের জাতিবিভাগের সঙ্গে এ দেশের জাতিভেদের তুলনা, সেই সূত্রে বিদেশী অ্যাপ্রেনটিসশিপের সঙ্গে আমাদের দেশের উত্তরাধিকার সূত্রে বৃত্তিগ্রহণের আপেক্ষিক উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল 'জাতিভেদ' নামাঙ্কিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে । কার্তিক, ১২৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধের লেখক শ্রীযঃ ছিলেন জাতিভেদ প্রথার বিরোধী । তবে তিনি মনে করেছেন, সহজে এ প্রথা দূর হবে না এবং জাতিভেদ দূর করার উদ্দেশ্য থাকলেও এদেশে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মেরা এক-একটি নতুন বর্ণ সৃষ্টি ব্যতীত সমাজের আর কোন উপকার করতে পারেননি । লেখক অনেক সময়ই, জাতির পার্থক্যকে শুধু বৃত্তির পার্থক্য বলে মনে করেছেন । অনেক স্থলে লেখক ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন । বস্তুতপক্ষে জাতিভেদপ্রথা সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শন' উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেনি । কর্ণধার বঙ্কিমচন্দ্রও এ বিষয়ে একেবারেই নীরব ছিলেন বললে অত্যুক্তি করা হয় না ।

'বঙ্গদর্শন'-এর কালে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে ইংরেজ প্রবর্তিত বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতির সংঘর্ষে ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতিই জয়ী হয়েছিল এবং সমাজের মর্মমূলে তার প্রভাবও বিস্তৃত হতে শুরু করেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ভারতীয় সমাজে যে প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছিল, 'বঙ্গদর্শন' সে ব্যাপারে সচেতন ছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলে দেশীয় রীতিনীতি, আদর্শ ক্রমে ক্রমে পরিত্যক্ত হয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বঙ্কিমচন্দ্র এ ব্যাপারে সহমত ব্যক্ত করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল এবং কুফল উভয় দিকে আলোচনায় বঙ্গদর্শন দৃষ্টি দিয়েছিল। পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—

'ইহা বলিতে পারি যে ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান।'

তবে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবলুপ্তিজনিত ক্ষতির দিকেও পত্রিকাটির দৃষ্টি পড়েছিল। এছাড়াও ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে অশিক্ষিত মানুষের এক দুস্তর ব্যবধান যে গড়ে উঠেছিল তাও 'বঙ্গদর্শন' প্রত্যক্ষ করেছিল। সর্বোপরি পাশ্চাত্য শিক্ষায় নব্যশিক্ষিতরা দেশীয় ভাষার চর্চা ও উন্নতিবিধানে সচেষ্ট না হওয়ায় 'বঙ্গদর্শন' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় সর্বপ্রথম অভিনিবেশ করল। পত্রসূচনায় মেকলের 'অভিসেচনতত্ত্ব'কে (Filtration Theory) তিনি সমর্থন করতে পারেননি। কার্যকালে বঙ্কিমচন্দ্রের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। তাই তিনি বাংলাভাষার উন্নতিসাধনে সর্বাগ্রে মনোনিবেশ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সহ 'বঙ্গদর্শন'-এর অন্যান্য লেখকেরা শিক্ষা বলতে শুধু পুঁথিগত বিদ্যার্জনই মনে করেননি। বরং সমাজ পরিবেশ এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকেও তারা গুরুত্ব দিয়েছেন। এ জাতীয় শিক্ষায় মন প্রস্তুত হলে সমাজের সংস্কার সহজ হয় বলে তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'শিক্ষা' (আষাঢ়, ১২৮৭) প্রবন্ধে বলেছেন—

'শিক্ষাব্যবস্থায় শরীর সুস্থ সবল রাখার দিকে যেমন দৃষ্টি দিতে হবে তেমনি বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তি এই তিন মানসিক গুণের বিকাশের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।'

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ধারাতেই দেশবাসী শিক্ষিত হয়ে উঠবে বলে 'বঙ্গদর্শন' মনে করত। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' লক্ষ্য করেছিল ইংরেজিতে শিক্ষাদানের ফলে তাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তির অভাব দেখা দিচ্ছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাপক এবং বহুমুখী বলে শেষ পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শন' মাতৃভাষাই শিক্ষাদানের মাধ্যমে হওয়া উচিত বলে সিদ্ধান্তে এসেছিল।

নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয়নি। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে আশানুযায়ী সাফল্যের অভাব 'বঙ্গদর্শন'-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মনুষ্যফল' প্রবন্ধে (আশ্বিন, ১২৮০) বলছেন—

'স্ত্রীলোকের বিদ্যা কখন আধখানা কখন আধখানা বৈ পুরো দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না—স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়।'

'বঙ্গদর্শন' মনে করত স্ত্রীশিক্ষা বৃদ্ধি না পাওয়ার মূল কারণ হল বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ এবং অবরোধ প্রথা। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বোম্বাই ও বাঙ্গালা' (আষাঢ়, ১২৮৪) প্রবন্ধে

এই মতই ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী সৎ পুস্তকের অভাবও ছিল বড় অন্তরায়। লক্ষণীয়, 'তত্ত্ববোধিনী'র মতো 'বঙ্গদর্শন'ও মনে করত স্ত্রীলোক এবং পুরুষের শিক্ষণীয় বিষয় কিয়দংশ স্বতন্ত্র হওয়া উচিত।

দর্শন ও ধর্মচিন্তা সম্বন্ধীয় আলোচনায় 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রগতিশীল এবং রক্ষণশীল উভয় মতবাদই স্থান পেয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন'-এর বিভিন্ন প্রবন্ধে হিতবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, সাংখ্য, ন্যায়, চার্বাক-বৌদ্ধ-জৈন দর্শন, পরলোক ও ঈশ্বর ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তার পরিচয় আছে। বিষয় বা তত্ত্বের দিক থেকে লেখকরা বিভিন্ন পথ ও মতকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। আর এটিই ছিল 'বঙ্গদর্শন'-এর দার্শনিক আলোচনার প্রস্তুতি পর্ব। এভাবে বিভিন্ন দর্শনকে বুঝতে যাওয়ার মধ্যে 'বঙ্গদর্শন'-এর উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র নিছক তত্ত্বশিক্ষার জন্য দর্শন পড়ার পক্ষপাতী ছিলেন না, দর্শন আলোচনার মাধ্যমে তিনি চেয়েছিলেন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা করতে।

সমকালীন বিভিন্ন পাশ্চাত্য তত্ত্ব-দর্শন নবজাগ্রত বাঙালি মানসকে খানিকটা আলোড়িত করলেও 'বঙ্গদর্শন' কিন্তু মিল-বেন্থামের হিতবাদ, জন স্টুয়ার্ট মিলের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সম্পূর্ণত গ্রহণ করেনি। বরঞ্চ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত কোঁতের প্রত্যক্ষবাদ দ্বারা 'বঙ্গদর্শন'-এর অনেক লেখক প্রভাবিত ছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও কোঁতের মানব-প্রীতিবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ তিনি এই তত্ত্ব প্রচার করেছেন—'পরের জন্য তোমার হৃদয়কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।' (কে গায় ওই ; ভাদ্র, ১২৮০)

'পরসুখ বর্ধন মানুষের সুখের মূল।' (আমার মন ; মাঘ, ১২৮০)

ব্রাহ্মণ সম্পর্কে কোঁতের আশাবাদী এবং সম্ভ্রমপূর্ণ মন্তব্য 'বঙ্গদর্শন' নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। কোঁত মনে করতেন যে, ব্রাহ্মণদের দ্বারাই ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার সম্ভব। 'বঙ্গদর্শন' গোষ্ঠীর যোগেশচন্দ্র ঘোষ এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যার প্রমাণ পাওয়া যায় 'অবিশ্রান্ত বৈরাগ্য' (বৈশাখ-আষাঢ়, ভাদ্র, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১২৮৯) প্রবন্ধে। ব্রাহ্মণ সম্পর্কে উঁচু ধারণা বঙ্কিমচন্দ্রও পোষণ করতেন। পৌষ, ১২৮১ সংখ্যার সম্পাদকীয় টীকায় তিনি বলেছেন— 'প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ব্রাহ্মণদিগের সৃষ্টি।'

তবে মিল, বেন্থাম, কোঁত, স্পেন্সার প্রমুখ কারও দর্শনই 'বঙ্গদর্শন' সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেনি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও পরিণত বয়সে এই সকল দর্শনকে সম্পূর্ণতই ত্যাগ করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন—

'তোমার মিল, কোঁত, স্পেন্সার, ফুয়ুরবাক মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শনবিজ্ঞান সকলই অসার, সকলই অন্ধের মৃগয়া।' (বুড়া বয়সের কথা, বৈশাখ, ১২৮৪)।

বলা যেতে পারে, এগুলি তাঁর চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং ভারতীয় দর্শন ও শাস্ত্রগুলির মধ্যে তিনি তাদের মূল সন্ধান করেছিলেন। বিশেষ করে কোঁতের সঙ্গে কপিলের, জ্ঞানের প্রত্যক্ষতাবাদের সঙ্গে চার্বাক মতের এবং কান্টের প্রত্যক্ষতা-প্রতিবাদের সঙ্গে বেদান্তের মায়াবাদের মিল 'বঙ্গদর্শন'-এর নজরে পড়েছিল। 'বঙ্গদর্শন' দেখেছিল—

আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন ফিরিয়া ফিরিয়া সেই প্রাচীন ভাবতীয় দর্শনে মিলিতেছে ।[২২]

এজন্য তাঁরা আর্যবুদ্ধির প্রশংসা করেছিলেন । বস্তুতপক্ষে, 'বঙ্গদর্শন'-এর ধর্ম ও দর্শনচিন্তার মূল বীজটি অঙ্কুরিত হয়েছিল শ্রীমদ্ভাগবদগীতার কর্মবাদের মাধ্যমে । পাশ্চাত্য দর্শনের জীবন-নীতিকে আরো বলিষ্ঠ ও অখন্ডরূপে 'বঙ্গদর্শন' প্রত্যক্ষ করেছিল অনুশীলন ধর্মের মাধ্যমে । অনুশীলন ধর্মে শারীরিক, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সম্যক স্ফুর্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, যা 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরানী' উপন্যাসে এবং 'ধর্মতত্ত্ব' প্রবন্ধে রূপলাভ করেছিল।

'বঙ্গদর্শন'-এ ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং অর্ধবিশ্বাসী ভক্তের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া অন্য কারো মধ্যে এ সম্পর্কে গভীরতর চিন্তনের পরিচয় পাওয়া যায় না । প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না । বারুইপুরে থাকাকালীন ১৮৬৪-৬৫ সালের বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কালীনাথ দত্ত মন্তব্য করেছেন—

> অনুবীক্ষণ সহযোগে কীটানু, নানা পুষ্করিণীর দূষিত জল, উদ্ভিদের সূক্ষ্ম ভাগ এবং জীবশোণিত প্রভৃতির সূক্ষ্মপদার্থ জাতির পরীক্ষা করতেন । এই সমস্ত পবীক্ষার সময়ে সৃষ্টির সৌন্দর্যরহস্যের কথা উঠলেও বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে ঈশ্বরের নাম শোনা যেত না ঈশ্বর বিশ্বাসের কোনো পরিচয় পাওয়া যেত না ।[২৩]

ঈশ্বরের নাম তাঁর মুখে প্রথম শোনা যায় 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 'একা—কে গায় ঐ' (ভাদ্র, ১২৮০) প্রবন্ধে । 'প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি', ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর ধারণা এখানে সুস্পষ্ট নয় । 'পতঙ্গ' (অগ্রহায়ণ, ১২৮০) প্রবন্ধে ঈশ্বরকে জানার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠেছে—'ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না' । 'বসন্তের কোকিল' (চৈত্র, ১২৮০) প্রবন্ধে অপরিজ্ঞাত ঈশ্বরকে তিনি মনে মনে ভজনা করেছেন । আর 'মিল, ডার্বিন ও হিন্দুধর্ম' (বৈশাখ, ১২৮২) প্রবন্ধে তিনি পুরোপুরি ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন এবং ভক্তিভাবে 'তাঁকে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করেছেন ।

'বঙ্গদর্শন'-এর দর্শন চিন্তা আলোচনা করলে বোঝা যায় একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া অন্য কেউ এ সম্পর্কে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেন নি । বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব একটা সমন্বিত দর্শন । ঈশ্বর চিন্তাই হোক, সমাজসেবাই হোক, যুদ্ধই হোক, মিত্রতাই হোক, সবকিছুই একটি মৌলিক জীবনদর্শন রচনা করে তিনি সমন্বিত ব্যক্তিত্বের আদর্শ স্থাপন করলেন । পাশ্চাত্য দর্শন থেকে প্রাপ্ত ব্যক্তির বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য এবং সুখসাধন আর মানবপূজার আদর্শ বা মানুষ প্রীতি—এই দুয়ের সঙ্গে ঈশ্বরভক্তি যুক্ত হলেই সার্থক ধর্মনীতি সৃষ্টি হয় বলে তিনি মনে করতেন ।

মননধর্মী রচনার পাশাপাশি লঘুরসের রচনা তথা নির্মল শুভ্র হাস্যরসের মাধ্যমে জগত ও জীবনকে পর্যালোচনার প্রথম প্রয়াসও 'বঙ্গদর্শন'-এর পৃষ্ঠায় দৃষ্টিগোচর হয় । বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮৪) হরপ্রসাদের 'হৃদয়-উদাস' (শ্রাবণ, ১২৮৭) ; রাজকৃষ্ণের 'স্ত্রীলোকের রূপ' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১)

চন্দ্রশেখরের 'জটাধারীর রোজনামচা' (ফাল্গুন, ১২৮৪-চৈত্র, ১২৮৫) ইত্যাদিতে তার উদাহরণ আছে।

ভাষারীতির দিক থেকেও 'বঙ্গদর্শন' পন্ডিতী গদ্য বা আলালী ভাষাকে গ্রহণ না করে প্রয়োজনসাধন, বৈচিত্র্যসম্পাদন, শ্রীবিধান— এই তিন লক্ষ্য-অভিমুখী ভাষার রূপ ও আদর্শ নিয়ে চিন্তা করেছিল। উপরিউক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যে 'বঙ্গদর্শন'-এর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বলে ভাষার ক্ষেত্রে কোনো দৃঢ়বদ্ধ নিয়ম প্রতিষ্ঠারও সে প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই 'বঙ্গদর্শন'-এর ভাষাব মূল সাধু থাকলেও তদ্ভব, লৌকিক, বিদেশি যে কোনো প্রকার শব্দই 'বঙ্গদর্শন'-এ ব্যবহৃত হত। ভাষাচিন্তায় এমন সংস্কারমুক্ততার জন্য 'বঙ্গদর্শন'-এর ভাষায় কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল—

প্রথমত, বাক্যের হ্রস্বতা: ছোট বাক্যে সরলতা এবং শক্তি দুই-ই আছে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'তে এর সূচনা। এর চরম রূপ সঞ্জীবচন্দ্রের 'মাধবীলতা'য়। যেমন—'মূর্খের নিকট শকুন্তলা বৃথা। অন্ধের নিকট চন্দ্রও মিথ্যা।'

দ্বিতীয়ত, বাক্যে কর্তা অনেক ক্ষেত্রেই অনুল্লিখিত: 'তাহাদিগের অবস্থা পূর্বে ভাল ছিল—বড় মানুষের মেয়ে।' (রাধারানী)

তৃতীয়ত, বৈচিত্র্যের জন্য পদবিন্যাসরীতির পরিবর্তন: 'রজনীর কাছে, কুমুদিনীর কথা বেদবাক্য'। (শৈশব সহচরী)

চতুর্থত, অলংকার সৃষ্টিতে গতানুগতিকতা বর্জন, লৌকিক উপমানের সাহায্য গ্রহণ— 'তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চুন, গেলাসের জল'। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাসিতে ইপিকাক, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে সুরুয়া।' (রজনী)

পঞ্চমত, প্রশ্নবোধক এবং বিস্ময়সূচক বাক্য ব্যবহারে বৈচিত্র্যসম্পাদন: 'সপ্তমী পূজার দিন কে আমাকে আফিম চড়াইতে বলিল। আমি কেন আফিম খাইলাম। আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম।' (আমার দুর্গোৎসব, কমলাকান্তের দপ্তর)

ষষ্ঠত, বৈচিত্র্যের জন্য পদবিন্যাসরীতির পরিবর্তন: 'মোকদ্দমাটি বিধবা হাইকোর্টে হারিল।' (রাধারাণী)

তবে ভাব-উপযোগী ভাষা ব্যবহারের প্রতিই 'বঙ্গদর্শন'-এর লক্ষ্য ছিল। তাই দেখা যায়, 'কৃষ্ণচরিত্রের ভাষারীতির সঙ্গে 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র ভাষারীতি পৃথক। 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা একই সঙ্গে পান্ডিত্য, ভাবুকতা, রসবোধ, কল্পনাশক্তি এবং নরনারীর চিত্তানুভূতি প্রকাশক্ষম হয়ে উঠেছিল। বিশিষ্ট সমালোচকের বিচারটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়—

> বিকাশমুখী বাঙালি জাতিকে জীবনের সর্ববিধ ভাব ও অনুভূতি প্রকাশেব সেই ভাষা প্রথম দান করে বঙ্গদর্শন। এদিক থেকে বঙ্গদর্শনের প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিমেয়।[২৫]

'বঙ্গদর্শন'-এর যুগে বঙ্গভাষার প্রতি শিক্ষিত বাঙালির মনোভাব ছিল বিরূপ। 'বঙ্গ-দর্শন' শিক্ষিত বাঙালির ইংরেজির মোহ ভাঙবার উদ্দেশ্যে পত্রসূচনাতে একটি ঘোষণা পেশ করেছিল।

'...ইংরাজি কেবল আমাদের মৃত সিংহের চর্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব। .....প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রায় সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়।'

বাংলা সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙালির বিরূপতার আর একটি গুরুতর কারণ ছিল তখনকার সাহিত্যে সুরুচিবোধের অভাব। তদানীন্তন বাঙালি রসিকতা বলতে বুঝত 'অশ্লীলতা, গালাগালি বা ইতর ইঙ্গিত। 'যাহা ভদ্রের অশ্রাব্য বা অপাঠ্য এবং সুনীতির বিনাশক, তাহাই তাঁহাদের কাছে রসিকতা।' ('রসিকতা', আষাঢ় ১২৭৯)

বাঙালির রুচি সংস্কারের প্রয়োজন 'বঙ্গদর্শন' অনুভব করেছিল এবং কোঁত কথিত intellectual sanitation রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। এজন্য 'বঙ্গদর্শন' অশ্লীলতাদুষ্ট গ্রন্থ প্রণেতাদের এবং পাঠকের নিম্নমানের রুচিকে কঠোরভাবে তিরস্কৃত করেছিল। এমনকি 'অশ্লীলতা নিবারনী সভা'কে সাধুবাদ জ্ঞাপন করে অশ্লীলতা আইনকে স্পষ্ট করার জন্য উপদেশও দিয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন' দেখেছিল যে, অশ্লীলতাও অপবিত্রতাব ছায়ামুক্ত হতে পারে। অনেক সময় অশ্লীলতা কাব্যের উৎকর্ষের জন্যও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু কুরুচিপূর্ণ লেখকদের বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন—

'যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করাদিব ন্যায় মনুষ্যজাতির শত্রু। এবং তাহাদিগকে তস্করাদির ন্যায় শারীরিক দন্ডের দ্বারা দন্ডিত করা বিধেয়।'

এভাবে 'বঙ্গদর্শন' বাঙালি পাঠককে স্বদেশের সাহিত্য সম্পর্কে অনুরাগ সৃষ্টি করেছিল, তার রুচি ও মানের উন্নয়ন ঘটিয়েছিল, অশ্লীলতার অপসারণে সার্বিক প্রচেষ্টা করেছিল এবং সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে এবং সাহিত্য-আস্বাদনের পথনির্দেশ করে 'বঙ্গদর্শন' পাঠককে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে শ্রদ্ধান্বিত করে তুলেছিল।

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পূর্বে এ দেশে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাব রূপটি সুস্পষ্ট ছিল না। 'বঙ্গ-দর্শন' তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছিল। 'বঙ্গ-দর্শন'-এর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও জাতি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাকে। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ফলেই আমরা উক্ত ধারণাটি পেয়েছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র দেখেছিলেন যে, রাষ্ট্রচেতনার অন্যতম প্রথম প্রয়োজন স্বাতন্ত্র্যপরতা। অতীত ঐতিহ্য এবং তৎকালীন ভারতে এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার অভাবের জন্য তিনি দুঃখ বোধ করেছেন। তিনি মনে করতেন হিন্দুর সমস্ত দুর্দশার মূলে ছিল জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব। জাতি প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন 'ভারত কলঙ্ক' (বৈশাখ, ১২৭৯) প্রবন্ধে। 'বঙ্গদর্শন' উপলব্ধি করেছিল বহুধাবিভক্ত ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে সম্মিলিত করার জন্য প্রয়োজন মাৎসিনির মতো নেতার। সচরাচর ধর্ম, ভাষা, বংশ, প্রাকৃতিক সীমা, সামাজিক আচার-বিচার, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বা দেশবাসীর প্রাকৃতিকগত সাদৃশ্য— এই কয়টি উপাদানের ভিত্তিতে কোন দেশে রাজনৈতিক একতার ভিত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে করে 'বঙ্গদর্শন' এই

উপাদানের কোনো একটির ক্ষেত্রে ঐক্য দেখতে পায়নি । ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাকে সুবিন্যস্ত করার জন্য 'বঙ্গদর্শন' কয়েকটি অভিমত প্রকাশ করেছিল—

প্রথমত, ভাষাবিভাগ অনুসারে ভারতবর্ষকে চারভাগে ভাগ কবতে হবে রাজনৈতিক ঐক্য সংস্থাপনের জন্য ।

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি প্রদেশের লোকের মধ্যে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্য বাড়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা ।

তৃতীয়ত, আন্তঃপ্রাদেশিক ভাব আদানপ্রদানের জন্য হিন্দি ভাষাকে আশ্রয় করা ।

জাতি প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা থেকে জেগেছিল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্খা এবং পরাধীনতার জন্য বেদনা । 'বঙ্গদর্শন' স্বাধীনতার মূল্য সম্পর্কে সচেতন ছিল । 'দেবনিদ্রা' কবিতায় শোনা গিয়েছিল 'স্বাধীনতার সম কি আছে আর' কিন্তু স্বাধীনতা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট মন্তব্য 'বঙ্গদর্শন'-এ পাওয়া যায় না ।

'বঙ্গদর্শন'-এর দুজন সম্পাদকই ছিলেন সরকারী কর্মচারী । তাই ব্রিটিশ সরকারের শাসননীতির স্পষ্ট সমালোচনা তাঁরা করেননি । অতি বিতর্কিত সমস্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' আভাসে ইঙ্গিতে তার মতামত ব্যক্ত করেছিল । ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আইন নিয়ে ভারতে যেখানে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিল, 'বঙ্গদর্শন'-এ সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'Branzonism' (ফাল্গুন, ১২৮৯) নামক প্রবন্ধে যথেষ্ট সংযম ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছিলেন । তিনি ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনপ্রণালীকে 'কালের শাসন' নাম দিয়েছিলেন । তিনি লক্ষ্য করেছিলেন অযোগ্য ব্যক্তি প্রায়শ দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত ছিল । নিয়োগ এবং পদোন্নতি সাধারণ পথ ধরে হত না ।

সমসাময়িক সময়ে প্রচলিত জুরির দ্বারা সুবিচার না পাওয়ার জন্য 'বঙ্গদর্শন' এই বিচারব্যবস্থাকে তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল । এ ছাড়া 'বঙ্গদর্শন' দেখেছিল মামলা-মোকদ্দমা ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, আদালত এবং বিচারকের সংখ্যা ছিল অল্প, অযোগ্য বিচারক এবং আইনের জটিলতার জন্য বিচারে বিলম্ব ঘটত । ত্রুটিগুলির কোনটিই লঘু নয় । এমন কি আজকের দিনেও। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবাসীকে সামান্য সিপাহী কর্ম ছাড়া অন্যসকল উচ্চ পদসমূহ থেকে বঞ্চিত করেছিল । তাই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠাব একটা প্রয়াস 'বঙ্গ-দর্শন'-এ দেখা গিয়েছিল । যেমন মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি মনোনয়নের প্রতিবাদ করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'যার কাজ সেই করুক' (পৌষ, ১২৮৭) প্রবন্ধে ।

উনিশ শতকে কৃষকদের জীবনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নানা দিক নিয়ে সুখ-সুবিধা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিল । 'বঙ্গদর্শন' কৃষকশ্রেণীর উন্নতির বিধানে কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে মহাভুল বলে মনে করেছিল । কেননা এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি । কৃষকদের দুর্দশা নিয়ে রচিত 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তাদের দুরবস্থার অকৃত্রিম রূপটি ফুটে উঠেছে । দেশেব অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শুধু কৃষি নয়, শিল্পসংস্থা এবং বাণিজ্যের অগ্রগতি প্রয়োজন । কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য ক্রমশই আমরা

বিলাতি দ্রব্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিলাম। 'বঙ্গদর্শন' দেশীয় শিল্পস্থাপনের ওপরও গুরুত্ব দিয়েছিল।

'বঙ্গদর্শন'-এর রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার মধ্যে কোন প্রকার ভাবালুতার স্থান ছিল না। কালাপযোগিতার দিকে দৃষ্টি রেখে লেখকবৃন্দ এবং সম্পাদক বিষয়বস্তু নির্বাচন করতেন। সমকালের অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সংবাদপত্রের মতো 'বঙ্গদর্শন' শুধুমাত্র স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে নিয়েই গলা ফাটায়নি, সেই সঙ্গে জাতি গঠনের, রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা, সচেতনতা এবং তজ্জাত আন্দোলনের কথা বলে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিল।

উদ্দেশ্য বিচারে 'বঙ্গদর্শন'-এর রচনাগুলিকে তিনশ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর রচনা ব্যাখ্যামূলক — ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা। ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিব আধুনিক প্রণালীতে পর্যালোচনা, নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববিশ্লেষণ, ইউরোপীয় সভ্যতার আলোচনা, অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যা ও সূত্র নির্ণয় ইত্যাদি এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনা ছিল উদ্দীপনামূলক। ইতিহাস প্রভৃতির আলোচনা সূত্রে বাঙালিকে কর্মগৌরবে উদ্দীপিত করে তোলাই ছিল এই শ্রেণীর প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষের রণনীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে বাঙালিকে শৌর্যে ও বীরত্বে নতুন করে জেগে উঠতে আহ্বান করেছিলেন। হেমচন্দ্র এবং অন্যান্য কবির কাব্যে নবজাগ্রত যে উৎসাহ উদ্দীপনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সুর ধবনিত হয়েছিল, সেই কর্মস্পৃহাকে 'বঙ্গদর্শন' বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে বাঙালির অন্তরে প্রবাহিত করার প্রয়াস শুরু করেছিল। পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র শানিত করতে চেয়েছিলেন বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মশক্তিকে। 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদিকে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায়। এগুলিকে সৃষ্টিমূলক রচনা নামে অভিহিত করা যায়। এই শ্রেণীর রচনার দ্বারা তিনি শানিত করতে চেয়েছিলেন বাঙালির হৃদয় এবং রসানুভব শক্তিকে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যত্বকে জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী, এবং চিত্তরঞ্জিনী— এই তিন বৃত্তির সমন্বয় বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তের মূল 'বঙ্গদর্শন'-এই নিহিত।

বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠীর সাহিত্য-আন্দোলনের প্রেরণা এসেছিল দেশ-সমাজ-জাতির কল্যাণ কামনা থেকে। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজের কল্যাণসাধন এবং নির্দিষ্ট দেশকালের মধ্যে জীবন গঠন। জীবনের সমস্যা বহুতর—নানা ক্ষেত্রে তার অভিব্যক্তি নানা ধরনের। সব বৈচিত্র্য এবং জটিলতাসহ জীবনের অগ্রসরতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা, তার বিস্তারকে অব্যাহত রাখা যেমন সহৃদয় সামাজিক ও সংস্কৃতিকর্মীর দায়িত্ব, তেমনি তাকে সংহত ও বিন্যস্ত করা, তার বিচিত্র প্রবণতাকে একই কেন্দ্রের অভিমুখীন করে রাখাও তাদের দায়িত্ব, কেন না বিশৃঙ্খল জীবন নিয়ে সমাজের চলে না, বাইরের বহুবিচিত্র জটিলতার মধ্যে একটা কেন্দ্র সংহতি না থাকলে জীবন সমাজের ভারমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত কারণে 'বঙ্গদর্শন' বিচিত্র প্রবণতাগুলিকে সংগঠিত করার দায়িত্ব নিয়েছিল। সেই সংহতিকরণের কারণেই 'বঙ্গদর্শন'-এর সকল চিন্তাই একটা সমন্বায়িত আদর্শের সাগরসঙ্গমে পৌঁছে গিয়েছিল।

নবজাগরণের মুহূর্তের সেই সন্ধিলগ্নে 'বঙ্গদর্শন' বুঝতে পেরেছিল, একদিকে রয়েছে ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাসের আশ্চর্য গতিশীলতা এবং অন্যদিকে আছে, ভারতবর্ষের শাস্তরসাশ্রিত জীবনদর্শ ও চিরাচরিত সংস্কার। এই দুই দিককে গভীরভাবে অনুধাবন করে 'বঙ্গদর্শন' এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে নবযুগের যে জ্ঞান ও বিদ্যা ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, তার প্রয়োজনীয় অংশটুকু যথার্থভাবে আত্মসাৎ করে জাতিকে আত্মস্থ হতে হবে। তাই দেশ, সমাজ, যুগ, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল বিষয়েই গভীর মননশক্তির মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ের তথ্যনির্ভর যুক্তিনিষ্ঠ স্বরূপ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 'বঙ্গদর্শন' পত্র প্রকাশকালে সম্পাদক নানা বিদ্যাকে লোকোপযোগী করে পরিবেশনের যে ব্রত নিয়েছিলেন, তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়েছিল। বিশেষত, মননশীল প্রবন্ধ সাহিত্যের যে বিরাট আয়োজন 'বঙ্গদর্শন'-এর পৃষ্ঠায় সূচিত হয়েছিল, তার প্রভাব পরবর্তীকালে প্রায় সবল চিন্তানায়ক প্রাবন্ধিকের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। কথাসাহিত্য ও লঘু হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ রচনাতেও 'বঙ্গদর্শন' বাংলা সাহিত্যে পথিকৃতের মর্যাদায় সমাসীন।

বস্তুতপক্ষে, উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালি সমাজের পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী সমস্ত চিন্তা ও কর্মের ধারাকে একটি সুগঠিত ও সমন্বায়িত ধ্রুপদী আদর্শের সাগরসঙ্গমে পৌঁছে দেওয়ার ব্রত 'বঙ্গদর্শন' স্বীকার করে নিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে—

> বঙ্গদর্শনে এবং বঙ্কিমের রচনায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক যুগের আদর্শকে প্রকাশ করেছে।[২৫]

'বঙ্গদর্শন'-এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সার্থকতাও রবীন্দ্রচেতনায় উপলব্ধ হয়েছে এইভাবে—

> বঙ্গদর্শন সেই যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়া গেছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাংলাভাষায়, ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে।[২৬]

এখানেই 'বঙ্গদর্শন'-এর সাহিত্য-আন্দোলনের যথার্থ সার্থকতা।

রমণীয় ভারতী (১৮৭৭)

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এর পরে কতকটা পৃথক আদর্শ ও রীতির মুখপত্র হিসাবে আবির্ভূত হল 'ভারতী' পত্রিকা (১৮৭৭)। 'ভারতী'র আবির্ভাব ক্ষণটি স্মরণীয় হয়ে আছে শরৎকুমারী চৌধুরাণীর লেখনীতে—

> তখন 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র চিহ্ন মাত্র ছিল না, 'বঙ্গদর্শন' মধ্যাহ্ন আকাশ হইতে ঢলিয়া পড়িয়াছে, আর 'আর্য্যদর্শন' ধূমকেতুর মত বোধহয় ছয় মাস বা নয় মাস অন্তর কদাচিৎ দেখা দিত। এমন সময় 'ভারতী' যখন নিয়মিত রূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন সাহিত্য সমাজে যে আন্দোলন ও তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা এখনও থামে নাই।[১]

'ভারতী'র আবির্ভাব প্রসঙ্গে স্বয়ং সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ বিপিনবিহারী গুপ্তকে বলেছেন—

> জ্যোতিব ঝোঁক হইল একখানা নূতন মাসিকপত্র বাহির করিতে হইবে। আমার ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ভাল করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায় 'ভারতী' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকেই সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল।[২]

সুতরাং 'ভারতী'র উদ্যোক্তারা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-এর উচ্চ আদর্শ ও সাহিত্য কৌলিন্যের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধান্বিত। 'বঙ্গদর্শন'-এর অভাব পূরণ করবার জন্যই 'ভারতী'র জন্ম হয়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর এই দুই কবি বিহঙ্গের নীড় রচনার উদ্দেশ্যে 'ভারতী' প্রকাশের উদ্যোগ। এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে—

> আমি তেতালায় যে ঘরটিতে বসতুম সেখানে একটা গোল টেবিল, তার চারিধারে খানকতক চৌকি, দেয়ালের গায়ে একটা পিয়ানো ছিল, রবি আমার নিত্যসঙ্গী (বালক-কবি তখন জগৎ-কবি হননি),আর এক কবি, আমার বাল্যবন্ধু অক্ষয় মধ্যে মধ্যে এসে জুটতেন। আমরা তিনজনে যখন একত্রে এই টেবিলের চারিধারে বসতুম, কত গাল-গল্প হত, কত কবিতা পাঠ হত, কত গান-বাজনা হত, গান রচনা হত, তার ঠিকানা নেই।...
>
> একদিন প্রাতে এই টেবিলে বসে আমরা সাহিত্যালোচনা করচি, কি শুভক্ষণে আমার হঠাৎ মনে হল—এই কবিবিহঙ্গ কেবল আকাশেই উড়ে বেড়াচ্ছে; ওদের মধুর গান আকাশেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। লোকালয়ের কোন কুঞ্জকুটিরে ওরা যদি আশ্রয় পায় কিংবা একটা নীড় বাঁধতে পারে, তাহলে কত লোকে ওদের স্বর-সুধা পান করে কৃতার্থ হয়। এই কথা মনে হবা মাত্র, দোতলায় নেমে এলুম।
>
> দোতালার দক্ষিণ-বারান্ডায় আর একটি প্রবীণ বিহঙ্গ রাজের আসন ছিল। ...আমার প্রস্তাব শোনবামাত্রই তিনি রাজি হলেন, আর তখনি দেবী 'ভারতী'কে আবাহন করে তারই পুণ্যকুঞ্জে, নবীন কবি-বিহঙ্গদেব জন্য একটি নীড় বেঁধে দিলেন।[৩]

প্রথম সংখ্যার 'ভূমিকা'য় 'ভারতী'র উদ্দেশ্যে ও নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ—

> ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাঁহার নামেই স্বপ্রকাশ। ভারতীর অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণী স্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জন এবং বিদ্যাস্ফূর্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাই নতমস্তকে গ্রহণ করিব।...
>
> ভারতভূমি বিদ্যার জন্মভূমি, বিদ্যার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। ...ভাবত ভূমিতে যদি জাগ্রত দেবতা অদ্যপি কেহ বিরাজমান থাকেন, তবে তিনি ভারতী। ভারতের প্রতি ভারতীর এমনি কৃপাদৃষ্টি যে, তাহাকে লক্ষ্মী পবিত্যাগ করিলেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। ...আমরা ভাই বন্ধু একত্র হইয়া ভারতীকে আহ্বান পূর্বক এই মত প্রতিষ্ঠা করিলাম; এক্ষণে ভারতীর বরপুত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের যাহাতে রীতিমত সেবা চলে, তাহার ব্যবস্থা করুন। ভারতীব আর্শীবাদে তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।[৪]

সুতরাং স্বদেশী ভাষার আলোচনা, জ্ঞানোপার্জন, বিদ্যাস্ফূর্তি ও স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ সকল মহৎ সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করানই হবে 'ভারতী'র প্রথম লক্ষ্য। তাই দেখা যায়, কথাসাহিত্যে যাবতীয় রক্ষণশীলতা ও গতানুগতিকতার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সাহিত্যে এক মুক্তিচেতনা আনতে 'ভারতী' প্রয়াসী হয়েছিল।

'ভারতী' পত্রিকার আদর্শ ও আন্দোলন সম্পর্কে আধুনিক সমালোচক অধ্যাপক ড. সুকুমার সেন লিখেছেন—

> শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্ত যখন সুপ্তি সংকীর্ণ গ্রামের বেড়া ডিঙ্গাইয়া বঙ্গদর্শনেই পরিতৃপ্ত, তখন রাজনারায়ণ ও তাঁহার তরুণ-অতরুণ বন্ধু রা অখন্ড ভারতের জাতীয় দিগন্ত গোচরে আনিলেন, তাই বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন-এর পর বাহির হইয়াছিল ঠাকুরবাড়ির 'ভারতী' (১৮৭৭)।[৫]

'ভারতী'র প্রকাশ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলে শুভ আবির্ভাব সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল আর্য্যদর্শন, হিন্দু পেট্রিয়ট, এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রিকায়।

খুব ঘরোয়াভাবেই 'ভারতী'র সূচনা হয়েছিল। তাই ঠাকুরবাড়ির বিত্তবান সন্তানদের পরিচালনায় গড়ে উঠেছিল 'ভারতী'র ধনভান্ডার। মাঝে মাঝে অবশ্য অর্থ তহবিলে ঘাটতি দেখা দিত। আর এই ঘাটতি পূরণ করা হত সরকারী তহবিল থেকে।

পূর্ব ঘোষিত তারিখ অনুযায়ী ঠিক ১৫ শ্রাবণ ১২৮৪ (২৯ জুলাই, ১৮৭৭) তারিখে 'ভারতী' প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল মাত্র ৫০০ কপি। প্রথম সংখ্যার 'ভারতী'র মলাটে ছিল ভারতীর ছবি। ভারতীর ছবি সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণ নিম্নরূপ—

> আমরা দেখিলাম—সে পদ্মের উপরে পা-খানি রাখিয়া গালে হাত দিয়া সুদূরে চাহিয়া আছে; কোলে তার অনাহত বীণা। এই ছবিটি মাত্র—এ ছাড়া তখনকার ভারতী'র আর কোনো ছবি আমার মনে আসে না।[৬]

১৪ শ ভাগ। অগ্রহায়ণ। অষ্টম সংখ্যা।

ভারতী



ভারতীর প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা

'ভারতী'র প্রথম সংখ্যার মলাট ছাড়া মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪৮। মোট দশটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংখ্যার মলাটের সূচীপত্র নিম্নরূপ—

সূচীতে কোন লেখকের নাম প্রকাশিত হয়নি। ভিতরে কয়েকটি রচনার শেষে সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহৃত হয়েছিল।

'ভারতী'-র প্রথম সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন গোঁড়া ও আধুনিক দুই দলের ঠিক মাঝখানে। প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় যোগ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নতুন চিন্তাধারা ও আবিষ্কার যা ভারতবাসীর পক্ষে কল্যাণকর বলে তিনি মনে করতেন, তাই প্রচার করেছিলেন 'ভারতী'-র মাধ্যমে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি যাতে ভেসে না যায় সেদিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। লেখকের স্বাধীনতায় তিনি ছিলেন অগাধ বিশ্বাসী।

দ্বিজেন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে 'ভারতী' সম্পাদনা করেছিলেন সাত বছর (১২৮৪-১২৯০)। স্বদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি ছিলেন আত্মসচেতন। শুধু তাই নয় সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতির প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। জাতির প্রয়োজনে বৈদেশিক রাজনীতিকেও তিনি সাহিত্যে বরণ করে নিয়েছিলেন। 'ভারতী'তে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করেছিলেন তা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর সম্পাদনাকালে বিহারীলাল চক্রবর্তী, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, রমেশচন্দ্র দত্ত, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, বেদান্তবাগীশ, শরৎকুমারী চৌধুরাণী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্বর্ণকুমারী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার বড়াল, বিজয়লাল দত্ত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রিয়নাথ সেন, অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীপতিচরণ রায়, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকেরা 'ভারতী'কে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। সর্বোপরি দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজে আমৃত্যু লিখে গিয়েছেন 'ভারতী'তে।

'ভারতী'কে কেন্দ্র করে দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালের প্রথম সাতটি বছর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছিল প্রবল উত্তেজনার মধ্যে। ঘটনাক্রমে এই উচ্ছ্বাসও স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। এমনকি 'ভারতী'র প্রাণ সংশয়েরও আশঙ্কা দেখা দিল 'ভারতী'র প্রাণপুরুষ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

পত্নী কাদম্বরীদেবীর অকাল প্রয়াণে। কাদম্বরীদেবীও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন 'ভারতী'র সঙ্গে। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী'তে ঘোষণা করেছিলেন—

'ভারতী' বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।'[৭]

এই সংকটকালে স্বর্ণকুমারীদেবী 'ভারতী' সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব নিয়ে 'ভারতী'কে অকাল প্রয়াণের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। সমসাময়িক পটভূমিকা সম্পর্কে শরৎকুমারী চৌধুরাণী চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন —

ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখতে পায়, যে বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল—'ভারতী'র সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, মালা গাঁথেন না, 'ভারতী' ধূলায় মলিন। এই দুর্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীদেবী নারীর পালন-শক্তির পরিচয় দিলেন। ধুলা ঝাড়িয়া সস্নেহে ভারতীকে কোলে তুলিয়া লইলেন। সেই সংকটকালে তিনি রক্ষা না করিলে আজ 'ভারতী'র নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইত।[৮]

স্বর্ণকুমারীদেবী প্রথম পর্যায়ে 'ভারতী' সম্পাদনা করেছেন এগার বছর (১২৯১-১৩০১। বিশিষ্ট সমালোচকের মতে—

ভারতীর সম্পাদিকারূপে বড় দুর্দিনে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ; তবু দীর্ঘকাল যোগ্যতার সঙ্গে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছিলেন এটাই বড় কথা।[৯]

দায়িত্ব গ্রহণ করার পর প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ, ১২৯১) 'ভূমিকা' নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার মধ্যে সাহিত্যপত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণাটি প্রস্ফুটিত বিশেষত 'সুরুচি সুশ্লীল সাহিত্যে'র পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ছিলেন বিশেষ আগ্রহী। নব সাজে সাজাতে চেয়েছিলেন তিনি 'ভারতী'কে। 'ভারতী'র চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ—হেঁয়ালি নাট্য, স্বরলিপি, কাব্যজগৎ, রাজ্যের কথা, খেয়াল খাতা, বাঙ্গালা রঙ্গালয়, সমালোচনা,আলোচনা, ঘর ও বাহির ইত্যাদির সঙ্গে তিনি বহু নতুন বিভাগ যোগ করেছিলেন। বিজ্ঞানের ওপর জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদের জন্য 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' নামক নতুন বিভাগে শেলি, ব্রাউনিং, ভিক্টর হুগো প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীদের কবিতার রবীন্দ্রকৃত অনুবাদ প্রকাশ করতেন।

জ্ঞানদানন্দিনীদেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকা ১২৯৩ সালে 'ভারতী'র সঙ্গে মিলিত হলে যুগ্ম পত্রিকা 'ভারতী ও বালক' নামে প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৯ পর্যন্ত। এরপর ১৩০০ সাল থেকে 'ভারতী' আবার স্বনামে প্রকাশিত হতে থাকে।

১২৯৪-এর 'ভারতী'তে প্রথম বার্ষিক সূচীতে লেখকের নাম প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৮৪-১২৯৩ পর্যন্ত বার্ষিক সূচীতে লেখকের নাম থাকত না। ১২৯৮-এ স্বর্ণকুমারীদেবীই প্রথম 'ভারতী'র পাতায় পত্র সাহিত্যের সূচনা করেছিলেন হিরন্ময়ীদেবী কৃত 'বিলাতের পত্র' (অগ্রহায়ণ)-র অনুবাদ দিয়ে। ১২৯৯ সালে চালু হয়েছিল 'নতুন ধরণের উপন্যাস' নামে নতুন বিভাগ। তারই সৃষ্ট ফসল 'নববর্ষের স্বপ্ন'। ১৩০০ সালে 'ভারতী' বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুতে শ্রদ্ধা অর্পণ করেছিল।

স্বর্ণকুমারীদেবী 'ভারতী' নিয়ে নানভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন। 'ভারতী'-কে আকর্ষণীয় করার জন্য তিনি নতুন নতুন বিষয়ের ডালি সাজিয়েছিলেন। সৃষ্টি করেছিলেন নতুন লেখকদের। সর্বোপরি তিনি নিজেও লিখছেন অজস্র। তাঁর প্রথম রচনা 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'বাল্যসখী' (ফাল্গুন, ১২৮৪) শীর্ষক কবিতা ছাড়া অসংখ্য কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প, বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই থাকত। স্বর্ণকুমারী দেবীর সম্পাদনা সম্পর্কে সুধী সমালোচকের যথার্থ মন্তব্যটি এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়—

> দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় বঙ্গসাহিত্যে ভারতী যে অতুল গৌরবের অধিকারিনী হয়েছিল, স্বর্ণকুমারীর যত্ন ও পরিশ্রমে সে গৌরব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।[১০]

'ভারতী'র গৌরব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়ইনি, এমনকি পঞ্চাশ বছরের সুদীর্ঘ সাহিত্য-পদযাত্রা পর্যালোচনা করে স্বর্ণকুমারীদেবীর সম্পাদনাকালকে 'স্বর্ণভূষণা ভারতী' বললেও অত্যুক্তি হয় না।

স্বর্ণকুমারীদেবীর কন্যাদ্বয় হিরন্ময়ীদেবী ও সরলাদেবী 'ভারতী' সম্পাদনা করেছিলেন তিন বছর (১৩০২-১৩০৪)। তাঁদের সম্পাদকীয় কৃতিত্বে 'ভারতী'র বিভিন্ন উন্নতি হয়েছিল। কোনো কোনো সংখ্যায় লেখার সঙ্গে ছবিও যুক্ত হয়েছিল। কার্তিকে 'ভাইফোঁটা', পৌষে 'পোষালা', ফাল্গুনে 'বসন্ত'— এইভাবে ঋতু-বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল।

এরপর ১৩০৫ সালে 'ভারতী' সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথকে দুটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে হত—একটি হল সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে প্রবন্ধ রচনা এবং অন্যটি হল পাঠক সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য গল্প রচনা। এছাড়া এই পর্বে কয়েকটি গান ও দু'চারটি কবিতা ছাড়া কাব্য নেই বললেই চলে।

'সাধনা' তখন অস্তমিত। এই সুযোগে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র সুরে গড়তে চাইলেন 'ভারতী'কে। ফলে 'ভারতী'র সুর ও আকার নতুনতর হয়ে উঠল। এতদিনের প্রচলিত ধারা ভেঙে তিনি 'ভারতী'র সমস্ত বিভাগের রূপান্তর ঘটালেন। কিন্তু একবছরের শেষে পারিবারিক সমস্যা, জামিদারী সংক্রান্ত ঘাত-প্রতিঘাত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' সম্পাদনার ভার ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু 'ভারতী'কে তিনি ত্যাগ করেননি। এই সময়ে 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' সহ আরও অন্যান্য পত্রিকার লেখার দাবীর জন্য কবি ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন—

> আমার কাছ থেকে কত আদায় করতে চাও, আমি প্রদীপ ওস্কাব, প্রভাতকে উজ্জ্বল করব, ভারতীকে অর্ঘ্য দেব, নিজের কাব্য-লক্ষ্মীকে মালা চন্দন পরাব—এদিকে গৃহস্থাশ্রমও রক্ষা করতে হবে... এসবগুলিকে হিসাবের মধ্যে আনবে না।[১১]

রবীন্দ্রনাথের পর 'ভারতী' সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সরলাদেবী (১৩০৬-১৩১৪)। ইতিপূর্বে স্বর্ণকুমারীদেবীকে তিনি বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন সম্পাদনার সময়। তাঁর সময়ে 'ভারতী'র আকারের কোন পরিবর্তন হয়নি। একটি বছরকে তিনি বৈশাখ থেকে আশ্বিন এবং কার্তিক থেকে চৈত্র ছ'মাস করে ভাগ করেছিলেন। ফলে বছরে দুটি করে সূচীপত্র তাঁর সময়ে

সংযোজিত হত । এই সময় থেকে 'ভারতী'তে দুটি নতুন বিভাগ চালু হয়েছিল—'বাঙ্গালা পুস্তকের বিবরণী' ও 'বাঙ্গালা সাহিত্যের মাসিক বিবরণী' ।

সরলাদেবীর সাফল্যপূর্ণ বহুমুখী প্রয়াসে 'ভারতী'র যেমন মর্যাদাবৃদ্ধি হয়েছিল, তেমনি সে দীপ্তিময়ীও হয়ে উঠেছিল । 'ভারতী' তখন আর শুধুমাত্র সুকুমাব সাহিত্যের রঙ্গভূমিই ছিল না, বাহন হয়েছিল জাতীয়তারও । সে সময়ে লেখকদের পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রথা চালু ছিল না। 'ভারতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে তিনিই প্রথম লেখকদের পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রথা চালু করেছিলেন । ইতিপূর্বে 'ভারতী' সহ অন্যান্য পত্রিকা নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হত না । প্রতি মাসের প্রথম দিন 'ভারতী' প্রকাশের তারিখ তিনিই প্রথম নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন । নতুন লেখক যেমন তৈরি করেছিলেন, তেমনি রচনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার প্রয়াসও তিনি চালিয়েছিলেন ।

১৩১২ সালে সরলাদেবী বিবাহের পর লাহোরে চলে গেলে 'ভারতী'র জীবনে নেমে এল অন্ধকার, কান্ডারবিহীন 'ভারতী' তখন অথৈ জলে । ১৩১৫ সালে মৃতপ্রায় 'ভারতী'কে আবার মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ প্রয়োগ করলেন স্বর্ণকুমারীদেবী । সম্পাদক হয়ে প্রথম পর্বে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন বিজ্ঞানচর্চার ওপর । আর এই পর্বে তিনি জোর দিলেন পল্লীগ্রামের উপর । 'ভারতী'কে তিনি সাজালেন রঙীন ছবি দিয়ে । এই সময়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লেখিকার সমাবেশ ঘটেছিল 'ভারতী'র পাতায়। ১৩২১ সালে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার জন্য তিনি 'ভারতী'র সম্পাদনা থেকে অবসর নিয়েছিলেন ।

১৩২২ থেকে ১৩৩০ পর্যন্ত 'ভারতী' সম্পাদনা করেছিলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় । তাঁদের সময়ে 'ভারতী'র আসর বিশেষভাবে জমে উঠেছিল । আসরে আসতেন বিভিন্ন প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক, শিল্পীরা । বৈঠকী আড্ডা, গান ও খোশগল্পের আবহাওয়ায় সেই আসর ছিল প্রাণবন্ত। এই আসরের সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন হেমেন্দ্রকুমার রায় 'মণিলালের আসর' রচনায় (মানসী ও মর্মবাণী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩) ।

'ভারতী'কে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য তাঁরা বিশেষভাবে যত্ন নিয়েছিলেন । এই সময়ে 'ভারতী'র পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়ান হয়েছিল, অথচ দাম কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। 'ভারতী'কে পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল সচিত্র রঙিন সজ্জা। তাছাড়া 'বায়োস্কোপের কথা', 'বায়োস্কোপের নাটক' সহ বিভিন্ন ধরনের চিত্র ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হত । 'চলতি ভাষা' সম্পর্কে তুমুল তর্ক-বিতর্ক ও স্থান পেত 'ভারতী'তে । 'ভারতী'কে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য পাঠকদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ের পরামর্শ চেয়েছিলেন সম্পাদকদ্বয় ।

'ভারতী' ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রথম প্রকাশিত হলেও কালক্রমে আমন্ত্রণ পেয়েছিল সারা দেশের । স্বাভাবিকভাবেই 'ভারতী' তাই গোষ্ঠীভাবাপন্ন ছিল না । কিন্তু এই পর্বে 'ভারতী'র অনেকাংশে গোষ্ঠীচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছিল । কিন্তু কখনো তা সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী বা দলে পরিণত হয়নি । 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকদের সংযোগের প্রধান সূত্র ছিল প্রগাঢ় রবীন্দ্র-অনুরাগ । ড. সুকুমার সেন এই রবীন্দ্র-অনুরাগ সম্পর্কে লিখেছেন—

ভারতী গোষ্ঠীর অনুপ্রাণনা আসিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা সভা হইতে । সাহিত্যে, শিল্পে,

নাট্যাভিনয়ে এবং মানব-সংস্কৃতিব অন্যান্য দিকে ভারতী গোষ্ঠীর জাগ্রত কৌতূহল এই সূত্রেই লব্ধ ।[১২]

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুকুমার সেন, প্রমথ চৌধুরী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীরচন্দ্র সরকার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, চারুচন্দ্র রায় প্রমুখরা ছিলেন 'ভারতীর দল' বলে বিখ্যাত ।

১৩৩১ থেকে ১৩৩৩ পর্যন্ত 'ভারতী'র এই অন্তিম পর্ব সম্পাদনা করেছিলেন সরলাদেবী। এই সময়ে তিনি পাঞ্জাব থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন । আটচল্লিশ বছর বয়সে 'ভারতী'কে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালেও তিনি তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করতে পারেন নি। 'ভারতী'র হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে তিনি সমস্ত বিভাগের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। চেয়েছিলেন রচনা গৌরব দিয়ে 'ভারতী'র সুনাম ফিরিয়ে আনতে । কিন্তু তবুও 'ভারতী' নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারেনি । অথচ অভিজ্ঞা সম্পাদিকার হাতে 'ভারতী' আবার পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে এ আশা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রমথ চৌধুরী সহ আরো অনেক সাহিত্যরসিকেরা । কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আশার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি । ১৩৩২-এ সরলাদেবী ফাল্গুন সংখ্যায় ছাপলেন তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা 'শ্রমিক' (ছাপাখানার শ্রমিক) । ১৩৩২ সালটি পুরো অনিয়মিতভাবে 'ভারতী' প্রকাশিত হয়েছিল । ১৩৩৩-এর আশ্বিনে প্রকাশিত 'ভারতী'র ষষ্ঠ সংখ্যাটি ছিল অতীব মনোরম । বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্নভাবে এই সংখ্যায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছিল । হেমেন্দ্রকুমার রায় এই সংখ্যাটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

তেল ফুরোবার আগে ভারতী .. শেষবারের মত জ্বলে উঠেছিল ।[১৩]

এর পরের সংখ্যা অর্থাৎ কার্তিক সংখ্যাই হল 'ভারতী'র শেষ প্রাণবায়ু । এই সংখ্যা থেকেই দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী 'ভারতী' পত্রিকা কালস্রোতে জলবুদ্‌বুদে্র ন্যায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল ।

পঞ্চাশ বছর ধরে 'ভারতী'র সম্পাদক বারে বারে পরিবর্তন হয়েছে, প্রত্যেকেই আপন স্বাতন্ত্র্যে 'ভারতী'কে নব নব রূপে সজ্জিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন, কিন্তু 'ভারতী' বরাবরই সাহিত্যের যাবতীয় রক্ষণশীলতা ও গতানুগতিকতার প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক মুক্তিচেতনা আনতে প্রয়াসী ছিল । 'ভারতী'র এই মুক্ত মানসিকতার অন্যতম প্রধান কারণ সমকালীন বিশ্ব-সংস্কৃতির সঙ্গে লেখকদের ব্যাপক সান্নিধ্য । সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় চৌধুরী, বিহারীলাল, কাদম্বরীদেবী, বলেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যোৎসাহীদের নিয়ে 'ভারতী'র এক গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন । এঁদের প্রত্যেকেব ভাবনার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নব নব চিন্তাধারা ও আবিষ্কারকে সন্ধানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় । ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিজস্বধারা যাতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে ভেসে না যায় সেদিকেও 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকদের প্রখর দৃষ্টি ছিল ।

প্রথম বছরের সূচীপত্রে 'ভারতী'র রচনা বৈচিত্র্য লক্ষণীয় । শুধু সাহিত্য নয়, বিজ্ঞান,

শিল্প, শিক্ষা, দর্শন, ইতিহাস, সঙ্গীত, অর্থনীতি, অভিনয় প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম বছর থেকেই 'ভারতী'র এই রচনাবৈচিত্র্য বরাববই অব্যাহত ছিল।

স্বর্ণকুমারীদেবীর সম্পাদনাকালে (১২৯১-১৩০১) 'ভারতী'তে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ আরও অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হতে শুরু হল। ১২৯১-এ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ভূমিকায় স্বর্ণকুমারীদেবী জানিয়েছেন—'তবে আমরা এখন হইতে বিজ্ঞানের মাত্রা কিছু বাড়াইতে ইচ্ছা করি—আমাদেব মতে বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ উপযোগিতা আছে এবং আজকাল এদেশে বিজ্ঞান আলোচনার কতক অনুরাগও দেখা যাইতেছে।...সেইজন্য ভারতীতে সহজ ভাষায় বিবিধ প্রকার বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনার বিশেষ রূপে ইচ্ছা রহিল।' 'ভারতী'র এই বিজ্ঞানচর্চায় অপূর্বচন্দ্র দত্ত, জগদানন্দ রায় প্রমুখ লেখকের উল্লেখযোগ্য অবদান স্বীকৃত। যদিও ইতিপূর্বে দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালে 'ভারতী'তে কালীবর বেদান্তবাগীশের মতো একজন ব্রাহ্মণ পন্ডিতকে দিয়ে 'গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার আবির্ভাবকাল' (আষাঢ় ১২৮৫) নামক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়েছিলেন তথাপি স্বর্ণকুমারীর সম্পাদনাকালে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। যার মধ্য দিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অপূর্বচন্দ্র দত্তের 'নক্ষত্রদিগের জাতিবিচার' (বৈশাখ, ১৩০১), 'বৃহস্পতির পঞ্চম উপগ্রহ' (মাঘ, ১২৯৯), 'সৌরজগতের গতি' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৩), জগদানন্দ রায়ের 'এডিসন ও ফনোগ্রাফ' (মাঘ, ১৩০০), 'কৃত্রিম রেশম' (আশ্বিন, ১৩০০), 'পুষ্পতত্ত্ব' (শ্রাবণ, ১২৯০), 'বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ' (ভাদ্র, ১৩০৫), 'সৌর কলঙ্ক' (আষাঢ়, ১৩০৪), 'বর্ণছত্র' (মাঘ, ১৩০১) ইত্যাদি।

লক্ষণীয় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে মহাকাশ বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভৌত ও রসায়ন বিজ্ঞানসহ যাবতীয় বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। ইউরোপের নিত্যনূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বাঙালি পাঠকের জ্ঞাতার্থে আনবার আয়োজনে ব্রতী হয়েছিল ভারতী-গোষ্ঠী। তাই এডিসন ও ফনোগ্রাফকে নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করে নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহের সম্যক পরিচয় প্রদানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'জান্তব চুম্বকশক্তি' বা 'এ্যানিমাল ম্যাগনেটিজম' (শ্রাবণ, ১২৯৮) প্রবন্ধে বিজ্ঞানের এক নতুন দিক নিয়ে নতুন চিন্তার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। কালীবর বেদান্তবাগীশের 'সামুদ্রিকানুমিতি বিদ্যা' (ভাদ্র-ফাল্গুন, ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬) প্রবন্ধটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানের এই নতুন দিকটি প্রথম উদ্ভাসিত হল 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেই। 'ভারতী' যে কালে বাংলায় বিজ্ঞান অনুশীলনে রত হয়েছিল সেই কালে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ বিজ্ঞান নিবন্ধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যাবতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ইংরেজিতেই লিখিত হত এবং তা প্রধানত, মুষ্টিমেয় কিছু পাঠকের জন্যই বরাদ্দ থাকত। ইউরোপে সেইকালে যখন বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের সভ্যতার ইতিহাস দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তেই বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষিত পাঠককে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিল 'ভারতী' পত্রিকা। যদিও এক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' তথাপি 'বঙ্গদর্শন'-এর সেই ভাব-আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে প্রয়াসী ছিল 'ভারতী'।

ধর্ম ও দর্শন বিষয়েও 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় যথেষ্ট প্রবন্ধ রচিত হতে দেখা যায়। যার

মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমকালীন ইউরোপীয় দর্শন ও ভারতীয় দর্শন বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কান্টের দর্শন ও বেদান্ত দর্শন' (অগ্রহায়ণ, ১২৯৪-বৈশাখ, ১২৯৫), 'দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদের সমন্বয়' (পৌষ, ১২৯৩), 'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক' (শ্রাবণ ১২৮৪-শ্রাবণ ১২৮৫), 'অধ্যাত্ম বিদ্যার প্রথম প্রস্তাব' (আষাঢ় ১২৮৭), 'বেদান্ত দর্শনের প্রথম প্রকাশ' (আশ্বিন ১২৯৪), 'পজিটিভিজম ও আধ্যাত্মিক ধর্ম' (ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ ১২৯২); রমেশচন্দ্র দত্তের 'সাংখ্য দর্শন' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮), 'হিন্দু দর্শন' (বৈশাখ, ১৩০৮); সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'শূন্যবাদ বৌদ্ধ দর্শন' (আষাঢ়, ১৩১১), 'প্রজ্ঞাপারমিতা' (কার্তিক, ১৩১১) প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখেব দাবী রাখে। লক্ষণীয় বিষয় ধর্ম ও দর্শন আলোচনায় 'ভারতী' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার তুলনামূলক সমালোচনায় যেমন অগ্রসর হয়েছে ঠিক তেমনই প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মদর্শনকে আধুনিক দৃষ্টিতে মূল্যায়ণের প্রচেষ্টাতেও 'ভারতী' উদ্যোগী হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো মতবাদ অথবা ধর্মীয় সংকীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত চেতনায় ভারতীয় ধর্মদর্শনকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণে আগ্রহই প্রশংসনীয়।

প্রাচীন ইতিহাস ও শিল্প বিষয়ে 'ভারতী'র প্রত্যেক লেখকই সচেতন ছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষের প্রাচীন সমৃদ্ধ ইতিহাসকে সমকালের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার প্রচেষ্টাই এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। জাতীয়তাবোধের উন্মেষের প্রেক্ষাপটে 'ভারতী'র এ জাতীয় রচনাগুলির সমকালীন মূল্য অবশ্য স্বীকার্য। শুধু ভারতের নয় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রমুখ উন্নত দেশগুলির অগ্রগতির ইতিহাস আলোচনা করে সাধারণ মানুষকে উন্নত দেশ গঠনের লক্ষ্যে সচেতন করাই ছিল 'ভারতী'র লেখকবৃন্দের উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষ ও তার বিভিন্ন রাজ্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধে র মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৈলাসচন্দ্র সিংহের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (ভাদ্র-পৌষ, ১২৯০), 'সেনারাজগণ' (পৌষ-মাঘ ১২৯৮), 'উড়িষ্যার ইতিহাস' (পৌষ ১২৮৮-অগ্রহায়ণ ১২৯০); জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আধুনিক ভারত' (মাঘ ১৩২১-মাঘ ১৩২২), 'সমসাময়িক ভারতের নৈতিক সভ্যতা' (ফাল্গুন ১৩২২-চৈত্র ১৩২৩) সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কাহিনী' (আষাঢ়-আশ্বিন, ১৩১৭); সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'শিবাজীর নৌবহর' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯) ইত্যাদি। এই সব প্রবন্ধে ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকে বর্তমান পাঠকের সামনে তুলে ধরে জাতীয়তাবোধে জাগ্রত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। যদিও দেশীয় ইতিহাস রচনার এবং অতীত ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করে যথার্থভাবে লেখবার প্রথম পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠী। 'বঙ্গদর্শন'-এর ইতিহাসচর্চার সেই ধারাকেই আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক রূপ দিতে আগ্রহী ছিল ভারতী-গোষ্ঠী।

সর্বোপরি দেশীয় ইতিহাস চর্চার পাশাপাশি 'ভারতী' পাশ্চাত্যের বিভিন্ন উন্নত দেশের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরে পরাধীন জাতির সামনে এক উন্নতির রূপরেখা গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়েছিল। এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ইংল্যান্ডে স্বাধীনতার উন্নতি' (আষাঢ়-শ্রাবণ ১২৮৭), 'জাপানের বর্তমান উন্নতি' (আষাঢ় ১২৮৮); সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের 'ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮); অঘোরনাথ দত্তের 'ফ্রান্সের বাস্তিল' (চৈত্র,

১২৯৯) ইত্যাদি প্রবন্ধ । এই সকল প্রবন্ধে পশ্চিমী উন্নত দেশগুলির উন্নতির বিস্তৃত আলোচনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে । এছাড়াও যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, বাণিজ্য, অর্থনীতি বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন । রমেশচন্দ্র দত্তের 'বৃটিশ শাসনে ভারতীয় শিল্পের অবনতি' (শ্রাবণ, ১৩০৮), 'বঙ্গদেশে বাজস্ব বন্দোবস্ত', 'ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকাল' (পৌষ, ১৩০৮) ইত্যাদি প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসনে বঙ্গদেশের অবনতির ইতিহাস অনুপুঙ্খরূপে উপস্থাপিত। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ন্যায় প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা বিষয়েও 'ভারতী'-র লেখকেরা উৎসাহী ছিলেন । যার মধ্যে অন্যতম কালীবর বেদান্তবাগীশের 'প্রাচীন ভারতের শিল্প' (কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন ১২৮৪); নলিনীকান্ত ভট্টশালীর 'বঙ্গীয় ভাস্কর্যের সুবর্ণযুগ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩) প্রভৃতি প্রবন্ধে ভারতবর্ষের গৌরবময় শিল্প 'ভাস্কর্যের ইতিকথা' উন্মোচিত হয়েছে । বস্তুতপক্ষে সমগ্র ভারতের এক গৌরবময় অতীত ইতিহাসকে তুলে ধরা এবং সে সম্পর্কে বর্তমান পাঠককে সচেতন করার মহৎ লক্ষ্যে নিয়োজিত করেছিল 'ভারতী' । 'ভারতী'র সর্বাধিক বড় কৃতিত্ব এই অখন্ড ভারতকে দৃষ্টিগোচর করান ।

বাংলাদেশের ভূমির উর্বরা শক্তির ফলে বঙ্গদেশ যে বিপুল শস্যশালিনী হয়ে উঠেছে এবং বঙ্গদেশের সাধারণ কৃষকদের অমানুষিক পরিশ্রমের সেই প্রয়াসকে আশ্রয় করেও 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় কৃষিবিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কৃষিকার্য' (কার্তিক-পৌষ, চৈত্র ১৩০৪), 'বাঙ্গালার আখের চাষ' (চৈত্র, ১৩০৩), 'বাঙ্গালার পাটের চাষ' (শ্রাবণ, ১৩০৪); শশীভূষণ বাবিকের 'কৃত্রিম উপায়ে জমি উর্বর করা' (মাঘ, ১৩৩০) । এইসব প্রবন্ধে যেমন বাংলাদেশের কৃষিকার্য বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে ঠিক তেমনই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষিকার্য পরিচালনা করে আরও অধিক শস্য উৎপাদনের প্রচেষ্টাও আলোচিত হয়েছে ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী-প্রগতি বা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় তৎকালীন ঠাকুরবাড়ির বিদুষী নারীরা বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন । জ্ঞানদানন্দিনীদেবীর 'স্ত্রীশিক্ষা' (আশ্বিন, ১২৮৮); শরৎকুমারী চৌধুরানীর 'সেকাল ও একালের মেয়ে' (আশ্বিন-মাঘ ১২৯৮), 'কলিকাতার স্ত্রীসমাজ' (ভাদ্র-কার্তিক ১২৮৮), 'নারীশিক্ষা ও মহিলা শিল্পাশ্রম' (ফাল্গুন, ১৩২০) নলিনীকান্ত গুপ্তর 'নারীর আর্থিক স্বাধীনতা' (ফাল্গুন, ১৩২৮) প্রভৃতি প্রবন্ধে নারীশিক্ষার সপক্ষে যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে মতামত প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে । বিশেষ করে সমাজের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য প্রবন্ধ সমূহে তাও অতি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

তবে শুধু প্রবন্ধের জন্য নয় 'ভারতী'র প্রধান বৈশিষ্ট্য তার গল্প, কবিতা ও উপন্যাস চর্চায় । পূর্ববর্তী 'বঙ্গদর্শন' যেখানে ধ্রুপদী আঙ্গিকের মননশীল প্রবন্ধ-নিবন্ধের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল 'ভারতী' সেক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল কথাসাহিত্য চর্চায় অধিক উৎসাহী ছিল । 'ভারতী' বরাবর ঠাকুরবাড়ির কর্তৃত্বে থাকায় ঠাকুর-পরিবারের বিশিষ্ট সাহিত্যাদর্শই তার চরিত্র হয়ে উঠেছিল । তাই দেখা যায় 'বঙ্গদর্শন' যেখানে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলালের ক্লাসিক

কাব্যাদর্শকে স্বীকৃতি দানে তৎপর ছিল, 'ভারতী' সেখানে বিহারীলালের রোমান্টিক কাব্যদর্শের অনুসরণে সচেষ্ট হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যের প্রধান দুটি রীতি সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত বলেছেন—

> বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা বস্তুগত কাব্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় যেমন সহায়তা করেছে, ঠাকুর পরিবারের 'ভারতী' পত্রিকা তেমনি সহায়তা করেছে বিহারীলাল প্রবর্তিত ভাবমূলক কবিতার প্রতিষ্ঠায়।[১৪]

জীবনদৃষ্টিতে উগ্রতার পরিবর্তে এক ধরনের স্নিগ্ধ কোমল আবেগধর্মী রাবীন্দ্রিক আদর্শবাদ পুষ্ট রোমান্টিকতাই 'ভারতী' বরাবর লালন করে এসেছে। বিহারীলাল চক্রবর্তী, অক্ষয় বড়াল, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, দেবেন্দ্র সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, স্বর্ণকুমারীদেবী, সরলাদেবী, প্রিয়ংবদাদেবী, হিরন্ময়ীদেবী, হেমলতা ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ 'ভারতী'র পাতায় রোমান্টিক কাব্যচর্চায় অক্লান্ত ছিলেন। প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ ইত্যাদি বিষয়কে আশ্রয় করে সমকালের প্রায় সব কবি মনীষীরা 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় সংবদ্ধভাবে কাব্যচর্চায় রত ছিলেন। আসলে ঠাকুরবাড়ির বিশিষ্ট রোমান্টিক কাব্যাদর্শকেই এঁরা অনুসরণ করতেন। যথার্থভাবে বলতে গেলে এঁরা প্রকৃত ছিলেন রবীন্দ্র কাব্যাদর্শে লালিত ও পুষ্ট। যাবতীয় স্থূলতা, উগ্রতা, কুশ্রীতাকে বর্জন করে সহজ সরল আবেগধর্মী কাব্যচর্চার এই প্রচেষ্টা বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এক নতুন ধারা সৃজন করেছিল।

কাব্যচর্চার পাশাপাশি 'ভারতী'র গল্প ও উপন্যাসচর্চাও বাংলা সাহিত্যে অবশ্যই এক স্মরণীয় অধ্যায়। কথাসাহিত্য চর্চায় 'ভারতী'র লেখকেরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন রবীন্দ্রানুসারী। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারীদেবী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নিরুপমাদেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় অজস্র গল্প ও উপন্যাস রচনায় নিরত ছিলেন। এই সব গল্প-উপন্যাসের মধ্যে কিছু কিছু বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী মর্যাদায় ভূষিত। যেমন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'কাশীবাসিনী' (বৈশাখ, ১৩০৮), 'বউচুরি' (বৈশাখ, ১৩০৭), 'ভিখারীসাহেব' (আশ্বিন, ১৩০৬) ইত্যাদি গল্প সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমনকি 'দেবী'র (ভাদ্র, ১৩০৬) মতন কালোত্তীর্ণ মর্মান্তিক ট্রাজিক গল্প 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। অন্ধ কুসংস্কারকে আশ্রয় করে সাধারণ একটি মেয়ের জীবনে বি ভয়াবহ মর্মান্তিক পরিণতি নেমে আসে তার নিষ্ঠুরতম চিত্র এই গল্পে অঙ্কিত। যাবতীয় যুক্তি বর্জিত অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 'ভারতী' যে মননসমৃদ্ধ আধুনিকতার আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিল 'দেবী' গল্পটিতে তার স্বাক্ষরতা বর্তমান।

স্বর্ণকুমারীদেবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস যেমন 'মিবাররাজ' (আষাঢ়-পৌষ ১২৯৩), 'বিদ্রোহ' (ভাদ্র ১২৯৪-ফাল্গুন ১২৯৫), 'ছিন্নমুকুল' (পৌষ ১২৮৫-অগ্রহায়ণ ১২৮৬), 'স্নেহলতা' (বৈশাখ ১২৯৬-জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮) ইত্যাদি 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে 'মিবাররাজ' ও 'বিদ্রোহ' রাজস্থানের পটভূমিকায় ভীল ও রাজপুতের বিরোধ-মিলনের ঐতিহাসিক কাহিনী। 'ছিন্নমুকুল' ও 'স্নেহলতা' নামক সামাজিক উপন্যাসে সেকালের সমাজ জীবন প্রতিফলিত।

এছাড়াও 'ভারতী' পত্রিকায় স্বর্ণকুমারীর বেশ কিছু ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল । যার মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় 'মালতী' (মাঘ-ফাল্গুন, ১২৮৬), 'কুমার ভীমসিংহ' (বৈশাখ, ১২৯৩), 'ক্ষত্রিয়রমণী' (মাঘ, ১২৯৩), 'এক ভয়ংকর ঘটনা' (ফাল্গুন, ১২৯৫), 'ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী', 'অশ্ব ও তরবারী' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭), 'সন্ন্যাসী' (বৈশাখ, ১২৯৮), 'অমরগুচ্ছ' (জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, ১৩১৫) প্রভৃতি । লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের সার্থক ছোটগল্প 'ঘাটের কথা' (কার্তিক, ১২৯১) প্রকাশের পূর্বেই 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় সার্থক ছোটগল্প রচনার সযত্ন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় ।

ভারতী-গোষ্ঠীর কথা-সাহিত্যিকদের মানসিক প্রবণতা ছিল রবীন্দ্রসাহিত্যকে অনুসরণ করা । এই প্রবণতার সবচেয়ে পরিস্ফুট লক্ষণ হল কথাসাহিত্যে রক্ষণশীলতা ও গড্ডালিকা ধারার প্রতিবাদ । প্রাচীনপন্থী সমাজ ও পরিবারের নীতি নিয়মসম্মত কাহিনীর ধারা বর্জন করে এঁরা গল্প-উপন্যাসে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করলেন। প্রচলিত হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ ও পরিবারের সুরক্ষিত সংকীর্ণ সীমার বাইরেও যে জীবন আছে, আর সে জীবনও যে একান্ত প্রত্যক্ষ বাস্তব— সেই উদারতার সত্য ও নূতনতর মূল্যবোধের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে চাইলেন আলোচ্য লেখকবৃন্দ । বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে 'ভারতী'র লেখকদের রচনায় ব্যক্তির বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা সগৌরবে আত্মপ্রকাশ করল । এঁদের মানসদৃষ্টির এই গতিশীলতার সঙ্গে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গীর সংযোগ বর্তমান অন্যদিকে তেমনই আছে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে এই লেখকগোষ্ঠীর ব্যাপক সান্নিধ্য । ইতিপূর্বে নানা বিদেশি ছোটগল্প ভারতীর পৃষ্ঠায় বাংলায় অনুদিত হতে শুরু হয়েছিল। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছায়ামূর্তি' (আশ্বিন, ১৩১৮), 'আমার জুলকাকা' (বৈশাখ, ১৩১৮), 'সুখ' (পৌষ, ১৩২৯) ইত্যাদি যেগুলি বিশ্বখ্যাত ছোটগল্পকার মঁপাসার বিভিন্ন গল্পের অনুবাদ । জগদীশচন্দ্র গুপ্তের 'নির্জার স্বপ্নদর্শন' (আষাঢ়, ১৩১৮, যোসেফ অ্যাডিসন রচিত 'ভিশন অফ নির্জার'-এর অনুবাদ); জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বেড়ালের স্বর্গ' (ভাদ্র, ১৩৩১;এমিল জোলার গল্পের অনুবাদ) পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একরাত্রি' (পৌষ ১৩৩০, মঁপাসার গল্পের অনুবাদ) ইত্যাদির মাধ্যমে বিদেশি কথাশিল্পের সঙ্গে বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের ব্যাপক সংযোগ রচিত হল ।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে কেবল গল্প-উপন্যাসের অনুবাদ নয়, বিশ্বখ্যাত পাশ্চাত্য লেখকদের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনাতেও মনোনিবেশ করেছিলেন ভারতী গোষ্ঠীর লেখকেরা । যেমন, পুশকিন লারমনটখ সম্পর্কে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর প্রবন্ধ 'রুশিয়ার সাহিত্যিক' (ভাদ্র, ১৩২৭), হেমেন্দ্রকুমার রায় রচিত 'রুশ লেখক সলোগার' (অগ্রহায়ণ, ১৩২৭) ইত্যাদি।

গল্পের পাশাপাশি বেশ কিছু পাশ্চাত্য উপন্যাসও 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় অনুদিত হয়েছিল । এক্ষেত্রে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সৌরীন্দ্রমোহনের অনুদিত দোদের দুখানি গ্রন্থের অনুবাদ 'নবাব' (বৈশাখ ১৩২১-পৌষ ১৩২২) ও 'মাতৃঋণ' (বৈশাখ, ১৩১৮-চৈত্র, ১৩১৯), ভিক্টর হুগোর উপন্যাস অবলম্বনে 'বন্দী' (বৈশাখ ১৩১৭-ফাল্গুন, ১৩১৭) উপন্যাসগুলির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । যদিও এইসব অনুবাদের অধিকাংশই মূল থেকে নয়, ইংরেজি অনুবাদের অনুবাদ । স্বর্ণকুমারী সম্পাদনাকালে বিদেশি

সাহিত্যের অনুবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। 'বিদেশীফুলের গুচ্ছ' এই নতুন বিভাগে তিনি শেলী, ব্রাউনিং, আরনেস্ট মেয়ারস, ভিক্টর হুগো প্রভৃতি বিখ্যাত কবিদের কবিতা অনুবাদ করিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে; যা 'সিন্ধু তীরে বিষণ্ণ হৃদয়ের গান' শিরোনামে (শ্রাবণ, ১২৯১) প্রকাশিত হয়ে। এইভাবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেব মর্মলোকের গভীরে অনুপ্রবেশের দ্বারা সেই সাহিত্যের প্রগাঢ় ভাব সৌন্দর্য কিংবা নিখুঁত শিল্প সুষমাকে আত্মস্থ করে নেবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে 'ভাবতী'র রচনাবলীর মধ্যে এক আন্তর্জাতিক চেতনা প্রকাশিত হয়েছিল।

ভারতী-গোষ্ঠী লেখকদের রচনায় জীবন সম্পর্কে বাস্তবতাবোধের অন্যতম প্রকাশ ঘটেছে সমাজের অবহেলিত বা নীচুতলার কিছু কিছু চরিত্রের সমাবেশের মধ্য দিয়ে। এইসব উপেক্ষিত অন্ত্যজ শ্রেণীর নরনারীকে ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি বা মর্যাদা দানের পিছনে লেখকদের এক বাস্তববাদী ও প্রতিবাদপ্রবণ মনোভঙ্গি নিহিত ছিল। এই মনুষ্যত্বের উদার প্রেরণায় ভারতী-গোষ্ঠীর লেখকদের দৃষ্টি সমাজের আর একটি জটিল বাস্তব সমস্যার প্রতি প্রসারিত হয়েছিল। পতিতা নারীর জীবনের বিড়ম্বনাকে গল্পে উপন্যাসে চিত্রিত করাব কাজে ভারতী-গোষ্ঠীর লেখকরা অনেকেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই ধরনের প্রয়াসের মধ্যে সমাজের পীড়নধর্মী অমানুষিক রূপের মধ্যে প্রতিবাদের স্পৃহা স্পষ্টতই নিহিত ছিল। আর ছিল পতিতাকে সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে সমবেদনার সঙ্গে হৃদয়ধর্মের দিক থেকে মনুষ্যত্বের সম্মানীয় স্বীকৃতি দানের প্রচেষ্টা।

পতিতাকে অবলম্বন করে ভারতী-গোষ্ঠীর লেখকদের রচিত গল্প-'উপন্যাসের মধ্যে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মুক্তি' (আশ্বিন, ১৩২১), সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাটকোঠায়' (১৩২৮), হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'কুসুম' (কার্তিক, ১৩২২) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পতিতাদের কলঙ্কিত চরিত্রের মর্মলোকে শুভ্রতার শুদ্ধতর এক জীবনের জন্য অন্তর্গূঢ় পিপাসা নিহিত থাকে— এই ধরনের একান্ত মানবীয় এক মনোভঙ্গির বেদনা ও সহানুভূতির মধ্য দিয়ে উপরিউক্ত কাহিনীগুলির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। পতিতা চরিত্র অঙ্কনে এই সংঘবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ভারতী-গোষ্ঠীর প্রচলিত নৈতিক সংকীর্ণ মূল্যবোধের বিরুদ্ধে আন্দোলনের স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কেবল সমাজ পরিত্যক্তা পতিতা জীবনই নয়, সাধারণ নারী সমাজের মধ্যে যারা সমাজ নিষিদ্ধ প্রেম বা দেহকামনাকে প্রশ্রয় দিয়েছে এমন নারীর মনস্তত্ত্ব ও আচরণ নিয়েও এই গোষ্ঠীর লেখকরা কাহিনী রচনা করেছেন। সমকালীন দুজন শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রেমের নানা নিগূঢ় দ্বন্দ্ব জটিল রহস্যকে তাঁদের গল্প-উপন্যাসে বিন্যস্ত করলেও নরনারীর দেহসচেতন যৌনবোধের উপর কখনই তেমন দৃষ্টি দেননি। এদিক থেকে ভারতী-গোষ্ঠীর লেখকেরা অবশ্যই এক নতুন পথের দিশারী। উদাহরণস্বরূপ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'স্রোতের ফুল' (বৈশাখ, ১৩২১-পৌষ, ১৩২২) উপন্যাসে মালতীর চরিত্রে ব্যক্তিগত নিরুদ্ধ প্রেমকামনা প্রকাশের জন্য বিদ্রোহের মনোভাব অভিব্যক্ত। 'স্রোতের ফুল' উপন্যাসে মালতীর প্রতি গুরু প্রেমানন্দের দেহাসক্তি উপন্যাসটিকে যৌন আবেদনেব তথা আধুনিকতার আভাস

বহন করে এনেছে। মালতীর মধ্যে যে তেজস্বিনী, সমাজ ও ধর্মের প্রচলিত বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী নারী সুপ্ত ছিল তার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটেছে উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে। প্রেমানন্দের প্রতি মালতীর তীব্র মন্তব্যে—'আমি সন্ন্যাসিনী নই। আমি চিৎকার করে বলছি, হাজার বার বলছি, আমি সন্ন্যাসিনী নই। আপনি আমাদের দূর করে দিন আপনার আশ্রম থেকে।'

সাধারণভাবে ভারতী-গোষ্ঠীর মনোভাব যে সমাজনিষিদ্ধ দেহসচেতন প্রণয়কাহিনী ও ব্যক্তিসত্তার বাস্তব কামনাবাসনার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল তার আরও প্রমাণ পাই এই ধরনের উপন্যাসের সমালোচনায় 'ভারতী'র আন্তরিক সপ্রশংস মনোভাবে। 'ভারতী'র জ্যৈষ্ঠ ও অগ্রহায়ণ ১৩২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত গ্রন্থ সমালোচনায় নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'শুভা' ও 'পাপের ছাপ' নামে দুখানি যৌপ আবেদনমূলক উপন্যাস সম্পর্কে এই সপ্রশংস মনোভাব লক্ষণীয়। 'পাপের ছাপে'র মতো যৌন অপরাধমূলক উপন্যাস সম্পর্কে 'ভারতী'তে লেখা হয়েছিল—'মামুলি একঘেয়ে প্লট আর প্রাণহীন আদর্শ রচনার যুগে বইখানি...স্বচ্ছন্দের হাওয়া বহিয়া আনিবে।'

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে ভারতী-গোষ্ঠীর রচনায় বাস্তবতাবোধ ও নৈতিক বিদ্রোহ চেতনার যে পরিচয় ফুটে উঠেছে তা কখনই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফল নয়। 'ভারতী'র লেখকেরা স্বরূপত ছিলেন আদর্শবাদী। তাঁরা প্রচলিত সামাজিক আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধে সবসময় আস্থা রাখতে পারেননি। এই প্রচলিত মূল্যমান ও প্রথার কঠিন শৃঙ্খলে বন্দী নরনারীর জন্য তাঁরা বেদনাবোধ করেছেন, সেইসব নরনারীর অন্তরের পিপাসাকে ভাষা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু শুধু এটুকুতেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি। এক নতুন আদর্শ ও নৈতিক মানদণ্ডের কাঠামো নির্মাণ করতেও উদ্যোগী হয়েছেন। সেই আদর্শ মানদন্ড হল ব্যক্তি নির্ভর মানবধর্ম।

ভারতী-গোষ্ঠীর গল্পকারদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কাহিনী, চরিত্র পরিকল্পনা ও পরিবেশ রচনায় বাস্তব দৃষ্টির সঙ্গে লঘু রোমান্টিকতার মিশ্রণ। রবীন্দ্র অনুরাগী এইসব নবীন লেখকের মনে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের অন্তর্গূঢ় রোমান্টিক সুরের আবেদন ছিল অমোঘ। এই জাতীয় রচনার মধ্যে সৌরীন্দ্রমোহনের 'পিয়ারী', 'সাহসিকা', 'পথের পথিক'; হেমেন্দ্রকুমারের 'ধারাশ্রাবণ' (কার্তিক, ১৩২৮) এবং 'জলের আলপনা' (আষাঢ়, ১৩২৫-মাঘ, ১৩২৫) ইত্যাদি উপন্যাস উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ আলোচনা করা যেতে পারে হেমেন্দ্রকুমারের 'ধারাশ্রাবণ' গল্পে ভাবাতিরেক ও অবাস্তব কল্পনার আতিশয্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক বিপত্নীক অন্ধ লেখক একমাত্র কন্যা ছায়ার কঠিন ব্যাধির চিকিৎসার জন্য সারারাত জেগে প্রাণপণে একটি ইংরেজি উপন্যাস টাইপরাইটারে লিখে শেষ করলেন। লেখা হবার পর অন্ধ লেখক জানালেন যে তাঁর টাইপের ফিতেতে কালি ছিল না, কাগজে একটি দাগও পড়েনি। চিকিৎসার দ্বারা মেয়েকে বাঁচাবার আশা যখন এমনি করে চুরমার হয়ে গেল তখন অন্ধ লেখক অকস্মাৎ প্রবল নাস্তিক ও প্রায় উন্মাদ হয়ে গেলেন। বলতে লাগলেন—'মানি না......মানি না.....ভগবানকে আমি মানি না...তর্ক করতে চাও ? শাস্ত্রের বচন তুলতে চাও ? আমার আপত্তি নেই। হয়তো ভগবান বলে কেউ আছেন কিন্তু তাঁকে আমি মানি না।' সমস্ত গল্পটি আকস্মিকতা ও প্রচন্ড আবেগের ধাক্কায় বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে।

নগরজীবনের লঘু রোমান্সের রসপুষ্ট আরেকটি উপন্যাস সৌরীন্দ্রমোহনের 'কাজরী' জ্যৈষ্ঠ-চৈত্র, ১৩২৬) নববিবাহিত দম্পতির মধুব মান অভিমান ও হাসিকান্নাভরা লঘু সবস স্নিগ্ধ কাহিনী ।

ভারতী-গোষ্ঠী লেখকদের গল্প-উপন্যাসে এই রোমান্স প্রবণতার অন্যতম কারণ 'ভারতী' পত্রিকার পটভূমিতে রোমান্টিক শিল্প প্রীতি । এই পটভূমি সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আরেকজনের দানের কথাও স্মরণীয়, তিনি অবনীন্দ্রনাথ । অবনীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র আসরে রোমান্সের যে স্পর্শ এনেছিলেন তা কেবল মোগল রাজপুত চিত্রাঙ্কনের অতীতচারিতার মধ্য দিয়ে নয়, রূপকথার রং ও আমেজ মেশান শিশুপাঠের ভঙ্গিতে লেখা নানা কাহিনী সৃষ্টির সাহায্যে । এই সময়ে রচিত তাঁর 'ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'ভূতপতরীর দেশ' ইত্যাদি গ্রন্থ কিংবা 'মাতু' (বৈশাখ, ১৩২৪), 'গুরুজী'(জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪), 'মোহিনী' (চৈত্র, ১৩২৩) ইত্যাদি 'ভারতী'তে প্রকাশিত গল্পের কাব্যসুরভিত স্বপ্নাতুর কাহিনী ভারতী-গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের চিত্তকে ব্যাকুল করে তুলেছিল । যেমন, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মুক্তি' (আশ্বিন, ১৩২১), 'ও বেলায়' (শ্রাবণ, ১৩২২) নামক গল্পে কাহিনীর সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে রোমান্টিক কাব্য কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছে ।

বস্তুতপক্ষে, ভারতী-গোষ্ঠীর লেখকদের রচিত সাহিত্যে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে, রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদী মানসিকতা লক্ষ্য করা যায় তা অবশ্যই এক সাহিত্য আন্দোলন। এঁরা সাহিত্যে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বাস্তব আশা-আকাঙ্খা ও সমাজ নিষিদ্ধ দেহসচেতন কামনা বাসনাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছেন । বলা যেতে পারে 'ভারতী'র মধ্যেই আগামী দিনের বিদ্রোহী 'কল্লোল'-এর বীজ নিহিত ছিল । সংস্কারমুক্ত প্রথাবর্জিত সমাজ কর্তৃক উপেক্ষিত ঘৃণ্য নর-নারীর বাস্তব সমস্যার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ কাহিনী রচনা করে কল্লোলপন্থী তরুণ লেখকদের আবির্ভাবে যথেষ্ট আনুকূল্য করেছে 'ভারতী', একথা অস্বীকার করা যায় না । হেমেন্দ্রকুমার রায়ের এই সম্পর্কে একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য স্মরণীয়—

> আজকাল যাঁরা অতি-আধুনিক সাহিত্যিক আখ্যা লাভ করেছেন, তাঁদের অনেকের মুখেই শুনতে পাই যে, এক সময়ে এই ভারতীব দল নাকি তাঁদের সাহিত্যসাধনার উপরে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে ।[১৫]

'ভারতী' পত্রিকার অন্যতম অবিস্মরণীয় কীর্তি কিশোর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভা উন্মেষে সর্বাধিক সহায়তা করা । ১২৮৪-র শ্রাবণে দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভারতী' প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথের লেখনী নিজের মতো করে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার এই প্রথম অবকাশ পেল । 'ভারতী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্য 'কবিকাহিনী' (পৌষ-চৈত্র, ১২৮৪) যাকে বলা যায় তাঁর অন্তর্জীবনের কাহিনী । রবীন্দ্রকাব্যের পরিণত পর্বে কবি তাঁর ব্যক্তিগত বেদনাকে উত্তীর্ণ হয়ে মানবজীবনে সার্বজনীন ব্যথাবেদনাকে রূপায়িত করার যে প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি 'কবিকাহিনী' কাব্যে সেই সার্বজনীনতার সুরের আভাসও সূচিত হয়েছে । 'কবিকাহিনী'র উল্লেখযোগ্য কাব্য হল 'ভগ্নহৃদয়'; প্রকৃতপক্ষে যার মধ্যে কাহিনীকাব্য, নাটক ও গীতিকবিতার মিশ্রণ ঘটেছে । চৌত্রিশ সর্গে সমাপ্ত এই কাব্যের মধ্যেই বৃহত্তর বনস্পতির ধর্ম নিহিত ছিল ।

রবীন্দ্রসাহিত্যের আদিযুগের উল্লেখযোগ্য কাব্য 'শৈশবসঙ্গীত', যাব অধিকাংশ কবিতাই ১২৮৪ থেকে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'তে মুদ্রিত হয়। 'শৈশবসঙ্গীত' রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম লিবিক সংগ্রহ। ফুলবালা, দিকবালা, কামিনী ফুল, প্রভাতী, ফুলের ধ্যান, গোপালবালা, প্রেম মরীচিকা প্রভৃতি অধিকাংশ কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতিকে অবলম্বন করে গীতিকবিতা রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 'শৈশবসঙ্গীত'-এর তের ছন্দেও বিহারীলাল ও হেমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'শৈশবসঙ্গীত' পরবর্তী বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ 'ভানুসিংহের পদাবলী' যার অধিকাংশই ১২৮৪ থেকে ১২৮৮ সালেব মধ্যে রচিত হয় এবং 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে প্রাচীন বৈষ্ণব পদ-কর্তাদের ধর্মীয় সাধনা বা ভাবের আবেগ না থাকলেও কিশোর কবির রোমান্টিক প্রেমচেতনা এখানে রাধাকৃষ্ণের রূপকের অন্তরালে ব্যক্ত হয়েছে, বৈষ্ণবকাব্যপাঠের প্রভাবে কিশোর কবির মন আরও অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছে এবং জয়দেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবির ভাবভাষা ও ছন্দের আদর্শ কিশোর কবির অন্তরের প্রেমানুভূতি প্রকাশে সহায়ক হয়েছে। কাব্যরচনার সেই উন্মেষকালে কিশোর কবি পূর্বতন শক্তিশালী কবিদের মনোরাজ্যে পরিভ্রমণ কবে আপন মানসলোককেই উর্বর করে তুলেছিলেন। আলোচ্য পর্বের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল 'সান্ধ্যসঙ্গীত'। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবিতাগুলি প্রধানত 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় ১২৮৭ সালের জ্যৈষ্ঠ থেকে ১২৮৮ সালের আষাঢ়ের মধ্যে। 'কবিকাহিনী' থেকে শুরু করে 'ভগ্নহৃদয়' পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত কিশোর কবির কাব্যে অন্তরের যে অশান্তি ও অন্তর্বেদনা, যে অস্পষ্ট আবেগ ও রোমান্টিক বিষাদ আছে তারই প্রকাশ ঘটেছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর অধিকাংশ কবিতায়, তবে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশভঙ্গিতে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়, বিশ্বের সঙ্গে সংযোগ সাধনের জন্য হৃদয় অরণ্যে অবরুদ্ধ কবি দুঃখে বিলাপ করছেন। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সঙ্গে আকাঙ্ক্ষিত সামঞ্জস্যসাধনে ব্যর্থতাই যেন কবির এই বিষণ্ণতার কারণ। রবীন্দ্রনাথও 'জীবনস্মৃতি'-র পাতায় এই কালটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্যের পূর্ববর্তী যুগে রচিত কবিতা বা গাথায় বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের তিনমাত্রার ছন্দের বন্ধনে কবি বন্দী ছিলেন। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর লিরিকগুলিতে কবি তিনমাত্রার ছন্দের বন্ধন থেকেও মুক্তি পেয়েছিলেন। এইভাবেই বঙ্গভারতীতে কবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম হল 'ভারতী' পত্রিকার অকৃপণ আনুকূল্যে। ঠাকুববাড়ির নিজস্ব এই পত্রিকা 'ভারতী'কে কেন্দ্র করে সেই মুহূর্তে কিশোর কবির অন্তরে সৃষ্টির যে চাঞ্চল্য জেগেছিল পরবর্তীকালে 'জীবনস্মৃতি'-র পাতায় সেই মুহূর্তটি স্মরণ করে কবি লিখেছেন—

> এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই আর একটা আমাদের বড় উত্তেজনার বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোল। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্বেই আমি অল্প বয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমেব রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপব

নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।[১৬]

যদিও 'মেঘনাদবধকাব্য'-এর সমালোচনার সাহিত্যিক মূল্য সামান্যই তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে ইতিপূর্বে এমন নির্ভীক বিস্তৃত সমালোচনা বাংলা সাহিত্যে কোন গ্রন্থ সম্বন্ধেই হয়নি। বিশেষত 'মেঘনাদবধ কাব্য' বিষয়ক দুটি প্রবন্ধেই (প্রথমটি শ্রাবণ-পৌষ, ফাল্গুন, ১২৮৪; দ্বিতীয়ত ভাদ্র, ১২৮৯) রাবীন্দ্রিক সমালোচনা রীতির সার্থক সূচনা লক্ষ্য করা যায়। যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে নৈয়ায়িক পন্থার পরিবর্তে ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁর সমালোচনাকে যে নূতন সৃষ্টিতে পরিণত করতেন তারই প্রথম প্রচেষ্টা 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সমালোচনায় পরিস্ফুট। ব্যক্তিগত ভাললাগা মন্দলাগার সঙ্গে আপন মতামতকে বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ সেই কিশোর বয়সেই। সুতরাং 'ভারতী'র স্বাধীন অঙ্গনে কিশোর লেখক নিঃশঙ্ক চিত্তে নিজেকে মেলে ধরার যে সুযোগ পেয়েছিলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সমালোচনা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

'ভারতী'র প্রথম সংখ্যা থেকেই রবীন্দ্রনাথের বিবিধ রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন, প্রথম বর্ষে (মাঘ, ১২৮৪) প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধ 'বঙ্গে সমাজবিপ্লব' এবং 'বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য'-এ তাঁর বাঙালি জাতি সম্পর্কিত সুগভীর ভাবনার পরিচয় মেলে। 'ভারতী'র দ্বিতীয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় 'স্যাকসন জাতি ও অ্যাংলো স্যাকসন সাহিত্য', ১২৮৫-র ফাল্গুন সংখ্যায় 'নর্ম্যানজাতি ও অ্যাংলো নর্ম্যান সাহিত্য', ১২৮৬-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'নর্ম্যানজাতি অ্যাংলো নর্ম্যান জাতি' ইত্যাদি প্রবন্ধে তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টি ও গভীর অধ্যয়নস্পৃহার পরিচয় মেলে। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ গুলিকে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রতিভার বিশেষ স্বাক্ষর না থাকলেও 'ভারতী'র ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র-আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধে— 'বিয়াত্রিচে দান্তে ও তাঁহার কাব্য', 'পিত্রার্কা ও লরা' এবং 'গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ' রবীন্দ্রনাথের মানসরহস্যের বিশিষ্ট আভাস সূচিত হয়েছে। 'বাঙ্গালী কবি নয়' (ভাদ্র, ১২৮৭), 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন' (আশ্বিন, ১২৮৭), 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' (বৈশাখ, ১২৮৮), 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন' (শ্রাবণ, ১২৮৮) প্রভৃতি সাহিত্যমূলক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য, গীতিকাব্য, খন্ডকাব্য তথা কবিতার বিচিত্র রূপাঙ্গিকের বিশ্লেষণ-এ মনোযোগী হয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয়, 'বাঙ্গালী কবি নয়', এবং 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন' প্রবন্ধ দুটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালী কবি কেন' (বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮২) এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নীরব কবি' (বান্ধব, মাঘ, ১২৮১) প্রবন্ধ দুটির প্রতিবাদে লেখা। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালী কবি কেন' প্রবন্ধে 'কবি কে' এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন—

'...যার হৃদয় কোমল, যার হৃদয় তরল, ভাবের বাতাস বহিলেই তার হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে, ...এই তরঙ্গ যার উঠে এবং ইহার মূর্তি ভাষায় বর্ণে যে আঁকিতে পারে, সেই প্রকাশ্যে কবি। যে পারে না, সে কবি হইয়াও কবি নহে। সেইজন্য সকলে কবি নহে। বাঙ্গালীর হৃদয় কোমল,

বাঙ্গালীর হৃদয় তরল এইজন্য বাঙ্গালী কবি। আবার অশিক্ষিতের উপর কল্পনার একাধিপত্য। বাঙ্গালী অশিক্ষিত, অপরিমার্জিত বুদ্ধি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সুতরাং বাঙ্গালীব কল্পনাও প্রবল, সুতরাং বাঙ্গালী কবি।'

বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেছেন যে, বাঙালি অপরিমার্জিত বুদ্ধি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কেন? এর কারণ আমাদের শাস্ত্রনির্ভর হিন্দুধর্ম। আমরা শাস্ত্রকেই সত্য বলে জেনে এসেছি। ফলে আমরা চন্দ্র, সূর্য, মেঘ, বিদ্যুৎ, ক্ষিতি, অপ্ সকলকেই সজীব বলে তাদের দেবতাজ্ঞানে পুজো করি। তাঁর মতে—

'এই কারণে বালক মাত্রেই কবি। কেননা বালক সকলকেই সজীব বলিয়া বিশ্বাস করে।'

কবি শব্দটিকে নিয়ে এই বাক্‌চাতুরীতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। বালকেরা ও অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি কারণ তাদের কল্পনা অবাধ। তাহলে তো উন্মাদ ব্যক্তি আরো বেশি কবি—

'কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জিত, সুশিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক। কল্পনাকে যথা পথে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি ও রুচি থাক আবশ্যক করে। ... বৈজ্ঞানিকরা একভাবে জগৎ দেখেন, দার্শনিকেরা একভাবে দেখেন ও কবিরা আর একভাবে দেখেন। ...তুমি কি বল, উহার মধ্যে দুই প্রকার পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে শিক্ষার আবশ্যক কবে আর তৃতীয়টিতে করে না, শুদ্ধ করে না তাহাই নয়, শিক্ষাতেই তাহার বিনাশ।' (বাঙ্গালী কবি নয়)

'নীরব কবি' কথাটি সম্পর্কে কবি চিরকালই বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। 'বাঙ্গালী কবি কেন' প্রবন্ধটি শুরুই হয়েছে এই প্রসঙ্গ দিয়ে—

'একটা কথা উঠিয়াছে, মানুষমাত্রেই কবি। যাহার মনে ভাব আছে, যে দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে, সেই কবি। কথাটা খুব নূতনতর।'.....এমন কি নীরব কবি বলিয়া একটি কথা বাহির হইয়া গিয়াছে।'

কিন্তু এর চেয়ে হাস্যকর কথা আর কিছুই হতে পারে না কারণ কবির মতে 'নীরব' ও 'কবি' শব্দ দুটি পরস্পর-বিরোধী—

'যে ভাব বিশেষ ভাষায় প্রকাশ হয় নাই তাহা কবিতা নহে ও যে ব্যক্তি ভাব বিশেষ ভাষায় প্রকাশ হয় নাই তাহা কবিতা নহে ও যে ব্যক্তি ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ করে না সেও কবি নহে।'

'বাঙ্গালী কবি নয়'তে রবীন্দ্রনাথ 'বাঙ্গালী কবি কেন'র রচয়িতাকে বিদ্রূপ করে বলেছেন যে, এত কথার মারপ্যাঁচে কি দরকার? বাঙালি কবি কি না তা তো বাংলা কাব্যের ইতিহাস লক্ষ্য করলেই জানা যায়। প্রাচীন সাহিত্যে কবিকঙ্কণের মহাকাব্যে যেমন মহাকাব্যের আয়তন ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না—আধুনিক কালেও অসংখ্য বাংলা গীতিকবিতা সজনি, প্রিয়তমা ইত্যাদি নিয়ে হা হুতাশ করলেও—

'কয়টি বাঙ্গালা কাব্যে এমন কল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্ত জগৎ যে কল্পনার

ক্রীড়াস্থল। যে কল্পনা দুর্বলপদ, শিশুর মত গৃহের প্রাঙ্গন পার হইলেই টলিয়া পড়ে না ?' (বাঙ্গালী কবি কেন ?) ।

'বাঙ্গালী কবি নয় কেন'-তে রবীন্দ্রনাথ আরো সরাসরি বলেছেন, নিশেষ্ট বাঙালি সমাজের কোন গুণই নেই—

'বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক নয়, বাঙ্গালী দার্শনিক নয়, বাঙ্গালী কবিও নয় ।'

আসল কথা সাহিত্য একটি সাধনা এবং কঠিন অনুশীলনের পথেই সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব—কবির এই অভিমতটিই মুখ্য । 'ভারতী'র পাতায় রবীন্দ্রনাথের এই বিতর্কটির মূল্য তাই আজও সমান প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ ।

'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলির পাশাপাশি সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি বিষয়ক এবং জীবনের ছোটবড় বহু সমস্যা সম্পর্কিত অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । বিচিত্র সমস্যামূলক সমাজচিন্তামূলক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'যথার্থদোসর' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮), 'গোলামচোর' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮), 'নিমন্ত্রণ সভা' (আষাঢ়, ১২৮৮), 'একচোখা সংস্কার' (আষাঢ়, ১২৮৮), 'চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়' (শ্রাবণ, ১২৮৮), 'দারোয়ান' (ভাদ্র, ১২৮৮), 'জীবন ও বর্ণমালা (কার্তিক, ১২৮৮), 'রেলগাড়ি' (অগ্রহায়ণ, ১২৮৮) ইত্যাদি । জীবনের বিচিত্র সমস্যা নিয়ে আলোচিত এইসব প্রবন্ধে সমাজ ও জীবন সম্পর্কে লেখকের সরস ও ব্যঙ্গকৌতুকপূর্ণ বহু অভিমত ব্যক্ত হয়েছে । জীবনের বিচিত্র সমস্যা অল্পবয়স থেকেই কিশোর কবির চিত্তকে যে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল প্রবন্ধগুলি তারই সাক্ষ্য বহন করে ।

'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত জাতীয়তা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যেও প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের স্বদেশচিন্তার প্রকাশ ঘটেছে । ১২৮৮-র 'ভারতী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ সংখ্যায় জাতীয়তা সম্পর্কে তিনটি—প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—'জাতীয়তা ও বিজাতীয়তার উপদ্রব', 'জাতীয়তার নিবেদন' এবং 'জাতীয়তার নিবেদনে অনতিজাতীয়তার বক্তব্য'। পরিণত বয়সে মানসিক স্বাধীনতা অর্জনের দ্বারাই যে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব— এই বিশ্বাসে তিনি যে উপনীত হয়েছিলেন তারই অঙ্কুরোদগম 'ভারতী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যায় ।

মাত্র ষোল বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'করুণা' (আশ্বিন, ১২৮৪-ভাদ্র, ১২৮৫) ধারাবাহিকভাবে লেখেন । সমসাময়িক সমাজের পটভূমিকায় 'করুণা'র কাহিনী বিস্তারলাভ করেছে । রবীন্দ্রনাথের এই যুগের আখ্যায়িকা বা গাথাকাব্যের তুলনায় 'করুণা'র কাহিনীতে সমাজচেতনা অনেক বেশি বাস্তব ও মনস্তত্ত্বসম্মত । এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির সঙ্গে সমকালীন সমাজের গভীর যোগ লক্ষ্য করা যায় । মদ্যপান, বিধবাবিবাহ, সমাজ সংস্কারের নামে উচ্ছৃঙ্খলতার যে চিত্র সে যুগের প্রহসনে পাওয়া যায় 'করুণা'র সমাজচিত্র অনেকাংশে তারই অনুবৃত্তি । উপন্যাসের অনিবার্য বাস্তবতা ও সমাজসচেতনতার আভাস রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম উপন্যাসটিতে সূচিত হয়েছে । ঐতিহাসিক রোমান্সের পরিবর্তে কিশোর

লেখকের সামাজিক উপন্যাস রচনার এই প্রথম প্রয়াসের মূল্য কম নয় । এছাড়াও এই উপন্যাসের উপকাহিনীতে মহেন্দ্র-রজনী-মোহিনীর ত্রিভুজপ্রেমের চিত্রকে 'চোখের বালি' উপন্যাসের খসড়া বলা যায় । ত্রিভুজপ্রেমের চিরদিনের এই কাহিনীরই সম্প্রসারিত রূপ যেন 'চোখের বালি' উপন্যাসে দেখা যায় । অর্থাৎ 'ভারতী'র অঙ্গনেই বঙ্কিমীরীতিকে অতিক্রম করে মাত্র ষোল বছর বয়সেই প্রথম সামাজিক উপন্যাস রচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যতের ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের বুনিয়াদটি নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন । যদিও আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং সর্বগ্রাসী বঙ্কিমী প্রভাবকে অস্বীকার করা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভবপর হয়নি, যার ফলে অচিরেই তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল ইতিহাসের ঘটনাবলীতে । 'ভারতী'তে প্রকাশিত তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'বউঠাকুরানীর হাট' (কার্তিক, ১২৮৮ - আশ্বিন, ১২৮৯) বাংলাদেশের এক ঐতিহাসিক কাহিনী অনুসরণে রচিত । ধূমঘাটের মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কাহিনীই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু । যদিও এতে প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্তরায়, পুত্র উদয়াদিত্য, কন্যা বিভার গল্প আছে, যার অধিকাংশ ইতিহাসে নেই । প্রতাপাদিত্যের রূঢ় নির্মমতায় কীভাবে তাঁর অন্তঃপুরে শান্তি বিঘ্নিত হল, পুত্র-কন্যার জীবন বিষময় হল, পিতৃব্য প্রাণ হারালেন এবং সদ্য-বিবাহিতা কন্যা বিভার দাম্পত্যজীবন ব্যর্থ হয়ে গেল— সেই বেদনার কাহিনীটি এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ অতি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । এতে তিনি প্রচলিত আদর্শ পরিত্যাগ করে প্রতাপাদিত্যকে উদ্ধত, অবিনয়ী, মূঢ়, নির্মম ও অপরিণামদর্শী চরিত্র হিসেবে এঁকেছেন—যা যুবক রবীন্দ্রনাথের এক দুঃসাহসিক কর্ম বলেই স্বীকৃত হয়; কারণ অধিকাংশ দেশবাসীরই সমর্থন ছিল না প্রতাপাদিত্যের এহেন চরিত্রচিত্রণে, কিন্তু আধুনিককালের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর চরিত্রের বেশ কিছু ত্রুটি তাঁকে যথার্থ শ্রদ্ধেয় বলে মান্য করতে বাধা দেয়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যে সর্বগ্রাসী 'ইম্পিরিয়ালিজম্'কে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন, প্রতাপাদিত্যের আচরণের মধ্যে সেই প্রচন্ড ক্ষুধার হানিকর প্রাচুর্য দেখেছিলেন। যাইহোক 'বউঠাকুরানীর হাট'-এ রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে আশ্রয় করে কাহিনীকে বস্তুভিত্তিক কল্পনার জগতে মুক্তি দিলেন এবং সার্থক ঔপন্যাসিক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটল ।

'ভারতী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও প্রথম ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত । ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় চারটি পরিচ্ছেদে প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিনী' প্রকাশিত হয় । যদিও 'ভিখারিনী'কে ছোটগল্প না বলে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার প্রথম প্রয়াস বলাই সঙ্গত । 'ভিখারিনী'র কাহিনী বর্ণনায় অপরিণতির চিহ্ন আছে, অপরিণত মনের রোমান্টিক ভাবলুতা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে । প্রকৃতপক্ষে 'ভিখারিনী' যখন লেখা হয় বাংলা ছোটগল্পের তখন প্রকরণ-বিষয়ক পরীক্ষা-পর্বেরই কাল । পত্র-পত্রিকার তাগিদে ছোটগল্প সৃষ্টির নানা প্রয়াস লক্ষ্য করা গেলেও বাংলা ছোটগল্প তখন আঙ্গিকগত পূর্ণতা লাভ করেনি । ছোটগল্প সৃষ্টির সেই আদি যুগে 'ভিখারিনী' অবশ্যই এক উল্লেখযোগ্য প্রয়াস । কিন্তু প্রথম সার্থক ছোটগল্প 'ঘাটের কথা' (কার্তিক, ১২৯১) 'ভারতী'তেই প্রকাশিত হয় । বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ বলেছেন—

এখন থেকে একশো পনেরো বছর আগে প্রকাশিত এই রচনাটিতে অতি আধুনিকমানের

বিচারেও প্রথম শ্রেণীর রসোত্তীর্ণ, ছোটগল্পের সর্বাঙ্গ সুন্দর সার্থক একটি নিদর্শনরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত ।[১৭]

এরপর থেকেই রবীন্দ্র লেখনী থেকে উৎসারিত হতে শুরু হল একের পর এক আশ্চর্য সব ছোটগল্প । ১২৯৮ বঙ্গাব্দে 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশের ফলে যদিও রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে 'ভারতী' সাময়িক বঞ্চিত হয় তথাপি ১৩০৫ বঙ্গাব্দে স্বয়ং 'ভাবতী'র সম্পাদনার দায়িত্ব পাওয়ায় আবার 'ভারতী' রবীন্দ্র সৃষ্টিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে । মাত্র এক বছরের সম্পাদকীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ সাতটি গল্প রচনা করেন— 'দুরাশা' (বৈশাখ, ১৩০৫), 'পুত্রযজ্ঞ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫), 'ডিটেকটিভ' (আষাঢ়, ১৩০৫), 'অধ্যাপক' (ভাদ্র, ১৩০৫), 'রাজটিকা' (আশ্বিন, ১৩০৫), 'মণিহারা' (অগ্রহায়ণ, ১৩০৫), 'দৃষ্টিদান' ((পৌষ, ১৩০৫) । বিচিত্র রসে কল্পিত এই গল্পগুলি। যেমন, 'দুরাশা'য় আচারধর্ম ও মানবধর্মের মধ্যে যে শাশ্বত বিরোধ চলছে তার মর্মান্তিক ট্রাজেডি গল্পাকারে অঙ্কিত । 'পুত্রযজ্ঞ' গল্পটিও 'সম্পত্তি সমর্পণ'-এর মতো নিষ্ঠুর কাহিনী । 'মণিহারা' গল্পটি অতিপ্রাকৃত পরিবেশে এক নারীর স্বর্ণলিপ্সা ও তজ্জনিত অপঘাত মৃত্যুর বৃত্তান্ত । অতিপ্রাকৃত পটভূমিকায় উপস্থাপিত গল্পটি আশ্চর্য মনস্তাত্ত্বিক কাহিনীও । অতিপ্রাকৃত রসের আবেদনমূলক গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের অবিশ্বাস্য ভাষা ঐশ্বর্যেরও অসামান্য প্রদর্শনী । 'দৃষ্টিদান' গল্পটিতে স্বামীর চরিত্রটি সুনিপুণ, কাহিনীও মনস্তাত্ত্বিক । অন্ধ স্ত্রীর প্রতি বিমুখস স্বামী কিভাবে আবার চৈতন্যলাভ করল তারই আশ্চর্য মনস্তাত্ত্বিক আলেখ্য অঙ্কন করেছেন রবীন্দ্রনাথ । এই পর্বে রচিত গল্পগুলি রবীন্দ্র গল্পসাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট ছোটগল্প । এব ঠিক তিন বছর পরই 'ভারতী'র পাতায় রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'নষ্টনীড়' (বৈশাখ-অগ্রহায়ণ, ১৩০৮) প্রকাশিত হয় । বঙ্কিমী ঘরানাকে অতিক্রম করে সমকালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাস্তবধর্মী উপন্যাস 'চোখের বালি' রচনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন । 'নষ্টনীড়' ও 'চোখের বালি'র বিষয়বস্তু সমাজ নিষিদ্ধ প্রেম । রোমান্টিক আদর্শকে বর্জন করে রিয়েলিজমকে প্রতিষ্ঠিত করলেন রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীতে । 'নষ্টনীড়'-এ রবীন্দ্রনাথ সমাজের স্বার্থে শিল্পকে বিসর্জন দেননি । তাই বিশুদ্ধ আর্ট হিসাবে 'নষ্টনীড়' প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টি । যে দুরন্ত প্রেম চারুকে বিদীর্ণ করে দিল সেই প্রেমকে চারু আঁচলের আড়ালে চেপে রাখতে পারেনি । তিনটি মূল চরিত্রের মানসিক টানাপোড়েন এবং অবশেষে অনিবার্য নিপুণতায় ঋজু গতিতে গল্পটি সমাধানহীন ভয়াল পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে । বৈবাহিকতার সংস্কারে আবদ্ধ নারী হৃদয়ের স্বাধীন ভালবাসার যে প্রকাশ 'নষ্টনীড়' গল্পে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন এবং তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এখানেই এই গল্পের যাবতীয় সার্থকতা । ভাবতে অবাক লাগে এই শতাব্দীর সূচনালগ্নে রবীন্দ্রনাথ এমন দুঃসাহসিক গল্প লিখলেন 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় । সুতরাং 'ভারতী' বাংলার গল্পসাহিত্যের এক পালাবদলেরও অন্যতম প্রধান অঙ্গন হয়ে উঠতে পেরেছে ।

সমকালের আর একজন প্রধান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রেরও আত্মপ্রকাশ 'ভারতী'তে । ১৩১৪-র বৈশাখ থেকে শুরু হয়েছে তাঁর 'বড়দিদি' গল্প । এইভাবে ভারতী ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকের প্রায় সকল প্রধান লেখক-লেখিকার প্রকাশস্থল হয়ে উঠতে পেরেছিল । বিশেষ করে 'ভারতী' রবীন্দ্রনাথের লেখা নির্বিচারে প্রকাশ করে সাহিত্য অঙ্গনে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক সহায়তা

করেছে। 'ভারতী'র প্রথম বছরেই সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুমুখী প্রতিভার উন্মোচন ঘটিয়েছিলেন। সুতরাং 'ভারতী' পত্রিকার অন্যতম অবদান কিশোর রবিকে রবীন্দ্রনাথ করে তোলার অবারিত প্রেরণা।

গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি 'ভারতী'তে নানা সরস রম্যরচনা জাতীয় লেখাও নিয়মিত প্রকাশিত হত যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'সম্পাদকের বৈঠক', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'সম্পাদকের চিত্র চয়ন', 'ভৌগোলিক প্রশ্ন', 'কাব্যজগৎ', 'সাময়িক প্রসঙ্গ', 'রাজ্যের কথা', 'সমসাময়িক সাহিত্য', 'খেয়াল খাতা', 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা', 'ঘর ও বাহির', 'প্রাপ্ত গ্রন্থ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'সম্পাদকের বৈঠক' বিভাগে বিদেশি সাময়িক সাহিত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণগুলি নিয়মিত সংকলিত হত। 'জিজ্ঞাসা ও উত্তর' বিভাগে কোন পাঠক প্রশ্ন পাঠালে তার উত্তর দেওয়া হত। 'খেয়াল খাতা'য় হালকা মেজাজের রম্য রচনাধর্মী লেখা ছাপা হত, যার নিয়মিত লেখক ছিলেন বীরবল, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখকেরা। এই ধরনের বিচিত্র চিত্তাকর্ষক আয়োজনের জন্যই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে 'ভারতী' বাংলা সাহিত্যের পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখতে পেরেছিল।

রচনারীতির ক্ষেত্রেও ভাষাকে সহজ, সরস কথ্য ভাষার কাছাকাছি আনবার প্রচেষ্টায় 'ভারতী' তৎপর ছিল। লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম চলিত ভাষায় লেখা গদ্যগ্রন্থ 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' ধারাবাহিকভাবে 'ভারতী'তে 'য়ুরোপ যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' (বৈশাখ, ১২৮৬-শ্রাবণ, ১২৮৭) নামে প্রকাশিত হয়। 'ভারী কাজে ব্যস্ত হাই তোলবার সময় নেই। সময় যদি নিলেমে বিক্রি হয় তা হলে যত ব্যস্ত লোক সংসারে আছে আমি সকলের চেয়ে চড়া দাম ডাকি — এত কাজ। এমন অবস্থায় তোমাদের চিঠি লেখা সামান্য কথা, এত ব্যস্ত অবস্থায় লিখতে বসলে কী বিপদ ঘটে জানো ? মনের বাক্সের চাবি পকেট হাতড়ে খুঁজে পাওয়া যায় না, যদি বা বাক্স খোলা গেল তাড়াতাড়ি ব্যস্তসমস্ত ভাবে, হাঁসফাঁস করতে করতে হুটপাট করে, যেখানে যত ভাব, গোছানো ছিল খুঁজতে গিয়ে সমস্ত ওলটপালট বিপর্যস্ত করে ফেলি—এটা তুলচি, ওটা তুলচি, কিন্তু যেটা আবশ্যক সেইটে পাওয়া যায়না।' (ত্রয়োদশ পত্র, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র)

বৈঠকি মেজাজে কথোকথনের আঙ্কি কে লেখা গদ্যের আবির্ভাব ঘটল বাংলা সাময়িক পত্রে। 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮) থেকে মাত্র ৬০ বছরের মধ্যে বাংলাভাষার ইতিহাসের এই রূপান্তর নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক ঘটনা। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বাংলা সাহিত্যে প্রথম চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়াস 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতেই সম্ভবপর হয়েছিল, যার বেশ কিছুকাল পরে বিবেকানন্দের রচনায় এবং 'সবুজপত্র'-এ ব্যাপকভাবে যার চর্চা ও অনুশীলন সূচিত হয়।

এই পত্রের যে বিষয় নিয়ে তাঁর দেশস্থ শ্রদ্ধেয় অভিভাবক শ্রেণীর সঙ্গে বিরোধ বাধাল সে হচ্ছে ইউরোপের স্ত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ। তিনি লিখছেন—'এখানে যতগুলি ভারতবর্ষীয় এসেছেন সর্বপ্রথমেই তাদের চোখে কি ঠেকেছে ? এখানকার সমাজের সুখ ও উন্নতিসাধনে মহিলাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা। যাঁরা স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন এখানে এসে নিশ্চয় তাঁদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে।'

এর বক্তব্য নিয়ে যেমন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে কিশোর কবিব বিতর্ক চলেছিল, ঠিক তেমনই লক্ষ্য করবার বিষয় এই প্রবন্ধের ভাষাভঙ্গিও কত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও বাস্তবানুসারী। ঊনবিংশ শতাব্দীব দ্বিতীয়ার্ধে সাধু গদ্যের ব্যাপক প্রচলনের কালে চলিত গদ্যের এমন সুনিপুণ ব্যবহার অবশ্যই নজিরবিহীন । এই পত্রগুলির ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন । 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ'-এর মুখবন্ধে যুরোপ-প্রবাসীর পত্রশ্রেণীর স্বপক্ষে তিনি বলেছেন—

> যুরোপ-প্রবাসীব পত্রশ্রেণী আগাগোড়া অরক্ষণীযা নয় । এর স্বপক্ষে একটা কথা আছে সে হচ্ছে এর ভাষা । নিশ্চিত বলতে পাবিনে কিন্তু আমার বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষায় লেখা বই এই প্রথম । আজ এর বয়স হল প্রায় ষাট। সেক্ষেত্রেও আমি ইতিহাসের দোহাই দিয়ে কৈফিয়ৎ দাখিল করব না । আমার বিশ্বাস বাংলা চলিত ভাষায় সহজ প্রকাশ-পটুতার প্রমাণ এই চিঠিগুলির মধ্যে আছে ।[১৮]

বক্তব্য ও ভাষারীতি উভয় ক্ষেত্রেই কিশোর রবীন্দ্রনাথের অত্যাধুনিক মানসিকতার উন্মেষেই এই প্রবন্ধের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং 'ভারতী' পত্রিকা এই পত্রাবলী প্রকাশ করে এক সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক কর্মপ্রচেষ্টার পথিকৃৎরূপে স্বীকৃত হয়ে রইল ।

বাংলার অবহেলিত লোকসঙ্গীত ও ছড়ার সংগ্রহ, সম্পাদনা ও প্রকাশনা বিষয়ে 'ভারতী' এই সময়ে এক দুঃসাহসিক ভূমিকা পালন করে । স্বদেশীয় এই গৌরবময় সাহিত্য সম্পদকে বিলুপ্তির পথ থেকে রক্ষা করে 'ভারতী' বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার পথকেও উন্মুক্ত করে দেয় । এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বই সর্বাধিক। 'গ্রাম্য সাহিত্য' (ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩০৫), 'বাউলের গান' (বৈশাখ, ১২৯০) প্রভৃতি প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি বাংলা লোকসাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে সচেষ্ট হয়েছিলেন ।

'ভারতী' প্রথমাবধি তরুণ গদ্যলেখকদের প্রতি আনুকূল্য দেখিয়েছিল । সুধী সমালোচকের প্রাজ্ঞ মন্তব্যটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য—

> বর্তমান শতাব্দীর বহু শ্রেষ্ঠ ও কৃতী লেখক ভারতীর আসরে ভর করিয়াই সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন । ইঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১। ইনিই ছিলেন ভারতীর আসরে উপান্ত্য পালার মূল্য অধিকারী । বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে ভারতীকে আশ্রয় কবিয়া যে সাহিত্য-গোষ্ঠী জমিয়াছিল তাহার চৈত্ত্যগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং দীক্ষাগুরু অবনীন্দ্রনাথ।[১৯]

চিত্র ও লেখ্য উভয় কর্মেই অবনীন্দ্রনাথের রূপদক্ষতার নিজস্ব, অসাধারণ পরিচয় পরিস্ফুট । রূপচিত্র এবং রূপকথা দুই-ই অবনীন্দ্রনাথ প্রায় একই সময়ে শুরু করেছিলেন, কিন্তু রূপচিত্রে সিদ্ধিলাভ করার পূর্বেই তিনি রূপকথায় সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন ।

অবনীন্দ্রনাথ রাজপুত কাহিনীতে যে নতুন রস সঞ্চারিত করেছিলেন তা হল চিত্রশিল্পীর তুলির টানে উপজাত রেখা ও রঙের রূপরস । রাজপুত নারীর বিচিত্র বেশ, রাজপুত পুরুষের ধৈর্য ও বীর্য এবং পূর্বাগত দেশপ্রেমের উদ্দীপনা ইত্যাদি ছিল তাঁর প্রধান উপজীব্য । ভারতীয় শিল্পরসের সূত্রে ভারতবর্ষকে তিনি অতীত ইতিহাসের মধ্যে খুঁজতে চেয়েছিলেন । যাঁর নিদর্শন ছড়িয়ে

আছে 'ভারতী'তে প্রকাশিত তাঁর 'গোহ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১), 'পদ্মিনী' (আশ্বিন, ১৩১১), 'বাপ্পাদিত্য' (শ্রাবণ, ১৩১১), 'নালক' (বৈশাখ-ভাদ্র, ১৩২২) ইত্যাদি গল্পের মধ্যে। অল্পবয়সীদের উপলক্ষ্যে রচিত তাঁর গল্পগুলি নতুনতর মাধুর্যের প্রবাহপথে খুলে দিয়েছিল পাঠকের সম্মুখে।

ছেলেভুলানো ছড়া ও ব্রতকথাব সংগ্রহে ও সৌন্দর্যবিশ্লেষণে আদিকর্মী রবীন্দ্রনাথ। তাঁরই প্রদর্শিত সেই পথ অবনীন্দ্রনাথ অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁর রূপশিল্পীমন এই পথে নব নব সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ ও প্রদর্শন করে চলেছিল। মেয়েলি আলপনা চিত্রের সন্ধানে তিনি হানা দিলেন ব্রতকথার অন্দরমহলে। আর তারই সৃষ্ট ফসল 'বাংলাব ব্রত' (কার্তিক-ফাল্গুন, ১৩২৫)।

অবনীন্দ্রনাথের একেবারে গোড়ার দিকে শিল্পতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধগুলির গম্ভীব এবং সাধুভাষায় বচিত। এই ধরনের একটি রচনা 'দেবী-প্রতিমা'(শ্রাবণ, ১৩০৫)। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর মাধুর্যমন্ডিত ভাষায় শিল্পপ্রসঙ্গের আলোচনাগুলি দীর্ঘকাল শিল্পরসিক পাঠকদের মুগ্ধ করেছে, যার অন্যতম বিখ্যাত একটি হল 'দৃষ্টি ও সৃষ্টি' (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩২৯)।

অবনীন্দ্রনাথের এক আশ্চর্য সৃষ্টি 'আলোর ফুলকি' (বৈশাখ-অগ্রহায়ণ, ১৩২৬) উপন্যাসটি 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। পাত্র-পাত্রীরা হল মোরগ-মুবগী, চড়ুই, টিয়া, পেঁচা ইত্যাদি বহু পাখি ও কুকুরসহ কয়েকটি জন্তু। পঞ্চতন্ত্রের মতো এরা পশুপাখির সাজে মানুষের ভূমিকা নিয়েছে। নায়ক কুঁকড়ো ও নায়িকা বনটিয়া সোনালিয়া যথাক্রমে সৌন্দর্য-দ্রষ্টার ও সৌন্দর্যের প্রতীক। কবি চিত্রকরের চিরদিনের ভালোবাসার কল্পজগৎ রঙে, রসে, ভাবে, ভাষায়, একটি কাব্যের সমান প্রায় হয়ে উঠেছে।

অবনীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার মূলে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থাকলেও পরবর্তী সময়ে তিনি সে প্রভাবমুক্ত হতে পেরেছিলেন। তিনি সৃষ্টি করেছিলেন নতুন এক রচনারীতির। বিশুদ্ধ কথ্যভাষা যথাসম্ভব তৎসম শব্দ বর্জিত এবং শিশুপাঠ্যের মতো করে লিখলেও যে কত মধুর এবং মনোগ্রাহী হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার মধ্যে পাওয়া যায়। সরল, সহজ কথ্যভাষার ছাঁদে অল্পবয়স্কদের উদ্দেশ্যে লেখা হলেও এই গল্পগুলি সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার স্থান অধিকার করে আছে। অবনীন্দ্রনাথের রচনার সমস্ত শক্তি ও সৌন্দর্য এসেছে লেখকের শিল্পীমানসের সংবেদনশীল সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভব থেকে। তাঁর রচনার বিষয় ও ভাষা পরস্পরকে অবলম্বন করে এমন অখন্ডরূপ পেয়েছে যে বিশ্লেষণ করে রচনার অবয়ব দুটিকে পৃথক করে দেখান সম্ভব নয়। তাঁর লেখাকে যথার্থ 'তুলির লিখন' বলা যেতে পারে। বলা যায়, এক মার্জিত কাব্যধর্মী মধুর যে সাহিত্যাদর্শ 'ভারতী' লালন করেছে, অবনীন্দ্রনাথের রচনাও তারই বাহন।

বস্তুতপক্ষে, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সংযোগসেতু হয়ে উঠেছিল 'ভারতী'। ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও কালক্রমে তা বাংলা সাহিত্যের প্রচুর লেখকের সমাবেশ ঘটিয়ে দীর্ঘকাল বাংলা সাহিত্যের সেবা কবে গেছে, যা বাংলার ক্ষণজীবি সাময়িক পত্র জগতের এক অভূতপূর্ব ঘটনা হিসেবেই চিহ্নিত। বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর মতে —

ভাবতী পত্রিকা দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল ধরে বাঙলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল ।[২৮]

১২৮৪ থেকে ১৩৩৩ সাল পর্যন্ত প্রসারিত পঞ্চাশ বছরের এই পত্রিকায় যেমন প্রতিষ্ঠিত লেখকদের নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হয়েছে তেমনই সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগতদের জন্যও ছিল তার সাদর অভ্যর্থনা । সাহিত্যের আদর্শের মান অক্ষুণ্ণ রেখে সমাজ, শিল্প, সংস্কৃতি নব বিষয়ের আলোচনাতে 'ভারতী' সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বেখেছে । বিশেষ করে কথাসাহিত্যে রক্ষণশীলতা ও গড্ডালিকাধারার প্রতিবাদ করে, জীবন সম্পর্কে বাস্তবতাবোধের প্রকাশ ঘটিয়ে তাঁরা এক বিদ্রোহ-চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন । এছাড়া বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগের সূত্রপাতও 'ভারতী' করেছিল । বিশিষ্ট সমালোচকের মতে—

কিন্তু ভারতী গোষ্ঠীর পূর্বে বিদেশী কথাশিল্পের সঙ্গে বাঙালী কথাসাহিত্যিকদেব ব্যাপক সংযোগের এমন বহিঃপ্রকাশ আর কখনও দেখা যায়নি ।[২১]

'ভারতী'র মধ্যেই এইভাবে ভবিষ্যতের 'সবুজপত্র' এবং 'কল্লোল'-এর আবির্ভাব প্রস্ফুটিত হয়েছিল । পঞ্চাশ বছরের দীর্ঘ জীবনে 'ভারতী'কে সমালোচনার সম্মুখীনও হতে হয়েছে একাধিকবার । তথাপি 'ভারতী' বরাবরই রাবীন্দ্রিক সাহিত্যাদর্শকেই প্রাধান্য দিয়েছে । বলা যেতে পারে, এক মার্জিত কাব্যধর্মী স্নিগ্ধ ভাষা প্রয়োগ করে রোমান্টিক আবহ সৃষ্টির মাধ্যমে সুস্থ সাহিত্যচর্চাই 'ভারতী'র প্রধান লক্ষ্য ছিল । যাবতীয় স্থূলতা, অকারণ উগ্রতা, কদর্থতা এবং অন্ধ যুক্তিহীন প্রথা সর্বস্বতার বিরুদ্ধে আধুনিক মননসমৃদ্ধ বাস্তবসম্মত সাহিত্য রচনার আন্দোলনে 'ভারতী' আজীবন অক্লান্ত ছিল । 'বঙ্গদর্শন'-এর পর 'ভারতী'র এখানেই স্বাতন্ত্র্য ও সিদ্ধি ।

সবুজপত্রের অভিযান (১৯১৪)

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে 'সবুজপত্র'-এর প্রকাশে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন পর্বের সূচনা হল। সে পর্ব কেবল তারুণ্যের জয়গানে মুখর কিংবা চলিত গদ্যের বিজয় অভিযানের পর্ব নয়, তা বাংলা সাহিত্যের পালাবদলেরও পর্ব। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে 'সবুজপত্র' বাংলা সাহিত্যে এক মুক্তির হাওয়া বয়ে এনেছিল। সে মুক্তি হল রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণতার অন্ধ গুহা থেকে মুক্তি, জাত্যাভিমান ও শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা থেকে মুক্তি, ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাস থেকে মুক্তি। এই মুক্তির ফলে নির্মোহ চিন্তার খর সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্র। প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্বে ও রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় সহযোগিতায় এই আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, বরদাচরণ গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, হারীতকৃষ্ণ দেব প্রমুখ সবুজপত্রীরা। সবুজপত্র-গোষ্ঠীর মানসিকতা ছিল নতুন যুক্তিনির্ভর। এই দলের লক্ষ্য ছিল নতুন, যুক্তিনির্ভর বিশ্বনাগরিকতা, বৈদগ্ধ্যমার্জিত বুদ্ধির উদ্বোধন। এদের আগ্রহ ছিল রুচির পরিশীলন ও মার্জনার। প্রখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক ড. জ্যোতির্ময় ঘোষেব মতে—

> ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীনতার বিরুদ্ধে চলিষ্ণু উদীয়মান শক্তির, জরার বিরুদ্ধে যৌবনের, নির্বোধ গতানুগতিকতাব বিরুদ্ধে সম্মুখবর্তী প্রবহমান ধ্যানধারণা এবং অন্ধ প্রতাপমত্ততার ও স্বার্থান্ধতার বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গে অবিচলিত প্রেমেরই বাহন হয়ে উঠতে পেরেছিল সবুজপত্র।[১]

তাই 'সবুজপত্র'-এর বিদ্রোহ শুধু এক জাতীয় সাহিত্য-বিদ্রোহই নয়, এ বিদ্রোহ জীবনের বিদ্রোহ-ও বটে। বিশিষ্ট সমালোচক ড. রথীন্দ্রনাথ রায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> 'সবুজপত্র' যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগের বিদ্রোহী সন্তান।[২]

'সবুজপত্র'-এর মানসিকতা দেশজ মানসিকতা নয়। 'সবুজপত্র' চায়নি পুরাতন পণ্য নিয়ে ঘাটে ঘাটে ঘুরে ফেরি করতে। পত্রিকার আঙ্গিক এবং বিষয়গত দিক সমস্ত ক্ষেত্রেই 'সবুজপত্র' হতে চেয়েছিল সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার থেকে ভিন্ন ধরনের। গড়ে উঠেছিল স্বতন্ত্র চরিত্রবৈশিষ্ট্য। পত্র সম্পাদনার গুণে 'সবুজপত্র'-এর তপস্যা ও সৃষ্টির যথার্থতা লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

সময়ের তাগিদ থেকেই উঠে এসেছিল 'সবুজপত্র'। প্রকাশকাল ১৯১৪। পৃথিবীব্যাপী বেজে উঠেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ তথা বাংলাতে ঘটেছে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল ঘটনা। সদ্য বিদেশ ঘুবে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির চেহারা ও চরিত্র তখন তাঁর কাছে স্পষ্ট। রবীন্দ্রসাহিত্য ভাবনায় দেখা দিল পরিবর্তন। শুরু হল নতুন করে সাহিত্যের ভূমিকর্ষণ। নতুন বিষয়, নতুন কাব্যভাষা এবং নতুন ছন্দের ত্রয়ী সম্মিলনে সৃষ্টি হল 'বলাকা' কাব্য। নতুন কাগজের সন্ধান শুরু হল। সমসাময়িক বিভিন্ন খ্যাত-অখ্যাত পত্রিকা প্রচুর। কিন্তু এমন কাগজ চাই যা স্বতন্ত্র চরিত্রের আর মেজাজের।

'সবুজপত্র'ই হল সেই কাঙ্খিত পত্রিকা । কালচেতনা ও ভাবনাগত তাৎপর্য দুয়েরই সমন্বয় ঘটেছে 'সবুজপত্র'-এ । 'সবুজপত্র' থেকেই বাংলা সাহিত্যের পালাবদল ঘটেছে।

সবুজপত্রেব বাজা ববীন্দ্রনাথ, সামন্ত প্রমথ চৌধুরী ।[৩]

বাংলা সাহিত্যের সুপন্ডিত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. সুকুমার সেনও সমমত পোষণ কবেন—

সবুজপত্রের সাবথি রবীন্দ্রনাথ, গাণ্ডীবী সব্যসাচী প্রমথনাথ ।[৪]

রবীন্দ্রনাথের সম্মতিতে, প্রেরণায়, উৎসাহে, বিশেষ ইচ্ছায় এবং সক্রিয় সহযোগিতায় তাঁরই শুভ জন্মদিনে ১৩২১ সালে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল । 'সবুজপত্র'-এর প্রথম সংখ্যায় মোট পাঁচটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল । লেখকসহ সেগুলি হল—

১. মুখপত্র — সম্পাদক
২. সবুজপত্র — বীরবল
৩. সবুজের অভিযান (কবিতা) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪. বিবেচনা ও অবিবেচনা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. হালদার গোষ্ঠী (গল্প) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬. সবুজপাতার গান (কবিতা) — সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রচলিত-অপ্রচলিত কোন বাংলা মাসিকপত্রের 'সবুজপত্র'-এর মিল ছিল না । সাইজ অর্ধ-ফুলস্কোপ । ছবি নেই । সমসাময়িক সময়ে বিজ্ঞাপনকে যেখানে পত্রিকার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে মনে করা হত, 'সবুজপত্র'-এ সেখানে একছত্রও বিজ্ঞাপন ছিল না । বিভিন্ন বিভাগের ভাগ ছিল না । গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন কলমে প্রকাশিত হত । 'সবুজপত্র'-এর মলাটেব মাঝখানে সবৃন্ত তালপাতার গাঢ় ছায়াছবি । উদ্ধত, অদম্য, চিরহরিৎ, বাংলাদেশেব সর্বত্র পরিচিত, চিরকালীন প্রাণের সরল, সবল উদ্দন্ত ঊর্ধ্বাভিমুখিতার চিহ্ন এই অভিনব তালধবজ। 'সবুজ' নবসৃষ্টির প্রেরণায় তারুণ্যের প্রবল উন্মাদনায় ভরপুর । সুতরাং প্রচলিত সাময়িকপত্র জগতে রূপাবয়বের দিক থেকেও 'সবুজপত্র' এক পালাবদল ঘটিয়েছিল ।

'সবুজপত্র'-এর পরমায়ু কোনক্রমে দশ বছর ধরা যেতে পারে, মাঝখানে অবশ্য ছেদ পড়েছে কয়েকবাব । কখনো বা এই ছেদ দীর্ঘকালীন । একমাত্র ১৩২১ বঙ্গাব্দে পত্রিকাটির বাবো মাসে বারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল । ১৩২২-এ ভাদ্র ও আশ্বিন এবং ১৩২৩-এ আশ্বিন-কার্তিক যুগ্মসংখ্যা ছাড়া প্রতি মাসে প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছিল । ১৩২৪-এ আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৫-এ কার্তিক-অগ্রহায়ণ এবং ১৩২৬-এ ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হয়েছিল । ১৩২৮ সাল থেকে 'সবুজপত্র'-এর প্রকাশনে গোলযোগ দেখা দিতে থাকে । ১৩২৮-এর বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় সংখ্যা তিনটি প্রকাশিত হতে পারেনি এবং কার্তিক-অগ্রহায়ণ ও মাঘ-ফাল্গুন উভয়ই যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল । এরপর ১৩২৯-এর জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৩৩৩-এর ভাদ্র পর্যন্ত কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি । কিন্তু ১৩৩৩-এর আশ্বিন থেকে আবার প্রকাশিত হতে থাকে । ঐ সালের কার্তিক-অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হল যুগ্ম সংখ্যা । ১৩৩৪-এর বৈশাখ সংখ্যার পরেই দুটি যুগ্ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এবং শ্রাবণ ও ভাদ্র প্রকাশিত হবার পর 'সবুজপত্র' আর প্রকাশিত হয়নি । 'সবুজপত্র'-এর জীবিতকাল সামান্য হলেও বাংলা সাহিত্যে এই পত্রিকার অবদান অপরিসীম ।

শ্রাবণ, ১৩৩৩।



সম্পাদক—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সবুজপত্র-এর একটি সংখ্যার প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা

'সবুজপত্র' নাম ও পত্রিকার মলাটের সবুজ রং ছিল পত্রিকাটির চরিত্রের দ্যোতক। সবুজ তারুণ্যের বর্ণ, প্রাণ ধর্মের বর্ণ-পত্রে—'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' বাণীটি ছিল এই পত্রিকার মূলমন্ত্র। বলা যেতে পারে, প্রথম মহাযুদ্ধকালে ইউরোপীয় সাহিত্যে যে প্রাণেব লীলা দেখা গিয়েছিল, 'সবুজপত্র'-এর লেখকগোষ্ঠী তাকেই বাংলা সাহিত্যে আনতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী প্রথম সংখ্যায় 'সবুজপত্র' : মুখপত্র'-এ ঘোষণা করেছেন—

'ইউরোপের স্পর্শে আমরা আর কিছু না হোক, গতি লাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে, সেই আনন্দ হতেই আমাদের নব সাহিত্যের সৃষ্টি।'

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল যে—

সবুজপত্র উদ্‌গমেব সময় হয়েছে।[৫]

বস্তুতপক্ষে, প্রথম মহাযুদ্ধকালে ইউরোপীয় সাহিত্যে যে প্রাণের লীলা দেখা গিয়েছিল, 'সবুজপত্র'-এর লেখকগোষ্ঠী তাকেই বাংলা সাহিত্যে প্রবিষ্ট করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সম্পাদকের উদ্দেশ্যে স্মরণ করা যেতে পারে—

দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর। ... আমাদেব এই ক্ষুদ্র পত্রিকা আশাকরি এ বিষয়ে লেখকদের সহায়তা করবে।[৬]

তাই দেখা যায়, দেশোত্তর প্রেরণার আহ্বানে ও দেশের ঐতিহ্যকে স্মরণ করে সংহত, পরিচ্ছন্ন যুক্তিভিত্তিক নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে নিজ সাহিত্য সংস্কৃতিকে পরিমার্জনার চেষ্টা সকল 'সবুজপত্র'-এর লেখায় নির্ভুলভাবে উপস্থিত। শুধুমাত্র বিষয় নয়, ভাষাভঙ্গি, শব্দনির্মাণ তথা আঙ্গিকেও সর্ববিধ বৈচিত্র্য সাধন করে আধুনিকতার ফসল ফলাবার আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিল সবুজপত্র গোষ্ঠী। শ্রদ্ধেয় সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

হৃদ্‌বৃত্তির বদলে চিৎ-বৃত্তি—আবেগ (emotion)-এর বদলে বুদ্ধি (intellect)-বে সাহিত্যসৃষ্টির একমাত্র বাহন রূপে গ্রহণ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী—একেবারে প্রথম থেকেই। 'সবুজপত্র' আশ্রয় করে, এবং 'সবুজপত্র'কে আসরে তাঁর অনুরাগী অনুজ লেখক গোষ্ঠীর বিচিত্রমুখী প্রয়াসে সেই প্রবণতা ব্যাপক স্বীকৃতি যোগ্যতা লাভ করেছিল। প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব স্বতন্ত্রতা, বাংলা সাহিত্যে অনবচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবিতার প্রতিষ্ঠা, 'সবুজপত্র' পর্যায়েই স্পষ্টগোচর এবং পরিণত হয়।[৭]

'সবুজপত্র' প্রকাশিত হল প্রাচীন সংস্কারচ্ছন্ন ভাবনার জগৎ থেকে শিক্ষিত সমাজকে সমৃদ্ধ অলোকিত চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা উপলক্ষ্যে। সমকালীন জনগণের চিত্তকে সাহিত্যের নানা উপকরণ দিয়ে তৃপ্ত করার ব্রত যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে 'সবুজপত্র'-এর উদ্দেশ্যগত পার্থক্যটিও মুখপত্রে ইঙ্গিত করেছেন 'সবুজপত্র' সম্পাদক। নতুন যুগের বার্তাকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করার মূলে যুগ-প্রেরণা যেমন সক্রিয় ছিল, তেমনই বাংলা সাহিত্যে ভোরের পাখিদের 'সবুজপত্র' মন্ডিত সাহিত্যের নবশাখাব উপরে এসে অবতীর্ণ হবার আহ্বানও ছিল আন্তরিক।

'সবুজপত্র' প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের সুপন্ডিত এবং বিদগ্ধ সমালোচক

সুকুমাব সেন বলেছেন—

.. সবুজপত্রেব উদ্দেশ্য হইল — (১) ইউবোপীয় সাহিত্যের স্পর্শে আসিয়া আমাদেব সাহিত্যে যে মুক্তির স্ফূর্তি ও সচলতা আসিয়াছে সেই নূতনের বেগ নিরুদ্ধ না করা। (২) সর্বভূমিক, সর্বজনিক, সর্বকালিক ভাবকে আত্মসাৎ করিযা তাহাকে নিজের দেশে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা—ইউবোপীয সাহিত্যের এই যে শিক্ষা আমাদের গৌরবের অতীত আমাদেব চিনাইযাছে এবং ভবিষ্যতেব স্বপ্ন দেখাইয়াছে — এই শিক্ষা প্রত্যাখ্যাত না কবা। (৩) বাঙ্গালীব জীবনে যে নূতনত্ব আসিযা পড়িয়াছে তাহাকে স্বচ্ছন্দে স্বীকাব ও প্রকাশ কবা। (৪) সাহিত্যকে শিক্ষা ও উপদেশ হইতে স্বতন্ত্র করিযা দেখা, অর্থাৎ সাহিত্যকে সামাজিক প্রয়োজনের সামগ্রী বলিয়াই জ্ঞান না করা। (৫) ভাবকে সংক্ষিপ্ত ও সংহতভাবে প্রকাশ করিবার জন্য লেখার চেষ্টা করা। (৬) ইংরেজী শিক্ষাকে ঠেকাইয়া না বাখিয়া তাহা আমাদেব এক প্রধান হাতিয়ার করিয়া লওযা।[৮]

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ পত্রিকায় সম্পাদকের বা প্রধান লেখকের রচনা বৈশিষ্ট্যে এবং সুবিশাল ব্যক্তিত্বে গড়ে উঠেছে একটি সমমনোভাবাপন্ন লেখকগোষ্ঠী। কখনো বা সচেতনভাবে আবার কখনো বা লেখকদের অজ্ঞাতসারে সৃষ্টি হয়েছে এই লেখকগোষ্ঠী। পত্রিকার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে যখনই লেখকদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সমধর্মিতা লাভ করেছে তখনই লেখকরা এসেছে বা আসতে চেয়েছে একছত্রছায়ায়। 'সবুজপত্র'-এর পূর্বে 'বঙ্গদর্শন' বা 'ভারতী' এবং পরে 'কল্লোল' বা 'পবিচয়'-এ গোষ্ঠী চেতনা ছিল বিদ্যমান। 'সবুজপত্র'-এরও গড়ে উঠেছিল একটি বিশিষ্ট লেখকগোষ্ঠী। শ্রদ্ধেয় সমালোচকের মতে—

'সবুজপত্র'-এর দল যেটি ছিল তাহা মোটেই ভারি ছিল না—কয়েকটি মাত্র শিক্ষিত চিন্তাশীল তরুণ। ইঁহাদের সকলেরই লেখা সবুজপত্রের রঙ-লাগা। সে লেখা ভাব-সংহত, ভাষা-পবিমিত সতেজ ও স্পষ্ট এবং স্বাধীনতা-প্রণোদিত।[৯]

'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে। রবীন্দ্রনাথ দেখা দিলেন 'সবুজপত্র'-এর অন্তরালে প্রমথ চৌধুরীর রথের বল্‌গা ধরে। রবীন্দ্রনাথ অনভিজ্ঞ প্রমথনাথকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন সম্পাদক হিসেবে। ১৯১৬ পর্যন্ত 'সবুজপত্র'-এর মাত্র দু'জন লেখক-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল এবং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথই প্রথম প্রমথ চৌধুরীকে একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরি করার কথা বলেছিলেন।

একটি পত্রে তিনি লেখেন—

সবুজপত্রে কেবলমাত্র সম্পাদক এবং একটিমাত্র লেখক যদি সব লেখে তবে লোকে বলবে কি ?[১০]

এই ইঙ্গিত আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ১৯১৬ সালের ১২ এপ্রিল-এ লেখা চিঠিতে—

আমি সমুদ্র পারের আয়োজন করছি। .ইতিমধ্যে সবুজপত্রটাকে তোমরা বেখে দাও। যত পারো নতুন লেখক টেনে নাও।[১১]

নতুনকে প্রতিষ্ঠাদানের প্রয়োজনে একটা নতুন আন্দোলন করার উদ্দেশ্যে এবং এই উপলক্ষে সমমানসিকতাসম্পন্ন সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত করার অভিপ্রায়েই প্রমথ চৌধুরী

একটি সাহিত্যচক্রের আসর গড়ে তুলতে যত্নশীল হন। রবীন্দ্রনাথের লেখকগোষ্ঠী তৈরি করার নির্দেশ চৌধুরীকে এই সাহিত্যচক্র গড়ে তুলতে বিশেষ আগ্রহী করেছিল। তাঁর বালিগঞ্জের 'কমলালয়'-এ সভার আসরই 'সবুজসভা' হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজ কুমুদনাথের ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়িতে প্রতি শনিবার 'সবুজপত্র'-এর মজলিস বসত। ঐ মজলিসে যাঁরা যোগ দিতেন তাঁরাই 'সবুজপত্র'-এর লেখকগোষ্ঠী। প্রথমাবস্থায় সভায় উপস্থিত থাকতেন হারীতকৃষ্ণ দেব, সুসঙ্গের রাজা সুধীন্দ্র সিংহ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, সতীশচন্দ্র ঘটক, কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তার কিছু পরে এই সভা আরও আকর্ষণীয় এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল ধূর্জটিপ্রসাদ, বরদাচরণ গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিদের সমাগমে। কখনো বা এই সভা রবীন্দ্রনাথের আগমনে পরিণত হত উৎসবে। 'সবুজপত্র'-এর ঐ মজলিশি চেহারা এবং চরিত্র ও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে আমরা জানতে পারি বিভিন্ন সবুজপত্রীর স্মৃতিচারণায়।[১২]

সভার মেজাজ ছিল আড্ডার। আর এই আড্ডা ছিল একেবারে ঘরোয়া আড্ডা। সভার মধ্যমণি ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। বিভিন্ন বিষয় হালকাভাবে সভায় আলোচিত হত। বিষয়গুলি হল—আধুনিক ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ, অলংকার শাস্ত্র, সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা, বের্গস, প্ল্যাঙ্ক ও রাসেলসহ বার্ণাড শ্, ক্রোচে, ফ্রয়েড প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীবৃন্দের বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস বিষয়ক মননশীল আলোচনা। এছাড়া নতুন প্রকাশিত কোনো ইউরোপীয় গ্রন্থ সম্পর্কেও আলোচনা হত সবুজসভায়। সবুজসভার আলোচনারই স্বর্ণফসল ফলেছে 'সবুজপত্র'-এ।

প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান' কবিতা, বীরবলের 'সবুজপত্র' নিবন্ধ ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'সবুজ পাতার গান'—'সবুজপত্র'-এর তরুণ সজীব প্রগতিশীল গতিধর্মকেই উন্মোচিত করেছে। 'সবুজের অভিযান' কবিতা এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়—

শিকল-দেবীর ওই যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া ?
পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা বাছা
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।।

আলোচ্য কবিতাতেই তারুণ্যকে বরণ করে 'সবুজ', 'দুরন্ত', 'জীবন্ত', 'অশান্ত', 'প্রচন্ড', 'প্রমুক্ত', প্রমত্ত' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করে কবি সব প্রবীণ জীর্ণ স্থবিরতার বিরুদ্ধে এক তীব্র সংঘাতকে আহ্বান করেছেন এবং সবশেষে সবুজেব দলকে 'চিরযুবা, তুই যে চিরজীবী' বলে আশীর্বাদ করেছেন। 'সবুজ পাতার গান' কবিতাতেও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন—

আমরা সবুজ অসংকোচে, আমরা তাজা— গৌরবে
আমোদ করি সবুজ মোহে উশীর ঘন সৌরভে;
আমরা কাঁচা, আমরা সাঁচা, মরা-বাঁচার নাই খেয়াল,
আমরা তরুণ,ভয় করিনে ঝোড়ো হাওয়ার রুদ্র তাল।

উদ্ধৃত কবিতাতেই কবি 'এই সবুজের ছত্রতলে যৌবনে দাও রাজটীকা' বলে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রথম সংখ্যাতেই বীরবলের 'সবুজপত্র' নিবন্ধ প্রমাণ করে 'সবুজপত্র'-এর চারিত্রিক মুক্ত প্রাণের ঔজ্জ্বল্যকে —

'আমাদের নব মন্দিরের চারিদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে। উষার গোলাপী, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীললোহিত বিরোধালঙ্কার স্বরূপে সবুজপত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকত দ্যুতি কখন উজ্জ্বল কখন কোমল করে তুলবে।'

ফলত খুব স্বাভাবিকভাবেই কয়েকটি সনাতনপন্থী পত্রিকা, যেমন, 'নারায়ণ', 'সাহিত্য' প্রভৃতি 'সবুজপত্র'-র তীব্র বিরোধিতা শুরু করে। 'নারায়ণ' পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পালের 'নতুনে ও পুরাতনে' (অগ্রহায়ণ, ১৩২১) প্রবন্ধের প্রতিবাদস্বরূপ প্রমথ চৌধুরী 'নতুন ও পুরাতন' (পৌষ, ১৩২১) নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। আমাদের সমাজে নতুন ও পুরাতনের যে বিরোধ দেখা যাচ্ছে, বিপিনচন্দ্র এই দুই পরস্পরবিরোধী মতের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। প্রাবন্ধিকের মতে, সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার মধ্যেই নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে—পুরাতনকে যে-ই নূতন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হল, অমনি নূতন-পুরাতনের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হল। কিন্তু এই জাতীয় পরস্পরবিরোধী পক্ষের মধ্যে বিবাদ-মীমাংসার ভার যিনি নেবেন, তাঁর পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। কিন্তু বিপিনবাবুর লেখার ভিতরে নিরপেক্ষতার প্রমাণ নেই। প্রমথ চৌধুরী বলছেন—

'বিপিনবাবু তাই সংস্কারের উপর গায়ের ঝাল ঝেড়ে নিজেকে ধরা দিয়েছেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, পাল মহাশয়, যারা সমাজকে বদল করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে, আর যারা সমাজকে অক্ষল করতে চায় তাদের পক্ষে।'

বিপিনবাবুর মতে, নতুনের সঙ্গে পুরাতনের মিলনের প্রধান বাধা হচ্ছে নতুন। তিনি তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি নান বিষয়ের অবতারণা করেছেন। বিপিনবাবু হেগেলের থিসিস, অ্যান্টি-থিসিস ও সিনথেসিস-এর মাধ্যমে নতুন-পুরাতনের সমন্বয় ঘটানোর পক্ষপাতী। দর্শনের ছাত্র ও উক্ত বিষয়ের সুপন্ডিত প্রমথ চৌধুরী বিপিনচন্দ্রের এই মতবাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করেছেন। বিপিনচন্দ্রের সমন্বয়ের মূল কথা হল, থিসিস ও অ্যান্টি-থিসিস—উভয়কেই কিছু কিছু ছাড়তে হবে, তা না হলে সিন্‌থেসিস সম্ভব হবে না। কিন্তু হেগেলের 'সিন্‌থেসিস কোনরূপ রফা ছাড়ের ফল নয়।' এছাড়া বিপিনবাবু বলেছিলেন যে, হেগেলীয় ত্রি-তত্ত্বের নামই তমঃ, রজঃ, সত্ত্বঃ। প্রমথ চৌধুরী

এর মধ্যেও আকাশ-পাতাল পার্থক্যের কথা আলোচনা করেছেন । তাঁর মতে, বিপিনবাবু তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে সমাজ-দেবতাকে খিঁচুড়ি ভোগ নিবেদন করেছেন । আমাদের চোখ এমন ঝাপসা হয়ে উঠেছে যে, কোনটি স্বদেশি এবং কোনটি বিদেশি, নির্বাচন করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে । প্রবন্ধটির শেষে লেখক আমাদের কর্তব্য নির্দেশ করে দিয়েছেন—

'এ অবস্থায় বাঙ্গালীর প্রথম দরকার সমাজে নূতন-পুরাতনের সমন্বয় নয়, মনে নূতন-পুরাতনের বিচ্ছেদ ঘটানো । আমাদের শিক্ষা যাকে একসঙ্গে ঘুলিয়ে দিচ্ছে, আমাদের সাহিত্যের কাজ হওয়া উচিত, তা-ই বিশ্লেষণ করে পরিষ্কার করা ।'

এছাড়া বরদাচরণ গুপ্তর 'নতুন কিছু' (মাঘ, ১৩২৩), সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'নতুন ও পুরাতন' (শ্রাবণ, ১৩২৪) প্রভৃতি প্রবন্ধেও নতুন ও পুরাতনের চিরকালীন দ্বন্দ্বে অবশেষে নতুনের জয়ও ঘোষিত হয়েছে ।

ব্যক্তির অধিকার, বিশেষত পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা নির্ধারণ নিয়ে সে যুগে যে বিতর্ক সূচিত হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে 'সবুজপত্র'-এ ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর 'আদর্শ' (ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩২২) ও 'সম্বন্ধ' (বৈশাখ, ১৩২২) প্রবন্ধে আধুনিক নারীর কর্তব্য ও নারী ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠাই ঘোষিত হয়েছে । পারিবারিক সম্বন্ধকে মধুর এবং স্বচ্ছ করে তোলায় নারীর যে বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, তাকেই যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । প্রাবন্ধিক ইন্দিরা দেবী তাঁর 'সম্বন্ধ' প্রবন্ধে বলেছেন যে—

'মেয়েদের সংকীর্ণ পারিবারিক গন্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতেই হইবে, তাহা বলি না। কিন্তু মেয়ে পুরুষ উভয়েরই উচিত নিকট হইতে দূরের পথটুকু মাড়াইয়া চলা, ডিঙাইয়া চলা নয়।'

আসলে পারিবারিক সম্পর্ক সুনিবিড় না হলে সামাজিক বা রাজনৈতিক সম্বন্ধ সুনিবিড় হতে পারে না । বিশেষত নারীর পক্ষে স্মর্তব্য—

'সম্বন্ধের সংখ্যা বা দূরত্বের উপর মহত্ব নির্ভর করে হয়তো, কিন্তু সামঞ্জস্য রক্ষার উপর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে ।' আসলে জীবনযাত্রা একটি শোভাযাত্রা হতে পারে সম্বন্ধ স্থাপনের সুনিপুণ কৌশলে । নারীর প্রধান কাজ গৃহকে সৌন্দর্যময় এবং সুখবহ করে তোলা । নারী মুক্তিদায়িনী, শক্তিরূপিনী, সন্তাপহারিণী ।

'আদর্শ' প্রবন্ধেও আধুনিক নারীর আদর্শ, সমাজ-সংসারে আধুনিক নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে । আদর্শ কখনই স্থির, অচল কোনো অবস্থা নয় । যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার পরিবর্জন ও পরিবর্ধন প্রয়োজনীয় । প্রাচীনকালের জীবনযাত্রায় যতই সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য থাক না কেন, এ কালে তা লভ্য নয় ।

'এই ভাষণের দিনে, উচ্ছৃঙ্খলতার মুখে, আমরা মেয়েরা যদি একটু ঠান্ডাভাবে হাল ধরতে না পারি, তা হলে সংসারতরী যে কোন রসাতলে তলাইয়া যাইবে, তাহার ঠিকানা নাই ।'

সাময়িক উত্তেজনা থেকে মুক্ত হয়ে সচেতন ও সংযতভাবে তিনি আমাদের নারী সমাজকে পদক্ষেপ ফেলতে বলেছেন । স্বাধীনতার প্রচলিত ধারণা থেকে মনের স্বাধীনতার

দিকটিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে নারীর বিশিষ্টতাকে বজায় রেখে তার স্বকীয়তা, তার স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে বলেছেন। পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার সত্ত্বেও তার নারীত্বকে, তার গৃহস্থ মনকে কখনই উপেক্ষা করেননি। অতীত কাতরতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি, আবার স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতাকে একাকার করে দেবাব সমকালীন প্রয়াসকে তিনি গভীরভাবে পুনর্বাব চিন্তা করার আবেদন জানিয়েছেন। ববীন্দ্রনাথও তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা' (ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩২২) প্রবন্ধে নাবীশিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। পুবনো আদর্শকে পরিত্যাগ কবে নারীর আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এইভাবেই 'সবুজপত্র' নবীনপন্থী ও প্রাচীনপন্থীর সংঘর্ষের অস্থিরতাকে সংহত করে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সত্যকে চিহ্নিত করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল।

সমকালীন শিক্ষার সীমাবদ্ধতা 'সবুজপত্র'-র লেখকগোষ্ঠীকে বিচলিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'লোকহিত' (ভাদ্র, ১৩২১), 'শিক্ষার বাহন' (পৌষ, ১৩২২) কিংবা বীরবলের 'শিক্ষার নব আদর্শ' (মাঘ, ১৩২২) প্রভৃতি প্রবন্ধ যেমন নতুন শিক্ষা পদ্ধতির পথ অনুসন্ধানে প্রয়াসী হয়েছিল, ঠিক তেমনই শিক্ষার বিবিধ সমস্যার প্রতি আলোকপাত করে রাবীন্দ্রিক শিক্ষাদর্শকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার পরামর্শও দিয়েছিল। বিভিন্ন সবুজপন্থী তাঁদের প্রবন্ধে বিদেশি শাসনে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা অভাব সত্ত্বেও, বাঙালিকে শিক্ষার মৌল অসঙ্গতি সম্পর্কে অবহিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'লোকহিত', 'শিক্ষার বাহন' প্রভৃতি প্রবন্ধে দেশীয় মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করে তোলবার আহ্বান জানান হয়েছিল। এছাড়াও ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ডিগ্রিধারী তরুণদের ব্যবহারিক জীবনে অকর্মণ্যতার দৃষ্টান্ত তুলে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে, প্রকৃত শিক্ষার অভাব এবং তার ফলাফল কি ভয়াবহ হতে পারে। তাই তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন মনন সমৃদ্ধ যথার্থ শিক্ষিত নাগরিক। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'শিক্ষার লক্ষ্য' (ফাল্গুন, ১৩২৩) ও 'বাঙ্গালীর শিক্ষা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫) — প্রবন্ধ দুটিতেও শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাবন্ধিকের সুগভীর ধারণা অভিব্যক্ত। অতুলচন্দ্র সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, কারণ মানবিক বিকাশের পক্ষে সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী অনেক বিষয় আমাদের গ্রহণ করতে হয়, পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে যা সবসময়ে পাই না। বহু আয়াসলব্ধ সভ্যতার ফলগুলির সঙ্গে শিক্ষাই আমাদের পরিচিত করিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত লেখক ইভলিউশন থিওরি সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব কতখানি গ্রহণযোগ্য সে বিষেয়েও তিনি সংশয়মুক্ত নন। পাশ্চাত্য শিক্ষার কুফল বিষয়ে দেখাতে গিয়ে তিনি যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন, কারণ, এই সময়ে স্বদেশী শিক্ষার আগ্রহে যুক্তি ও সম্ভাব্যতার দিকটি গৌণ করে দেখা হত।

এই প্রসঙ্গে বরদাচরণ গুপ্তের 'লোকশিক্ষা' (ফাল্গুন, ১৩২৩) প্রবন্ধটিও স্মরণীয়। 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর শিক্ষা সংক্রান্ত রচনার সদৃশ। আত্মশক্তির প্রতি অনাস্থা, স্বকীয়তাবোধের অভাবই আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির কারণ বলে প্রাবন্ধিক মনে করেছেন। প্রাবন্ধিকের মতে, কর্মের অনুরোধে আমাদের সাধারণ মানুষ আলস্য বোধ

করেছে, কিন্তু ধর্মের আহ্বান কখনও বিফলে যায়নি—

'শ্রীচৈতন্যের হরি-নামের মোহিনীতে দলে দলে মানুষ মন প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে,— বর্গীর হাঙ্গামায় রুদ্র তান্ডবের প্রতিরোধে কিন্তু একটি প্রাণীও অগ্রসর হয়নি।'

লেখক বিশ্বাস কবেন, লোকশিক্ষার সাহায্যেই আমাদেব সুপ্ত কর্ম-প্রবৃত্তিকেই উদ্বুদ্ধ এবং জাগ্রত করতে হবে । এছাড়াও প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের 'শিক্ষা সমস্যা' (ভাদ্র, ১৩২৪), ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 'শিক্ষা বিস্তার' (পৌষ, ১৩২২) প্রভৃতি প্রবন্ধের মাধ্যমে 'সবুজপত্র'-ব দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মৌলিক চিন্তাভাবনাব সূত্রপাত ঘটেছিল ।

সমকালীন সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন ভাবনাও 'সবুজপত্র'-এর পাতায লক্ষ্য করা যায় । যেমন, বরদাচরণ গুপ্তের 'সমাজ ও সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে মনে কবেছেন । লেখকের মতে—

'সাহিত্য আলোচনার সময় আমরা ভুলে যাই যে, ও বস্তু সমাজকোষে উপ্ত এবং অঙ্কুরিত হলেও ওর ফুল এবং ফল আকাশেই ফুটে থাকে ।'

সনাতনপন্থীরা সমাজের সীমাবদ্ধতার মধ্যে সন্তুষ্ট থেকেই সমাজের তাৎক্ষণিক সমস্যাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত দেখতে চান এবং তার বিপরীত লক্ষ্য করলেই সাহিত্যের উদ্দেশ্যে লোষ্ট্র বর্ষণ কবতে উৎসাহী হয়ে পড়েন । সাহিত্যের জগতে যা স্থায়ী এবং সুস্থ, তা-ই শেষ পর্যন্ত মূল্য পায় । লেখকের মতে, মানসিক জড়তা থেকে বাঙালি মুক্ত হয়েছিল বলেই রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত সবাইকেই নতুন রূপে লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল । তাঁর মতে সাহিত্য কখনই সমাজের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে গড়ে উঠতে পারে না । রুগ্ন সমাজের দুর্বল পাকস্থলীব দিকে দৃষ্টি রেখে তার পথ্য নির্ধারণ করতে গেলে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তা স্থায়ী সাহিত্যের পদগৌরব লাভে বঞ্চিত হয় । আমাদের সাহিত্যে ধারের চেয়ে ভার বেশি হয়ে পড়েছে বলে লেখক শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন । প্রকৃতপক্ষে এ বক্তব্য শুধু লেখকের নয়, 'সবুজপত্র'-এরই বিশিষ্ট সাহিত্যাদর্শ ।

'সাহিত্যে গোঁড়ামি' প্রবন্ধটিও সমকালীন প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত । বক্ষণশীল সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গিব সীমাবদ্ধতা, বাঁধা মতের প্রতি অন্ধ আনুগত্য নবীন সাহিত্যস্রষ্টাদের ক্ষেত্রে কতখানি প্রতিবন্ধক হতে পারে, তার ইঙ্গিত এ প্রবন্ধে আছে । বরদাচরণ মুক্ত দৃষ্টিতে সমকালীন সনাতনপন্থী সমালোচকদের গোঁড়ামিব স্বরূপটি তুলে ধরেছেন এবং তার প্রভাব সম্বন্ধেও অভিমত জ্ঞাপন করেছেন । সাহিত্যে 'গোঁড়ামি'-কে লেখক বলেছেন—'ভাবরাজ্যের দাসত্ব প্রথা'। তাছাড়া সাহিত্য বিচারে ঐতিহ্যের নামে অতিরিক্ত অতীত কাতরতাও সামাজিক মনের একটি ব্যাধি । অবশ্য সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাবধারার দ্বন্দ্ব অপরিহার্য । এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই প্রকৃত সত্য আবিষ্কার সম্ভব । তবে, গোঁড়ামিকে নিষ্ঠা বলে তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকলে সেই দ্বন্দ্ব থেকে নতুন কোন পথের ইঙ্গিত লাভ সহজ নয় । এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর 'বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ' (অগ্রহায়ণ, ১৩২৪), 'দেশের কথা' (বৈশাখ, ১৩২৫) প্রভৃতি প্রবন্ধেও সমমত উচ্চারিত হয়েছে।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'সাহিত্যের জাতরক্ষা' (শ্রাবণ, ১৩২৫) প্রবন্ধটিও সমকালীন

সনাতনপন্থীদের নীতিবাদী ভাবনা-চিন্তার প্রতিবাদে লেখা। লেখকের মতে—'একটা জাতির প্রতিভা যা গড়ে তোলে, তা-ই তার জাতির সাহিত্য।'

সাহিত্যের জাত রক্ষার জন্য যারা তৎপর, তাদের উদ্বেগ এবং আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। প্রতিপক্ষের বিভিন্ন বক্তব্যকে তীক্ষ্ণ শ্লেষে বিদ্ধ করে পরিশেষে লেখক সতর্ক করে দিয়েছেন—

'বীণাপাণির বীণার তানে যাদের মন মজেছে, তারা যেন বীণাপাণির মন্দিরে প্রবেশ করেন—আপনার জীবন দেবতার সত্য ধর্ম নিয়ে, কোন অতীতকে নিয়ে নয়—তা সে অতীত যত বড়ই হোক, যত মহানই হোক, যত লোভনীয়ই হোক।'

প্রমথ চৌধুরীর 'বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্য' (কার্তিক, ১৩২২) নামক প্রবন্ধটিও সমকালীন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত আলোচনা। আধুনিক সাহিত্যের উপর যাবতীয় দোষ আরোপ করে কোনো কোনো সমালোচক উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যসৃষ্টির গুণকীর্তন করতে পঞ্চমুখ হন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী 'ইভলিউশন বিশ্বাসী', তাই আগামী দিনের নূতন সম্ভাবনার দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। প্রাবন্ধিকের মতে গত শতাব্দীর লেখকেরা দীর্ঘকালের পঠন-পাঠন ও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সু-প্রতিষ্ঠিত। ফলত নতুন করে পুরনো সাহিত্যের পুনর্বিচারের দায়িত্ব কজন নিতে পারে? বিপরীতভাবে, একালে যাঁদের খ্যাতি এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, সুবিধাবাদী সমালোচকদের জজিয়তি তাদের উপরেই। নব সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়, সেগুলি তিনি বিচার করে দেখেছেন যে, সে সাহিত্য 'অপর্যাপ্ত ও সস্তা, বিশেষত্বহীন ও প্রতিভাহীন, চুটকি ও নকল।'

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ফলে মহিলা সাহিত্যিকদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্র লোকে লোকারণ্য। সর্বোপরি, নব সাহিত্য বৈচিত্র্যহীন, এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন যে, আমাদের জীবনেই বৈচিত্র্য নেই। এছাড়া সাহিত্যচর্চার এই বিস্তৃতির প্রধান কারণ একালের বাঙালিদের আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা তীব্রতর হয়েছে।

এযুগের সাহিত্যের বিরুদ্ধে চুটকিত্বের অপবাদকে লেখক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, ছোটগল্প, খন্ড কবিতা অধিক লেখা হচ্ছে বলেই সমালোচকদের এই জাতীয় অভিযোগ। বীর রসাসৃত মহাকাব্য না লিখলে যে তা সাহিত্য হবে না, এমন কোন কথা নেই। 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর পর ইংরেজি সাহিত্যে মহাকাব্য লেখা হয়নি, ফরাসি ভাষায় আদৌ কোনো মহাকাব্য নেই। কিন্তু তার জন্য ইংরেজি বা ফরাসি সাহিত্যের গৌরব বিন্দুমাত্র কমেনি। সমালোচকেরা বলে থাকেন, যে এ যুগে অসাধারণ প্রতিভাবান সাহিত্যিক জন্মায়নি—এর জন্য চৌধুরীমহাশয় বর্তমান যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে দায়ী করেছেন। কিন্তু এরই পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এ যুগের সাহিত্যের সবথেকে বড় লাভ। এমনকি ভাষা, ছন্দ, শব্দ-গ্রন্থন প্রভৃতি দিক থেকে এ যুগের কবিরা অনেক বেশি শিল্পকৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের অজস্রতাকে উল্লেখযোগ্য বলে লেখক একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন—

'আমাদের সংকীর্ণ পরিসর বৈচিত্র্যহীন জীবন ছোটগল্প রচনারই অধিকতর অনুকূল, উপন্যাস রচনার পক্ষে এ জীবনের পরিসর অত্যন্ত সংকীর্ণ।'

লেখক উপসংহারে বাইবেল থেকে একটি সুভাষিত উদ্ধার করে বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আসাব বাণী শুনিয়েছেন—

'এ যুগে কোন অসাধারণ প্রতিভাশালী উপন্যাসকার না থাকলেও এমন অনেক গল্প লেখা হয়ে থাকে, যা গত শতাব্দীব কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকের কলম হতে বেবতো না। সুতরাং নব সাহিত্যে যদি chosen few থাকেন, তাহলে আমাদের ভগ্নোদ্দম হবার কারণ নেই।'

সব মিলিয়ে উনিশ শতকের বাংলা কথা সাহিত্যেব তুলনায় বিংশ শতাব্দীর কথা সাহিত্য যে সমৃদ্ধ হয়েছে, এ বিষয়ে প্রাবন্ধিক নিঃসন্দিগ্ধ। 'বর্তমান বঙ্গ সাহিত্য' প্রবন্ধ টিও তাই বিষয় গৌরবে যেমন মূল্যবান তেমনই গুণান্বিত। বিশেষ করে আধুনিক সাহিত্যের সমর্থনে প্রমথ চৌধুরীর এই বক্তব্য 'সবুজপত্র'-এরই সাহিত্য আন্দোলনের দ্যোতক।

'সবুজপত্র'-এর নব্যতন্ত্রী সাহিত্যের প্রতি পক্ষপাতে সমকালীন রক্ষণশীল কিছু পত্রিকা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মনে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্র সাহিত্যের বাস্তবতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে এই যুগে বিপিনচন্দ্র পাল ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় লেখনী ধারণ করেন। বিপিনচন্দ্র তাঁর 'চরিত্র-চিত্র' (চৈত্র, ১৩১৮; বঙ্গদর্শন) প্রবন্ধে কলকাতার টাউন হলে দেশবাসীর পক্ষ থেকে অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে কবিকে যে অভিনন্দন জানান হয়েছিল তার উল্লেখ করে তিনি বলেন— 'এ যোগ্যতা তাঁর অলৌকিক কবি প্রতিভার। ...বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে যাঁহারা এইকালে অভূতপূর্ব শ্রীসম্পদে বিভূষিত করিয়াছেন, বাঙ্গালীর জ্ঞান ও বাঙ্গালীর আশাকে, বাঙ্গালীর ধর্ম ও বাঙ্গালীর কর্মকে যাঁহারা ইদানিন্তনকালে নানপ্রকারে ফুটাইয়া ও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ যে তাঁদের অগ্রণীদলভুক্ত একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধতা কোথায় সে সম্পর্কেও বিপিনচন্দ্র সচেতন। যে 'অঘটন-ঘটন পটিয়সী মায়াশক্তি' কবির 'অলৌকিক কবিপ্রতিভা'র মূল আশ্রয়—সেটি কেবল তাঁর শক্তি নয়, দুর্বলতাও বটে—

'উর্ণনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার করে, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতেই অনেক সময় ভাবের রসের তন্তুসকল বাহির করিয়া অদ্ভুত কাব্য সকল রচনা করিয়াছেন।'

ফলে তাঁর কবিতা, গল্প, উপন্যাস সবই প্রধানত 'মায়িক', 'বস্তুতন্ত্র' নয়। তাই কবির 'ঐকান্তিকী আত্মমুখিনতা' থেকে যা সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু সেখানে 'সত্যের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই'। বলা বাহুল্য 'মায়িক' ও 'বস্তুতন্ত্র' শব্দ দুটি এখানে রোমান্টিক ও রিয়ালিস্টিক-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর সাময়িক বিরতি। বছর দুয়েক বাদে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ খরতর হয়ে দেখা দিল। প্রধান অভিযোগকারী অর্থনীতির তরুণ অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। তাঁর একাধিক প্রবন্ধ কে কেন্দ্র করে দুই শিবিরে বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাতে যোগ দিলেন। সেই বিতর্ক পর্বটি আলোচনার সুবিধার্থে প্রাসঙ্গিক রচনাগুলির একটি তালিকা সংকলন করা হল—

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়	—	'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	'বাস্তব', সবুজপত্র, শ্রাবণ, ১৩২১ এবং 'আমার জগৎ' সবুজপত্র, আশ্বিন, ১৩২১
রাধাকমল মুখোপাধ্যায়	—	'সাহিত্যে বাস্তবতা' সবুজপত্র, মাঘ, ১৩২১
প্রমথ চৌধুরী	—	'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি', সবুজপত্র, মাঘ, ১৩২১
রাধাকমল মুখোপাধ্যায়	—	'সাহিত্য ও স্বদেশ', সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩২২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	'কবির কৈফিয়ৎ', সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২
রাধাকমল মুখোপাধ্যায়	—	'বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একাধিক আলোচনা ('সাহিত্যের সমাজগঠন শক্তি', 'সাহিত্যের আভিজাত্য', 'উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ', 'আর্টের কর্তব্যবোধ') ।
প্রমথ চৌধুরী	—	'সাহিত্যে খেলা', সবুজপত্র, শ্রাবণ, ১৩২২

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'লোকশিক্ষক বা জননায়ক' প্রবন্ধে সোজাসুজি বলেছিলেন—রবীন্দ্রসাহিত্য 'সার্বজনীন' নয় এবং সেইজন্য সে সাহিত্য 'বাঙালির অন্তরতম প্রাণকে স্পর্শ' করতে পারেনি—

'প্রকৃত জাতি তা কয়েকজন ইংরেজী শিক্ষিত উকিল, ব্যারিষ্টার, মাষ্টার, কেরানী, সম্পাদক লইয়া নহে । বাঙ্গালী জাতিকে চিনিতে হইলে পর্ণকুটিরবাসী অশিক্ষিত কৃষক, তাঁতী, জোলা, মজুর, কামার, কুমোর, তেলী ও নাপিতের অভাব ও অভিযোগ আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানিতে হইবে । ইহাদিগের ভাব ও চিন্তাই সাহিত্যেব মূল প্রস্রবন ।'

রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিকে এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন লেখক—'রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়াছেন । তিনি দৈন্যেব মধ্যে 'বিশ্বাসের ছবি' আঁকিয়াছেন । তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীত গাহিয়াছেন । কিন্তু সে ছবি, সে সংগীত জনসাধারণকে, সমগ্র জাতিকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ।'

রাধাকমলের দৃঢ় অভিমত, এভাবে সাহিত্যকে সামাজিক দায়দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা উচিত নয় । সাহিত্যিককে 'লোকশিক্ষক'-এর পদ গ্রহণ করতে হবে । শুধু তাই নয়, তিনি হবেন সামাজিক বিপ্লবের নেতা—

'লোকশিক্ষক দেশের জনসাধারণের ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া আধুনিক সমাজ ও সাহিত্য আমূল পরিবর্তনের সূত্রপাত করিবেন । সমাজ ও সাহিত্য ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের তিনি নেতা হইবেন ।'

আক্রমণ যখন এইভাবে ঘনিয়ে এল—রবীন্দ্রনাথেব পক্ষে তখন আর নীরব শ্রোতা হয়ে থাকা সম্ভব হল না । 'বাস্তব' প্রবন্ধে তিনি প্রশ্ন করলেন—সাহিত্যের বাস্তবতা বলতে কি বোঝায় ? সে কি তার তথ্যপুঞ্জের মধ্যে নিহিত ? যদি তাই হয় তবে সাহিত্যের কাছে আমরা যে নিত্যতা আশা করি তা কেমন করে পাওয়া যাবে ?—

'রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে । মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটি উপভোগ

করিয়াছে আজও তাহা বাতিল হয় নাই। কিন্তু বস্তুর দর বাজার অনুসারে এ বেলা ও বেলা বদল হতে থাকে।'

আজ যে ঘটনা বাস্তব বলে মূল্য পাচ্ছে—কাল তো সেটা অতীত হয়ে গিয়ে অবাস্তব আখ্যা পাবে। তাই কবির ধারণা, সাহিত্যের বাস্তবতা তার বিষয়বস্তুর মধ্যে নেই, আছে রসবস্তুর মধ্যে। সাহিত্যের মূল পরিচয় যখন তার নিত্যরসে, তখন তার বাস্তবতার সন্ধানও সেখানেই করতে হবে। কিন্তু—

'রস জিনিষটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী প্রভৃতি নানাপ্রকারের ভালো ভালো লোক আছেন কিন্তু দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়ে নলের গলায় মালা দিয়াছিলেন তেমনি রসভারতী স্বয়ম্বরসভায় আর সকলেরই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।'

সাহিত্যিকরা এই বাস্তবতার সন্ধান করবেন কোথায়, রবীন্দ্রনাথের উত্তর, আত্মানুভূতির কাছে। শিল্পীর 'বেদনাময় চৈতন্য' নিখিলের সংস্রবে যা অনুভব করবে তাই তাঁর কাছে বাস্তব।

সাহিত্যিককে লোকশিক্ষকের ভূমিকা নিতে হবে এমন দাবি যারা করেন তাঁদের বোধবুদ্ধি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছেন—

'কিন্তু কালিদাস যদি কবি না হইয়া কবিহিতৈষী হইতেন তবে সেই পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কৃষাণদের জন্য হয়তো প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানা বই লিখিতেন—তাহা হইলে তারপর হইতে এতগুলো শতাব্দীর কি দশা হইত।'

কবি মনে করেন সাহিত্য থেকে আমরা যদি কোন শিক্ষা পাই তবে সেটা উপরি পাওনা। কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে তার জন্য কোনরকম মাথাব্যথা নেই। কবিরা 'ন্যায়ের অধ্যাপক' নন অথবা সাহিত্য 'ইস্কুল-মাষ্টারি' নয়।

তবে সাহিত্যের আদর্শ কি ? আনন্দময়তা। তাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক অর্থহীন। আনন্দকে তো প্রমাণ করা যায় না—সংজ্ঞা দিয়েও ধরা যায় না। সে 'অনির্বচনীয়'।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ বিরোধী শিবিরের উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে তুলল। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় কবির বক্তব্যের উত্তর দিলেন 'সাহিত্যে বাস্তবতা' প্রবন্ধে। তাঁর বক্তব্যের কয়েকটি মূল সূত্র হল—

ক. 'সাহিত্যের চরম সাধনা হইতেছে যুগধর্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা।'

খ. 'সাহিত্য বাস্তবতাকে অবলম্বন করিয়াই রস সৃষ্টি করে। রস জিনিসটার একটা আধার থাকা চাই—সেই আধারটাই হইতেছে বাস্তব'।

গ. 'সরস্বতী চরণ তলাশ্রিত সাহিত্য যুগে যুগে দেশ কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন রসে সৃষ্টি করিয়াছে'।

ঘ. 'সাহিত্য যে ইস্কুল-মাষ্টারীর ভার লইবে, সমাজেরও দীক্ষাগুরু হইবে—ইহা ঠাট্টা বা বিদ্রূপের বিষয় নহে। সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য, সাহিত্যের চরম সার্থকতা—যদি সে সমাজের গুরুর স্থান অধিকার করিতে পারে'।

বার্ণার্ড শর নাটককে তিনি এই সাহিত্যিক গুরুগিরির আদর্শ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। রাধাকমলবাবুর বক্তব্যের বিরোধিতা করে প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করলেন । রাধাকমলবাবুকে তির্যক কটাক্ষ করে তিনি বললেন—

'রাধাকমলবাবু অবশ্য 'যদ্-দৃষ্টং তল্লিখিতং' অর্থে ও-বাক্য ব্যবহার করেন না, যে কবির হাতে বাংলার মাটি এবং বাংলার জল পরিচ্ছন্ন মূর্তিলাভ করেছে, তাঁর কাব্যে যে পূর্বোক্ত হিসেবে বস্তুতন্ত্রতা নেই একথা কোন সমালোচক সজ্ঞানে বলতে পারেন না ।'

প্রাবন্ধিক বস্তুতন্ত্রতাকে ইংরেজি 'রিয়ালিজম' শব্দটির তর্জমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে 'রিয়ালিজম' শব্দটি 'আইডিয়ালিজম' শব্দের বিপরীত নয় । রোমান্টিক সাহিত্যে প্রতিক্রিয়া হিসেবেই যে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের উদ্ভব হয়, ফরাসী সাহিত্যে সুপন্ডিত প্রমথ চৌধুরী উক্ত সাহিত্য থেকে উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে পূর্ণতা দিয়েছেন । সর্বোপরি, প্রাবন্ধিকের মূল বক্তব্য—সাহিত্যে এই দুইয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য—

'রিয়ালিজমের পুতুলনাচ এবং আইডিয়ালিজমের ছায়াছবি উভয়ই কাব্যে অগ্রাহ্য । কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ এবং যেহেতু জীবে চিৎ এবং জড় মিলিত হযেছে, সে কারণে যা হয় বস্তুহীন নয় ভাবহীন, তা কাব্য নয় । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রেই একাধারে রিয়ালিস্ট এবং আইডিয়ালিস্ট ।'

রবীন্দ্রনাথের মতো প্রমথ চৌধুরীও এ বিষয়ে নিঃসংশয় যে—

'কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি । সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা ।' (সাহিত্যে খেলা, শ্রাবণ, ১৩২২)

রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'কবির কৈফিয়ৎ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২) প্রবন্ধে বলেছেন—

'যাহা কিছু সমস্তই পরিপূর্ণ আনন্দের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে রাস্তার ধূলার উপরে মুখ থুবড়াইয়া মরিবার দিকে নহে ।'

বস্তুতপক্ষে, 'সবুজপত্র'র বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, উদ্ধৃত প্রবন্ধ সমূহে 'সবুজপত্র'-এর প্রধান দুই কর্ণধার অত্যন্ত শোভনতা ও সৌজন্য বজায় রেখে বিরুদ্ধবাদীদের কথার জবাব দিয়েছেন । 'সবুজপত্র'-এর যে ক্ষুরধার সবুজ প্রাণশক্তি, তা যথার্থই উদ্ধৃত অংশেও বিরাজমান । 'সবুজপত্র'-এর এই প্রগতিশীল আন্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে শ্রদ্ধেয় সমালোচক লিখেছেন—

> ইতিহাসের তরফে এ-সব ঘটনাব অবশ্য-স্মরণীয়তা এ-কারণে, এইসব সংঘবদ্ধ রবীন্দ্র-বিরোধ এবং তার প্রতিক্রিয়া সম্ভব বরণ-চেষ্টায় প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য-ভাবনার বিষয়-চিন্তা, প্রকরণকৌশল এবং শিল্পসম্মত অনুভাবনায় রক্ষণশীলতাকে ছাপিয়ে উজ্জ্বল প্রগতি চেতনার বিকাশ ঘটেছিল ।[১৩]

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে সঙ্গীত সমালোচনার প্রসারতাও 'সবুজপত্র'-র পৃষ্ঠাতেই শুরু হয়েছিল । বিশেষ করে 'সবুজপত্র'-এর অন্তত দুটি সংখ্যাকে (১৩২৩ : আশ্বিন-কার্তিক এবং পৌষ সংখ্যা) সঙ্গীতের বিশেষ সংখ্যা বলা যায় । আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় অমরবন্ধু গুহর 'বাংলার

গান' ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাগ ও মেলেডি' প্রবন্ধ দুটি ছাড়াও 'হিন্দু সংগীত' নামে প্রমথ চৌধুরীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পৌষ সংখ্যায় বীরবলের 'সুরেব কথা' ও ইন্দিবা দেবীচৌধুরাণীর 'সঙ্গীত পরিচয়' প্রকাশিত হয়। 'হিন্দু সঙ্গীত' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী হিন্দু সঙ্গীতের স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি হিন্দু সঙ্গীতের উৎস সন্ধানে 'মার্গ সঙ্গীত'-এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বর্তমানকালে মার্গ সঙ্গীত সম্পর্কে অনাদরের কাবণগুলিও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

'সুরের কথা' প্রবন্ধে সুরের তত্ত্ব প্রসঙ্গে দেশি ও বিলিতি সঙ্গীতের ভেদাভেদ নির্ণয় করা হয়েছে। শব্দ থেকে সুরের, কি সুর থেকে শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, এ সম্পর্কে শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শনের মতামত কি তিনি দেখিয়েছেন। সঙ্গীতের তত্ত্বগত আলোচনার মধ্যে প্রাবন্ধিকের বহু শাখায়িত অধ্যয়নশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। যে কালে বাংলা সাহিত্যে সঙ্গীত সমালোচনা বলে কোনো বিভাগ গড়ে ওঠেনি, সে যুগে প্রাচীন সঙ্গীত, শাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে বিলিতি সঙ্গীত প্রসঙ্গে সরস ও প্রসাদগুণ সমন্বিত এমন প্রবন্ধের সবিশেষ মূল্য অবশ্য স্বীকার্য।

নতুন যুগের বাণীকে নানাদিক দিয়ে আবিষ্কারের যে প্রয়াস 'সবুজপত্র' গ্রহণ করে, তার মধ্যে পুস্তক পর্যালোচনা বিভাগটি অন্যতম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত একটি পত্রে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন—

> তাছাড়া আধুনিক সাহিত্যের মাঝিগিরি করতে হলে সমালোচকেব হাল ধরা চাই। ...বিরুদ্ধ কথাও যথোচিত শিষ্টতা রক্ষা করে কিভাবে বলা উচিত, তার একটি আদর্শ দেখাবার সময় এসেছে।[১৪]

তাই আধুনিক সাহিত্যের মাঝিগিরির দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে 'সবুজপত্র' দেশ-বিদেশের বহু গ্রন্থের আলোচনা করে বাঙালি পাঠককে মধ্যযুগের গুটি কেটে আধুনিক বিশ্বের নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সমালোচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'—সমালোচক অরুণচন্দ্র সেন (মাঘ, ১৩২৩);উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা'—সমালোচক ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী (আশ্বিন, ১৩২৮);আঁন্দ্রে জিদের 'লেখকের প্রার্থনা'—সমালোচক ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী (কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩২৮); বারীন্দ্রকুমার ঘোষের 'দ্বীপান্তরের বাণী'—সমালোচক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (শ্রাবণ, ১৩২৭) ইত্যাদি। এছাড়াও স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী কার্তিকচন্দ্র ঘোষেব 'ওমর খৈয়াম', পরশুরামের 'গড্ডালিকা', সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'নব রূপকথা', দিলীপকুমার রায়ের 'ভ্রাম্যমানের দিন', ইন্দুভূষণ মজুমদারের 'মার্কিন যাত্রা' প্রভৃতি গ্রন্থের সমালোচনা করেন। বাংলার সমালোচনা সাহিত্যের দৈন্যকে দূরীভূত করে আদর্শ সাহিত্য বিচারেব মানদন্ড নির্ধারনের প্রয়াসও এর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ইন্দিরা দেবীর সমালোচ্য 'নির্বাসিতের আত্মকথা' গ্রন্থটির অভিনবত্ব। কারাবাসের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এমন নিখুঁত এবং প্রাঞ্জলভাবে কোনো রাজনৈতিক কর্মী ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ করেননি। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু, রচনানীতি, সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব

নির্ণয় করার প্রথম কৃতিত্ব ইন্দিরা দেবীর। প্রকৃতপক্ষে বাঙালি পাঠকেব কাছে দ্বীপান্তরেব এই গুপ্তকথা গ্রহান্তরের কথার মতোই প্রথম আকৃষ্ট করেছিল। 'সবুজপত্র' এইভাবে নূতনের বার্তাকে বিভিন্ন অঙ্গন থেকে বাঙালি পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল।

দেশ ও তার সীমানাকে ছাড়িয়ে বিশ্বসাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালির মনের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া তথা যাবতীয় গোঁড়া রক্ষণশীলতার প্রাচীর ভেঙে আধুনিকতার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দেশ ও সাহিত্যকে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার যে আন্দোলন 'সবুজপত্র' করেছিল, তার নিদর্শন পাই প্রমথ চৌধুরীর 'ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩) ও 'ফরাসী সাহিত্য' (১৩৩৪), ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর 'সাহিত্যচর্চা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬), সতীশচন্দ্র ঘটকের 'ফরাসী ও জার্মান' (আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩২৩), রবীন্দ্রনাথের 'জাপান যাত্রীর পত্র' (বৈশাখ-অগ্রহায়ণ, ১৩২৩), নীরেন্দ্রনাথ রায়ের 'গ্রীসে ভাষার লড়াই' (মাঘ, ১৩২৪) প্রভৃতি প্রবন্ধে।

ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে 'সবুজপত্র' বাঙালি পাঠককে উৎসাহী করে তুলতে চেয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, ফরাসী সাহিত্যে যেটা সবচেয়ে বড় গুণ—সেই প্রাঞ্জলতা, যা ছিল একান্তই 'সবুজপত্র'-এর অন্যতম চরিত্রবৈশিষ্ট্য, তাতেই বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন সবুজপত্র-গোষ্ঠী। সবুজপত্র-গোষ্ঠীতে ফরাসি সাহিত্য রসবোদ্ধা সদস্যের সংখ্যা কম ছিল না। নয়শো বছর ধরে ফরাসী জাতি যে অবিরাম সাহিত্যসৃষ্টি করে আসছে, তার আদ্যোপান্ত পরিচয় নেবার প্রয়াসী ছিলেন সবুজপত্রীরা। 'ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যকে সূত্রাকারে গ্রথিত করলে মোটামুটি নিম্নলিখিত রূপ দাঁড়ায়—

ক. 'ফবাসী জাতি চিন্তারাজ্যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়নি, অকিঞ্চিৎকর বলেও উপেক্ষা করেনি; সুতরাং ফরাসী সাহিত্যের ভিতর সায়েন্স ও আর্টের একত্র সাক্ষাৎ লাভ করা যায়।'

খ. 'ফরাসী লেখকেরা বাক্‌যুদ্ধেও সভ্যতার আইনকানুন মেনে চলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁরা ধর্মযুদ্ধের পক্ষপাতী। ফরাসী জাতি হাসতে জানে, তাই তারা কথায কথায় ক্রোধান্ধ হযে ওঠে না। তীক্ষ্ণ হাসির যে কি মর্মভেদী শক্তি আছে, এ সন্ধান যারা জানে, তাদের পক্ষে কটুবাক্য প্রয়োগ করা অনাবশ্যক।'

গ. 'ফরাসী সাহিত্য এই অর্থে স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা বা অস্পষ্টতার লেশমাত্র নেই। ...জার্মান পন্ডিতেরা অসাধারণ পরিশ্রম করে যা প্রস্তুত করেন, তা অধিকাংশ সময় বিদ্যার গ্যাস বই আর কিছুই নয়। অপরপক্ষে, ফবাসী পন্ডিতেরা মানবজাতির সুম্মুখে যা ধরে দেন, সে হচ্ছে গ্যাসের আলো।'

প্রসঙ্গত, তিনি মার্কিন নভেলিস্ট Henry Jamon-এর উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন—

'ফরাসী মনের চোখ চিরদিন আলোর দিকে চেয়ে রয়েছে। ...এই আলোকপ্রিয়তার ফলে সে সাহিত্য অপূর্ব স্বচ্ছতা, অপূর্ব উজ্জ্বলতা লাভ করেছে।'

মূল কথা, ফরাসি ভাষার প্রধান গুণ যে স্পষ্টতা বা জড়ত্বহীনতা, তাকেই সাদরে বাংলা সাহিত্যে আমন্ত্রণ করে আনতে চেয়েছিলেন সবুজপত্র-গোষ্ঠী।

'ফরাসী সাহিত্য' প্রবন্ধ টি ভারত-রোমক সমিতির অধিবেশনে পঠিত। আলোচ্য প্রবন্ধে ও প্রমথ চৌধুরী ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার প্রতি উৎসাহদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রমথ চৌধুরী চান ফরাসি গদ্যের মতো বাংলা গদ্যও লঘু হোক, তাতে তার ক্ষিপ্রতা ও তীক্ষ্নতা বৃদ্ধি পাবে। ফরাসি গদ্যে যে ভাষার স্বচ্ছতা, তা আসলে লেখকের মনের স্বচ্ছতারই প্রকাশ। সংযত চিন্তা এবং সুনিবদ্ধ বাক্রীতির যে অভাব বাংলা গদ্য সাহিত্যে নিত্য দেখা যায়, তা থেকে বাংলা গদ্য লেখকদের মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ফরাসি গদ্য সাহিত্য সম্পর্কে সচেতন হলে বাঙলা গদ্য অবলীলায় অগ্রসর হতে পারবে। তাছাড়া বাঙালি মনেব জড়ত্ব মোচনেব জন্য ফবাসি সাহিত্যের চর্চা একান্ত আবশ্যক। আসলে, ফরাসি ভাষা সাহিত্য আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল—

'আমি চাই যে আমাদের শিক্ষিত সমাজে ফরাসী সাহিত্যের সম্যক চর্চা হয়। আমরা বিশ্বাস সে চর্চার ফলে আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে।' (ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়)

'সবুজপত্র' অ-ইংরেজি বিদেশি সাহিত্য ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থের আলোচনাকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। ফরাসি গ্রন্থের অনুবাদের মাধ্যমে বাঙালি পাঠকের মনের পরিধি বিস্তৃত করায় 'সবুজপত্র' একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল সেদিন। যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর 'সাহিত্যচর্চা' প্রবন্ধ টি ফরাসি সাহিত্য-সংক্রান্ত আলোচনা। ফরাসি সাহিত্য বিষয়ক নিবন্ধ টি G. Lanson-এর গ্রন্থ থেকে অনুবাদ। ফরাসি জাতির মনন সাধনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণমূলক এই গ্রন্থ নির্বাচনে নির্বাচকমন্ডলীর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য কার্যকর ছিল—বাঙালির জীবনে নতুন তরঙ্গ আনা, বাংলা ভাষার প্রবহমানতকে গতি দানের উপলক্ষ্যে এ জাতীয় গ্রন্থের পর্যালোচনা। এছাড়া আঁন্দ্রে জিদের লেখা ফরাসি 'গীতাঞ্জলী'র ভূমিকাটি বাংলা অনুবাদ করার মূলেও একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাবে। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতীয় কবির কাব্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষের মনোভাব এই লেখার মধ্যে প্রকাশিত। তাছাড়া সমকালীন একশ্রেণীর রবীন্দ্র-দূষণে উৎসাহী বাঙালির মনেও এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা অনুবাদিকার মনে হয়েছিল। বিদেশি সমালোচকের মূল্যায়নটির আলোকে আমাদের একশ্রেণীর স্থূলদর্শী সমালোচকের মনে রবীন্দ্রকাব্যটিব বস-সৌন্দর্য উপলব্ধিব সহায়তা করা এ লেখার একটা উপলক্ষ্য ছিল।

'লেখকের প্রার্থনা' অনুবাদটিতে সমকালীন ইউরোপের চিন্তাবিদ্‌দের যুদ্ধ-সম্পর্কিত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। বাঙালির চিন্তা রাজ্যের পরিধিকে বিস্তৃত করাই ছিল এ জাতীয় রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

জার্মান সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও 'সবুজপত্র' পাঠক সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছিল। দিলীপকুমার রায়ের 'জার্মানী সম্বন্ধে দু-চারটে সাধারণ কথা'তে জার্মান জাতির সমাজ ও সভ্যতার উপব আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়েব কৌতূহলকে জাগ্রত করাই ছিল প্রবন্ধ টির উদ্দেশ্য। সতীশচন্দ্র ঘটকের প্রবন্ধ 'ফরাসী ও জার্মান', ফরাসি দার্শনিক Boutmoux-এর 'Philosophy and War' গ্রন্থের একটি অধ্যায়কে অবলম্বন করে রচিত। জার্মানির উগ্র জাতীয়তাবাদ

প্রধান বিষয় হলেও তাদের সামাজিক মন ও ভাষা-সাহিত্য প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়েছে। নীরেন্দ্রনাথ রায় (চৌধুরী) তাঁর 'গ্রীসে ভাষার লড়াই' প্রবন্ধ টিতে গ্রিসেব ভাষার বিবর্তনের কথা, আধুনিক গ্রিক ভাষার সঙ্গে প্রাচীন ভাষার পার্থক্য আলোচনা করেছেন। আমাদের সাধু বনাম চলিত ভাষার যে দ্বন্দ্ব, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধ টি রচিত। রবীন্দ্রনাথের 'জাপানযাত্রীর পথ', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'পেনাঙের পথে' কিংবা প্রমথ চৌধুরীর 'অনুহিন্দুস্থান' (বৈশাখ, ১৩৩৪) — এসব রচনায় জাপানের সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় বর্ণিত।

'সবুজপত্র'-এ বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদও যথেষ্ট প্রকাশিত হত। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় কিরণশঙ্কর রায়ের 'কুঁজ্যার ভবিষ্যৎ' (আষাঢ়, ১৩২৮) গল্পটি। এটি George Duhamel-এর 'Civilization'-এর আংশিক অনুবাদ। ফরাসি সাহিত্যের এই প্রতিষ্ঠিত লেখক যুদ্ধের ভয়াবহতার পরিণামকেই গভীর সমবেদনায় প্রকাশ করেছেন। এসব সাধারণ মানুষ ক্ষেতখামার ছেড়ে, কলকারখানার কাজ ছেড়ে এই যুদ্ধে সামিল হয়েছে বাধ্য হয়ে, তাদের মনের কথাই প্রশ্নবোধক চিহ্নে প্রধান হয়ে উঠেছে। অনুবাদকের কৃতিত্ব হল, বাঙালি পাঠকের কাছে যুদ্ধের এই বেদনাময় অভিজ্ঞতার পরোক্ষ পরিচয় তুলে ধরা। এই গল্পে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত একটি মানুষের করুণ ও যন্ত্রণাদায়ক ছবিকে আমাদের সামনে মেলে দিয়ে তার মূলে যুদ্ধবাজদের নিষ্ঠুরতার দিকটিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এই সার্বজনীন আবেদনটির জন্য যুদ্ধ-বিরোধী এই গল্পটি লেখক নির্বাচন করেছেন।

'স্বপ্নহার' (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৩) গল্পটিও Richard Milton-এর 'Children of the Moon' অবলম্বনে রচিত। পরিচিত জগতের বাইরে অধরা মাধুরীর আকর্ষণ মানুষের চিরন্তন। গল্পের প্রধান চরিত্রটির মতো পাঠকও চলে যায় এক স্বপ্নের জগতে। দুটি বালক ও বালিকার স্বপ্নের জগতে আবির্ভাব ঘটল এক আগন্তুকের, যাঁর লম্বা চুল, কাঁধে ঝুলি এবং সেই ঝুলিতে আছে স্বপ্ন। কৌতুহলী বালক-বালিকা দুটি দেখতে যায় আগন্তুকেব ঝুলিতে লুকোনো স্বপ্নগুলিকে। কিন্তু সে স্বপ্ন তো বাইরে এনে দেখানো সম্ভব নয়। কারণ— যারা বৈষয়িক মানুষ, জীবনটাকে বিষয়সুখে কাটাতে চায়, তাদের কাছে এ স্বপ্ন অর্থহীন, এই স্বপ্ন তারা চোখে দেখতে পায় না।

Richard Milton-এর আরেকটি গল্প 'Poet's Allegory' অবলম্বনে কিরণশঙ্কর লেখেন 'কবির বিদায়' (ভাদ্র, ১৩২৩) গল্পটি। এটি মূলত ভাবানুবাদ। কবির গান মানুষের নিত্যদিনের সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে না। কবি মনের আনন্দেই গান করেন। কাজের মানুষের সঙ্গে কবির মনের সংঘাত। কিন্তু কিছু সরল প্রাণ শিশুরা ছাড়া কবির মনের কথা কেউ বুঝতে চায় না। স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু কী আছে তার গানে, কোন সাংসারিক প্রয়োজন তার গান মেটাতে পারে?

ফরাসি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার মঁপাসার গল্পগুলি ননীমাধব চৌধুরী মূল ফরাসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। 'মাঘের প্রতিশোধ' (ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২৭), 'আমার খুড়ো' (আষাঢ়, ১৩২৮), 'জুলি রোমেন' (চৈত্র, ১৩২৮ ও বৈশাখ, ১৩২৯) প্রভৃতি গল্প এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। 'সবুজপত্র'-এ মঁপাসার এই গল্পগুলির অনুবাদের মাধ্যমে বাঙালি পাঠককে

বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলাই ছিল সবুজপত্রীদের উদ্দেশ্য। অ্যাঁরি বারবুস-এর রচিত গল্পের অনুবাদ করেন ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী 'অদৃষ্ট' (অগ্রহায়ণ, ১৩২৬) নামে। গল্পের মূল বক্তব্য, মানুষ পুরুষকারের বলে নিজের মন্দ করতে চাইলেও দৈবের কৃপায় তার ভাল হয়। এই গল্পের উপসংহারের সূত্র ধরেই প্রমথ চৌধুরী 'অদৃষ্ট' (অগ্রহায়ণ, ১৩২৬) নামে একটি মৌলিক গল্প রচনা করেন। এই গল্পে সমকালীন বাংলাদেশের রক্ষণশীলদের মানসিকতার প্রতিফলন অনুভব করা যায়। সমকালীন সনাতন পন্থীদের প্রগতিবিরোধী কার্যকলাপ প্রমথ চৌধুরীকে বিষণ্ণ করেছিল। তাই অ্যাঁরি বারবুসের গল্পের উপসংহারের সম্পূর্ণ বিপরীত উপসংহার এই গল্পের আবিষ্কার করা যায়। এই দেশে পুরুষকারের বলে মানুষ নিজের ভাল করতে চাইলেও দৈবের গুণে তার ফল হয় মন্দ। —আলোচ্য গল্পে গল্পকার তাই তুলে ধরেছেন।

'সবুজপত্র'-এর বিদেশি সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে সুধী সমালোচকের মন্তব্যটি স্মরণীয়—

> দেশ ও তার সীমানাকে ছাড়িয়ে বিশ্বসাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালীর মনের যোগ সাধনে 'সবুজপত্রে'র একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল আমরা জানি। এবং এই উদ্দেশ্য তার সাফল্যও কম ছিল না। ইংরেজী সাহিত্য সংস্কৃত বিষযক গ্রন্থের বাইরে ফরাসী, জার্মান, গ্রীস প্রভৃতি ভাষায় রচিত মূল্যবান গ্রন্থগুলির সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় সাধনে 'সবুজপত্র' অসামান্য কাজ করেছিল, যার উত্তরাধিকার বহন করছে 'পরিচয়', 'কবিতা' প্রভৃতি পববর্তীকালের বিশিষ্ট পত্রিকাগুলি।[১৫]

'সবুজপত্র' কেবল রস-সাহিত্য চর্চায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্যাগুলি সম্পর্কেও আলোকপাত করতে উদ্যোগী হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটিগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রায়ত চিন্তার ভিত্তি ছিল প্রজাকে অর্থনৈতিক, সামাজিক শোষণ থেকে মুক্তি দান। 'সবুজপত্র'-র সভ্যরাও সমাজের বৃহত্তর অংশ কৃষিজীবিদের সমস্যাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। এই প্রসঙ্গেই অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'রায়তের কথা', 'বৈশ্য' প্রবন্ধ গুলি উল্লেখ করা যায়।

অতুলচন্দ্রের 'রায়তের কথা' প্রবন্ধ টি প্রমথ চৌধুরীর ঐ নামেরই একটি পুস্তিকার উপর ভিত্তি করে লেখা। অতুলচন্দ্র এ ব্যাপারে রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ যাঁরা অগ্রপথিক, তাঁদের প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অতুলচন্দ্র তাঁর নিবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য কেবল বিশ্লেষণ করেননি, তত্ত্বগত ও তথ্যগত আলোচনার সঙ্গে তার সাহিত্য-মূল্যও অনুধাবন করতে চেয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভ কাল থেকেই যে কৃষক সমাজের অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে, একথা যাঁরা স্বীকার করতে চান না তাঁদের প্রতি প্রমথ চৌধুরী তীব্র কটাক্ষপাত করেছেন। এই দিকটিতে অতুলচন্দ্র বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন। আমাদের দেশের ভূমি-ব্যবস্থা, ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করে বাংলার রায়ত সমাজকে তাদের দুর্দশা মোচনের জন্য কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমত, চলতি আইনে রায়তীজোতে রায়তের যে স্বত্ব আছে তাকে বাড়াবার জন্য ঐ আইনের কতকাংশ পরিবর্তন ঘটান; দ্বিতীয়ত, রায়তের উপর যে সব বেআইনি দাবি ও জুলুম যা এখনও বর্তমান তা বন্ধ করা। তৃতীয়ত, নিজের স্বার্থ রক্ষার এবং ফসলের ব্যবস্থাব জন্য দেশের নানা

জায়গায় রায়তের সমিতি গঠন করা।

'বৈশ্য' (শ্রাবণ, ১৩২৭) প্রবন্ধ টিতে ধনতন্ত্রের স্বরূপ, তার প্রভাব এবং সর্বব্যাপী তার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন উদাহরণ সহযোগে বিশ্লেষণ করেছেন। ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ সমগ্র বিশ্বে তার জাল বিস্তার করে তার আধিপত্য বজায় রাখতে চায়। প্রাবন্ধিকের সুচিন্তিত অভিমত—

'বিংশ শতাব্দীতে বৈশ্যের অবশ্য কোনও ধর্মশাস্ত্রের বালাই নেই, সভ্যতার বাঁধনকেও সে কাটিয়ে উঠেছে। কেননা বৈশ্য আজ সভ্যতার মাথায় চড়ে ব্রাহ্মণকে ডেকে বলছে তোমার কাজ হল আমার কারখানায় কলকব্জা গড়া, কাঁচামালকে কেমন করে সস্তার সহজে তৈরী করা যায় তার ফন্দি বাতলানো।'

তিনি এই বৈশ্য ব্যবস্থার মূল ভিত্তিটি নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। যন্ত্রবিজ্ঞানের বিপুল উন্নতির ফলে জীবনের ভোগ্য সামগ্রীর প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যার ফলে কলকারখানা বসছে ও পুঁজিবাদীরা বৃহৎ শিল্পের প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়েছে। এইভাবে শিল্প কারখানা গড়ে ওঠায় যেমন অনেক লোকের অর্থের সংস্থান হয়েছে, তেমনি জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এইজন্যই শিল্পজাত দ্রব্যের যোগনে মন্দা হওয়া চলবে না। ধনতন্ত্রের রূপ ও তার আগ্রাসী চরিত্র সম্পর্কে অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতির বিষয়টিও অত্যন্ত সতর্কভাবে বিচার করে বলেছেন যে মৃত্তিকার মানুষগুলিকে যাঁরা কলকারখানায় জুড়ে দিতে চান তাঁদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। কারণ কৃষিভিত্তিক ভারতীয় সমাজের উন্নতি কলকারখানার সংখ্যা বাড়িয়ে সম্ভ ব নয়।

ভারতের বৈশ্যতন্ত্রের সঙ্গে ইউরোপের বৈশ্যতন্ত্রের পার্থক্যটুকু লেখক চিহ্নিত করে বলেছেন—

'ইউরোপের বৈশ্যত্ব পৃথিবীই লুঠ করুক আর দেশের মাথায় চড়ে বসুক দেশকে ঠিকই অন্ন যোগাচ্ছে। আজকের ইউরোপের ধনসৃষ্টির সে যে মূল উৎস তাতে সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু মাড়োয়ারীগিরি ধনসৃষ্টির পথ দিয়েই হাঁটে না। ব্যবসাবাণিজ্যের এই উত্তমাঙ্গটি তার নেই, তার কাজ হল বিদেশে তৈরি জিনিস চড়াদামে দেশের মধ্যে চালানো, আর দেশের উৎপন্ন ধন সস্তা দরে বিদেশের হাতে তুলে দেওয়া।'

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের এই মূল্যায়ণ আজকের দিনেও সমান সত্য। যে দেশপ্রীতি, জাতীয়তা কাম্য, তার অভাবই এই ধরণের মনোভাবের কারণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বলা যায়, বাঙালির পক্ষে মাড়োয়ারি হয়ে যাওয়াটা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাম্য হলেও লেখকের অভিপ্রেত নয়। বাংলার মাটিতে ইউরোপের বৈশ্যত্ব যথার্থভাবে ফলেনি তার কারণ হিসেবে অতুলচন্দ্র মনে করেন বাঙালি ইউরোপকে পেয়েছে তার সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। সমগ্র প্রবন্ধ টিকে তত্ত্ব বা তথ্য ভারাক্রান্ত না করে মূল বিষয়টি লিপিকুশলতার সাহায্যে পাঠকের মনের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

'গণেশ' প্রবন্ধ টিতে (কার্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩) সমকালীন বাংলা তথা ভারতীয় রাজনীতির মৌল চরিত্র ইঙ্গিতে উপমায় বলার প্রয়াস লক্ষণীয়। 'গণেশ' অর্থাৎ গণদেবতাকে

সন্তুষ্ট করতে খুব বেশি আরাধনা করতে হয় না। তাঁর মতে পুরাণে গণেশের যে ইমেজ ছিল আজকের সমাজেও তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। সব সমাজের কর্তারাই জনসঙঘকে 'লম্বোদর গজানন' বলেই জেনে এসেছেন। জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর বুদ্ধিমান রাজনৈতিক মানুষের শ্রদ্ধা কোনোকালেই থাকে না। প্রাবন্ধিকের মতে—

'গণদেবতাকে যারা হিতকামী তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে এই দেবতাটির মাথার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের তড়িৎ সঞ্চালন করা।'

গণদেবতাকে সুশিক্ষিত করতে পারলে তার শক্তি যে কি বিপুল তা সহজেই অনুমেয় কিন্তু এই জনগণ অশিক্ষিত থাকলে কেবলমাত্র পরামর্শদাতার ক্রীড়নক হয়ে চলতে হয়, তাতে সমাজেরই ক্ষতি। কিন্তু জনসাধারণকে সুশিক্ষিত করার কাজ যেমন কঠিন তেমনি সে কাজে অগ্রণী হবার লোকেরও অভাব। কিন্তু জনসাধারণের চোখে জ্ঞানের আলো আনা প্রয়োজন—'যাতে সে মানুষের সভ্যতার যা সব অমূল্য সৃষ্টি—তার জ্ঞানবিজ্ঞান, তার কাব্যকলা—তার মূল্য জানতে পারবে।' লেখক আশা প্রকাশ করে বলেছেন—

'গণদেবতা যেদিন নরদেহ নিয়ে আসবে সেদিন তার বিজয় যাত্রার পথ কেউ রুখতে পারবে না।' এইভাবে 'সবুজপত্র' রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রেও প্রগতিশীল ভাবনাকে সরবে ঘোষণা করেছিল, তার সমকালে এই ধরনের ভাবনা নজিরবিহীন।

'সবুজপত্র'-এর পৃষ্ঠায় বিজ্ঞান বিষয়ক বিবিধ নিবন্ধ প্রকাশিত হত — যার মধ্যে অন্যতম সতীশচন্দ্র ঘটক ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'গাছ' (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩২৭, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৩-৩৪, ফাল্গুন ১৩৩৩, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৩৪) শীর্ষক রচনাটি। গাছের উৎপত্তি, তার বিকাশ, তার নানা উপাদান, তার আচরণ, দেহ গঠন প্রকৃতি কিভাবে হয় তার সাবলীল বর্ণনা করেছেন প্রাবন্ধিক। গাছের বৃদ্ধির স্বরূপ, তার আত্মরক্ষার পদ্ধতি, বংশবৃদ্ধির কৌশল গল্পের মতো স্বচ্ছন্দভাবে বর্ণনা করেছেন।

গাছের সমস্ত শরীরের কাজ, গাছের বীজ ও তার শাঁসের সম্পর্ক, কেন এ শাঁসের জন্য বীজের কঠিন আবরণ, বীজের আকৃতি ও তার গঠন, তার জন্য কি কি বিষয় নির্ভরশীল, তা সহজ ও সরসভাবে লেখক বলেছেন। শিকড় কিভাবে মাটিতে ঢোকে, শিকড়ের রকমভেদে তাদের গতিপ্রকৃতি, কোন ধরণের শিকড় মাটির রস কিভাবে টানে, সেসব কথা অনায়াসে প্রকাশ করেছেন। বিষয়ের ওপর সুগভীর অনুরাগ এবং বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান নিবিড় না হলে এত অল্প কথায় এত সবালীলভাবে বলা দুঃসাধ্য। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের জটিল রহস্যকে প্রাঞ্জলভাবে সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার এই প্রচেষ্ট' অবশ্যই প্রশংসনীয়। তাঁর রচনারীতির উজ্জ্বলতা, প্রসাদগুণ সম্পর্কে অবহিত হতে হলে রচনার কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধারযোগ্য—

'ঘুমন্ত কুঁড়িরা যে একেবারেই জাগে না, তা নয়—দরকার হলে জাগে। অনেক সময় দেখা যায় একটা ঘুণ ধরা সজনে গাছ ঘাড় মোড় ভেঙে দুড়মুড় করে পড়ে গেল, কি একটা তেঁতুল গাছের ডালপালা সব বাজ পড়ে জ্বলে গেল। গাছটার ন্যাড়া গুঁড়ি অনেকদিন ধরে মড়ার মতো পড়ে রইল, তারপর একদিন দেখা গেল সেই মড়া গুঁড়ির গা থেকেই কচি কচি ডালপালা

তড়বড়িয়ে ফুটে বেরচ্ছে—যেন সেকালের কোন মুনি ঋষি এসে একটুখানি জলের ছিটে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। এ আর কিছুই নয়, যে ঘুমন্ত কুঁড়িগুলো এতদিন ধরে পড়ে ঘুমোচ্ছিল—গাছটা মরে যায় দেখে তারা গা ছাড়া দিয়ে উঠেছে।'

কোন কুঁড়ি ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জেগে ওঠে কিভাবে, সেই কথাটি সহজভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝাতে গিয়ে লেখক রূপকথার গল্পের বাচনভঙ্গি অবলম্বন করেছেন। শব্দচয়নে, বাক্যগঠনে কোথাও কোন হোঁচট খাননি লেখক—কথনরীতির এই ভঙ্গিতেই পাঠকের মনের কাছাকাছি আনতে পেরেছেন বিষয়টিকে। 'সবুজপত্র'-এর সাহিত্য-আন্দোলনের এটিও তো অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যে সহজ, প্রাঞ্জল ভাষায় বিষয়কে পাঠকের মনোগ্রাহী করে তোলা। সর্বোপরি, দেশ বিদেশের বিচিত্র ধরনের উদ্ভিদ, যার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, সুমাত্রা, বোর্ণিও, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের বিচিত্র ও অদ্ভুত ধরনের বৃক্ষের বৈশিষ্ট্যকে চিত্তাকর্ষকরূপে প্রকাশ করেছেন লেখক। মাডাস্কাসের মানুষখেকো গাছের বর্ণনাতে রূপকথার বাচনভঙ্গী বর্তমান শ্রম ও শক্তি যথাসাধ্য নিয়োগ করেই এই ধরনের অসামান্য প্রবন্ধ রচনা সম্ভব।

গুরুগম্ভীর বিজ্ঞান নিবন্ধের পাশাপাশি সহজ সরল হালকা চালের প্রবন্ধ ও 'সবুজপত্র'-এর পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করা যায়। যার মধ্যে অন্যতম প্রধান, সতীশচন্দ্র ঘটকের 'হাসি' (কার্তিক, ১৩২৯) প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটিতে হাস্যরসের শ্রেণীবিচার করা হয়েছে। 'সবুজপত্র'-এর মূল আন্দোলন—যুক্তিবোধের প্রতিষ্ঠা, আবেগের চেয়ে বুদ্ধির প্রাধান্য দান এবং দার্শনিক গাম্ভীর্য অপেক্ষা জীবনরস-রসিকতার প্রতি গুরুত্ব দান; এই নিবন্ধের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। শ্লেষাত্মক মন্তব্যগুলিকে লেখক গাম্ভীর্যের আবরণে প্রকাশ করেছেন, কারণ—হাসির উৎস মস্তিষ্ক, হাসিই জীবনের লক্ষণ, যৌবনের লক্ষণ আর 'সবুজপত্র' যৌবনেরই প্রতীক—

'যৌবন সুলভ ক্রীড়াকৌতুককে চপলতার চিহ্ন বলিয়া নিন্দা করে এদেশে বুদ্ধিমান লোকে একটি নিত্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন।'

সমকালীন জাতীয়তা ও স্বদেশী উন্মাদনার যুগে সবরকম বিজাতীয়তার স্পর্শ বাঁচানোর ব্যাপারটিকে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি দ্বারা বিদ্ধ করার প্রয়াস প্রবন্ধটিতে লক্ষণীয়—

> 'ইঁহাদের বিশ্বাস হাসি পদার্থটি বিদেশী অতএব এই স্বদেশীয়তার দিনে তাহা বয়কট করাতে জাতীয়তার পরিচয় দেওয়া হয়।'

অথচ ইউরোপের সভ্যতা হাস্যরসে প্রাণবন্ত। প্রাচ্য সভ্যতার তুলনায় ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে লেখক বলেছেন—

'ইউরোপীয় সভ্যতার মূল হাস্যরস অর্থাৎ জীবনের চাঞ্চল্য।'

ভারতবাসীরা শাস্ত্রের অনুশাসনকে গুরুত্ব দেয় বলেই তাদের মনের অন্ধকার দূর হয় না, কারণ জ্যোৎস্নার প্লাবন আনে হাসি।

হাসির জাতি বিভাগ ও তার উৎস নির্ণয়ের প্রয়াসটি অত্যন্ত চমকপ্রদ। হাসিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—নীরব ও সরব—নেত্রজ ও দন্তুর। নেত্রজও আবার দ্বিবিধ—সরল ও বক্র। দন্তুরও দ্বিবিধ—শুষ্ক ও সরস। সরব হাসিকেও ভাগ করা হয়েছে সংকট ও

প্রকট নামে। প্রকটকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে— উৎকট, বিকট ও অট্টহাসি। হাসিব আবার প্রধান দুটি জাতি—দৃশ্য ও শ্রব্য। প্রথমটি স্ত্রী জাতির অধিকারভুক্ত, দ্বিতীয়টি পুরুষের।

উপসংহারে লেখকের বক্তব্য—

'জীবনে যদি হাসির চর্চা করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে সাহিত্যে তাহার চর্চা করা একান্ত কর্তব্য। কেননা ভারত উদ্ধারের আর কোনও উপায় নাই।'

বস্তুতপক্ষে, সমকালীন প্রচলিত ধ্যানধারণাগুলি প্রথার অন্ধ অনুবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়, এই প্রবন্ধে তাকে সেই উপলক্ষ্যে পরিহাস করেছেন প্রাবন্ধিক। 'সবুজপত্র'-র মূল উদ্দেশ্যও এইক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

'সবুজপত্র'-এর সমসাময়িক কালে বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল জাতীয় কংগ্রেস। অর্থনৈতিক, সামাজিক সমস্ত দিক দিয়ে ভারতবাসীকে চির অন্ধকারে রাখার জন্য, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য বিদেশি বিধর্মী ইংরেজ একের পর এক করেছে বিভিন্ন চক্রান্ত। বণিকের যে মানদন্ড রাজদণ্ডে পর্যবসিত হয়েছে তাকে কায়েম রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চিরশান্ত বাংলার বুকে সৃষ্টি করে চলেছিল একের পর এক কুজ্ঝটিকার। ব্রিটিশ শক্তির বিভিন্ন পন্থা এবং নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল জাতীয় কংগ্রেস। জাতীয় কংগ্রেস ও তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং কংগ্রেসের বিভিন্ন দলাদলি সম্পর্কে 'সবুজপত্র' আলোকপাত করেছিল। যদিও সে আলোচনা বিস্তৃত রূপ লাভ করতে পারেনি, তথাপি বীরবলের 'কংগ্রেসের দলাদলি' (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৪), 'কংগ্রেসের আইডিয়াল' (ফাল্গুন, ১৩২২), 'কংগ্রেসের পন্থা' (মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২৮) ইত্যাদি প্রবন্ধে 'সবুজপত্র'-এর রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় লাভ করা যায়।

সর্বোপরি 'সবুজপত্র' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনেও এক পালাবদল ঘটিয়ে দিয়েছিল। 'সবুজপত্র' রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করে, অনুপ্রাণিত করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রভাবিতও করে। 'সবুজপত্র' হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তনকামী চেতনার প্রধান বাহন। 'সবুজপত্র' পর্বে রচিত তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ও প্রবন্ধ—বিষয় ও আঙ্গিক—উভয় দিক থেকেই অভিনবত্ব পরিলক্ষিত হয়। একথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ বার বার তাঁব সৃষ্টিকে অতিক্রম করে গেছেন, নতুন নতুন বাঁকে তাঁর সাহিত্যধারা প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু 'সবুজপত্র'-র প্রকাশের প্রাক্কালে তাঁর জীবন মন, পরিবর্তনকামী চেতনা, একটি বৃহৎ প্রেক্ষণীর সন্ধান পায়, যার ফলে তাঁর রচনার পালে নতুন হাওয়ার জোয়ার এল। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক ও সুসাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর বিশ্লেষণটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ—

> আর রবীন্দ্রনাথ—তিনি সবুজপত্রের কাছে পেয়েছিলেন পুবোনো অভ্যেসের বেড়ি ভাঙার সাহস, যৌবনের স্পর্শ, গদ্য ভাষার জন্মান্তর-সাধনেব প্রেবণা—বরং যে প্রেরণা তাঁর মনের মধ্যে বহুদিন ধরে গুমরে ফিরেছিলো, তাকে নিঃসঙ্কোচে মুক্তি দেবার পথ পেয়েছিলেন। যেমন টেনিসন ক্রিসমাস-বার্ষিকীতে কবিতা ছাপাতে আপত্তি করেননি, তেমনি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বোত্তম এবং সর্বাধিক রচনাবলী বহু বছর ধরে 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেই তৃপ্ত ছিলেন, এ ব্যবস্থায় তাঁর কোনো বিক্ষোভ তো ছিলোই না, বরং 'প্রবাসী'র উদার আশ্রয়ের জন্য মনে

মনে কৃতজ্ঞতাবোধ ছিলো। 'প্রবাসী'র অনেক কিছুই ভালো ছিলো, কিন্তু দোষ ছিলো এই যে, কোনোই দোষ ছিল না ; এ রেসপেক্টেবিলিটির দুর্গের মধ্যে 'ঘরে-বাইরে' উড়ে এসে পড়লে কী-রকম অভ্যর্থনা হতো জানি না, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে এটুকু মনে হয় যে, 'ঘরে-বাইরে'র রচনার পিছনে 'সবুজপত্রে'রই উদ্দীপনা ছিলো। 'বলাকা'র সময় থেকে গদ্যে-পদ্যে যে নতুন রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি,তার স্রষ্টা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই কিন্তু ধাত্রী 'সবুজপত্র' তাতে সন্দেহ নেই।[১৬]

উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'ঘরে-বাইরে' বা 'চতুরঙ্গ'-এর মতো সর্বাঙ্গীণ আধুনিক উপন্যাস ইতিপূর্বে রবীন্দ্রলেখনী থেকে উৎসারিত হয়নি। 'ঘরে-বাইরে' (১৩২২) উপন্যাসের পটভূমিকা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, যার মূলে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনার আগুনের উত্তাপ তিনি অনুভব করেছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে যে দুর্বলতা, আত্মশক্তির অভাবজনিত যান্ত্রিকতা ছিল—তাকেই রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন। ফলে গোঁড়া হিন্দুদের মতো স্বাধীনতা কর্মীদেরও এই উপন্যাস বিরূপ করেছিল। মানবতাই সকল আন্দোলনের মূল ভিত্তি হওয়া উচিত—রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার এই ছিল মূল লক্ষ্য।

বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতার যথার্থ প্রতিষ্ঠা হল 'সবুজপত্র'-এর পৃষ্ঠাতেই 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে। ১৩২১-এ প্রকাশিত 'চতুরঙ্গ' ভারতীয় কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক সুবিপুল শিল্প সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। চেতনাপ্রবাহী উপন্যাসে Inner reality-র সন্ধান, আত্ম-আবিষ্কারের পথে চরিত্রের উত্তরণ, চরিত্রের নিঃশর্ত স্বাধীন বিবর্তন তথা চরিত্রের জন্মান্তর, ব্যক্তিচরিত্রের সর্বময় প্রতিষ্ঠা, প্রতিদিনের নির্মিত ও নির্মীয়মান চরিত্রের উপর অন্ধকার অবচেতনার প্রভাব, অসম্পূর্ণ অনির্ধারিত চরিত্রের নিরন্তর পূর্ণতার অন্বেষণ সমস্ত কিছুরই ইঙ্গিত 'চতুরঙ্গ'-এ ব্যঞ্জিত। উপন্যাসে পাঠকের যাবতীয় অভ্যস্ত সংস্কারকে বিপর্যস্ত করে দিল 'চতুরঙ্গ'। প্রাক্‌নির্দিষ্ট, নিয়ন্ত্রিত, নিটোল, সংযত কাহিনী গ্রন্থনার যে অভ্যাস এতকাল চলছিল, তার জায়গায় 'চতুরঙ্গ'-এ দেখা গেল আপাতশিথিল, কিছুটা তরল ও সংহতিবিহীন প্রবহমান দৃশ্যের অন্তরালে এক শিল্পসচেতন জীবনবীক্ষা। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসেই বহির্জগত থেকে ভিতর দেহলীতে প্রবেশের সূচনা।

উপন্যাসের নায়ক চরিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ প্রথাসিদ্ধ রীতিকে ভেঙেছেন। উপন্যাস সূচনায় শচীশের প্রথম ছবি—

'শচীশকে দেখিলে মনে হয়, যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে, তার লম্বা সরু আঙ্গুলগুলি যেন আগুনের শিখা, তার গায়ের রঙ নহে, তাহা আভা।'

এই বর্ণনা দিয়েই শ্রীবিলাস লিখেছে—'শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তাহার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম;তাই এক মুহূর্তে তাহাকে ভালোবাসিলাম।' কিন্তু ভক্ত শ্রীবিলাসের পূজা ব্যাহত হয়েছে গোড়াতেই যখন সে জানতে পেরেছে এই দেবদুর্লভ রূপের অধিকারী শচীশ সোনার বেনে এবং ঘোরতর নাস্তিক। অর্থাৎ এই প্রথম বাংলা উপন্যাসের চিরাচরিত নায়ক চরিত্রের বর্ণাভিমানে ঘা মারলেন রবীন্দ্রনাথ। উচ্চবর্ণের অভিজাত সমাজের কাছ থেকে চরিত্রকে

ছিনিয়ে এনে তথাকথিত নিম্নবর্ণের এই চবিত্রটিকে নায়কের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত কবেছেন । বাংলা উপন্যাসের পাঠকের অভ্যস্ত নায়ক সংস্কারও বিপর্যস্ত হয়েছে ।

'চতুরঙ্গ'-র ভাষাও এর শিল্পরূপকে বিশিষ্টতা দিয়েছে । সাধু গদ্যের সঙ্গে চলিত গদ্যের বেগ সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছে এই ভাষায় । সাধু গদ্যের সমস্ত পোশাকিয়ানা, স্থাবরতা থেকে মুক্ত করে ভাষাকে করে তোলা হয়েছে ধারাল ছুরির মতো, যা আমাদের অসাড় চৈতন্যকে জাগিয়ে তোলে । ব্যঞ্জনার সাহচর্যে যে ভাষা তিনি পরিবেশন করেছেন, কিছু কিছু জায়গায় তার কাব্যসৌন্দর্য অসাধারণ । ভাষাকে আরো বেশি জীবন্ত করে তোলবার জন্যই চলিত গদ্যের কিছু কিছু Phrase-কে ইচ্ছাকৃতভাবেই কত অনায়াসে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন । যেমন শ্রীবিলাসের উক্তি—

'আমাকে বিশেষ করিয়া ঘা দিবার জন্যই শচীশকে দিয়া এই তামাক সাজানো, এই পা টেপানো ।'

এছাড়া বহু অকাব্যিক শব্দ ব্যবহার করেছেন সাধু বাংলার আভিজাত্যকে একেবারে ঘুচিয়ে দিয়ে । আসলে সর্বাত্মক আধুনিক একটি উপন্যাসে অন্তর্বাস্তবতাকে পরিস্ফুট করার জন্যই এরূপ একটি জীবন্ত ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ।

বাংলা উপন্যাসে পূর্ণতার অন্বেষণ ও ব্যক্তি চরিত্রের সর্বময় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এক সর্বাঙ্গীণ আধুনিকতার নবদিগন্তের সূচনা 'চতুরঙ্গ'-এ; যার প্রধান প্রকাশস্থল হল 'সবুজপত্র' । সুতরাং 'সবুজপত্র' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যেও এক বৈপ্লবিক পালাবদল ঘটিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল ।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিকাশের রূপরেখাটি অঙ্কন করতে গেলে 'সবুজপত্র' যুগের গল্পগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয় । প্রথম পর্বে 'দেনাপাওনা' গল্পের মধ্যে আমরা নিরুপমার বিদ্রোহচেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করিনি, বরং গভীর করুণ মর্মবেদনাই আমাদের আলোড়িত করে, যা পাঠকের মনকে বিষণ্ণতায় ভারাতুর করে তোলে । কিন্তু 'সবুজপত্র' পর্বে 'স্ত্রীর পত্র'-এ সহানুভূতি নয়, নারীর স্বাধিকারবোধের দীপ্তি ও বৈচিত্র্য আমাদের সচকিত করে । সমাজ দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ এখানে আপোষহীন সংগ্রামী, বক্তব্য উপস্থাপনেও অনেক তীক্ষ্ণ । 'স্ত্রীর পত্র' (শ্রাবণ, ১৩২১), 'হালদার গোষ্ঠী' (বৈশাখ, ১৩২১), 'হৈমন্তী' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১), 'শেষের রাত্রি' (আশ্বিন, ১৩২১), 'পয়লা নম্বর' (আষাঢ়, ১৩২৪), 'অপরিচিতা' (কার্তিক, ১৩২১), 'বোষ্টমী' (আষাঢ়, ১৩২১), 'পাত্র ও পাত্রী' (পৌষ, ১৩২৪) প্রভৃতি গল্পগুলির উপস্থাপনা অনেক তির্যক । 'সবুজপত্র' যুগে রবীন্দ্রনাথের কুসংস্কার, আচার-সর্বস্বতা এবং সংকীর্ণতা সম্পর্কে এত তীক্ষ্ণ মনোভাব এবং প্রকাশভঙ্গির এমন স্পষ্টতা পূর্ববর্তী গল্পের তুলনায় অধিক । সামগ্রিকভাবে মানসমুক্তির কথাই 'সবুজপত্র'-এর উদ্দেশ্য ছিল, যার ভিত্তি অবশ্যই হবে মননঋদ্ধ । তাই পূর্ববর্তী গল্পগুলিতে যার আবেদন ছিল হৃদয়ের কাছে, সবুজপত্র-যুগের সেই সমস্যারই আবেদন মস্তিষ্কের কাছে, বুদ্ধি ও যুক্তির কাছে ।

সবুজপত্র-পর্বের অন্যতম বিশিষ্ট গল্প 'স্ত্রীর পত্র' । 'স্ত্রীর পত্র'-এ নারী ব্যক্তিত্বের

মুক্তির যে আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে, তা 'সবুজপত্র'-এর আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। স্ত্রী-র পত্রে মৃণাল বলছে—'এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়'। বলেছে, 'মেজোবউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না'। আসলে পত্নীত্ব নয়, মনুষ্যত্বই যে নারীর পরম রত্ন গল্পকার তাই বলতে চেয়েছেন। অর্থাৎ 'স্ত্রীর পত্র' শেষ পর্যন্ত আর স্ত্রী পত্র থাকেনি। গল্পের নামকরণকে ভেঙে দেওয়াই এখানে গল্পনামের নবশিল্পরূপ। নীরব অশ্রুতে, কারুণ্যে পরিসমাপ্তি নয়, বিদ্রূপের কশাঘাতে সচকিত করার অভিপ্রায়ই প্রধান।

ভাবের দিক দিয়ে যেমন, তেমনি ভাষার দিক দিয়েও 'স্ত্রীর পত্র' বিদ্রোহী। 'সবুজপত্র'-এ ১৩২১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে প্রকাশিত 'স্ত্রীর পত্র'ই চলিতভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প। 'স্ত্রীর পত্র'তেই গল্পশিল্পী রবীন্দ্রনাথ প্রথম চলিতভাষা ব্যবহার করলেন তা কাকতালীয় নয়। স্ত্রীর কাছে স্বামীর শাস্ত্রনির্দিষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদা এখানে ধূলিলুণ্ঠিত হয়েছে; সুতরাং তার কাছে পাঠান পত্রের মাধ্যমও তাই চলতি। ভাব ও ভাষা দুই ক্ষেত্রেই 'স্ত্রীর পত্র' বিদ্রোহী।

১৩২১ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের 'সবুজপত্র'তে 'বোষ্টমী' প্রকাশিত হওয়ার পর প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> আমরা এই লেখাগুলি গল্পপিপাসু পাঠকদের বেশ ঢক্‌ঢক্ করে খাবার মতো হচ্ছে না—এগুলো গল্প না বললেই হয়।[১৭]

প্রাক্-সবুজপত্র-পর্বের সঙ্গে সবুজপত্র-পর্বের ছোটগল্পের শিল্প-প্রকরণগত পার্থক্য এখানে আভাসিত হচ্ছে। আসলে জীবনের রূপরচনা নয়, জীবনের ভাষ্যরচনাই 'সবুজপত্র' পর্বের ছোটগল্পের অন্যতম লক্ষণ। পারম্পর্যগ্রথিত ও পূর্ণাঙ্গ গল্প-কথনের পরিবর্তে গল্পের সূত্রে জীবনসমালোচনাই এখানে মুখ্য। এই কারণেই বলা হয়েছে 'এগুলো গল্প না বললেই হয়'।

বিশেষভাবে 'বোষ্টমী' গল্পটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে রবীন্দ্রনাথের ঐ মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'বোষ্টমী' গল্পের প্রথম অর্ধাংশ জুড়ে রয়েছে লেখকের আত্মকথা এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বোষ্টমীর সঙ্গে লেখকের কথোপকথনের বিবরণ। এই কথাবার্তার মধ্যে গল্পধর্ম সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে বোষ্টমীর চরিত্র শিল্পিত হয়েছে। গল্পের প্রথমার্ধে আদৌ কোনো ঘটনা ঘটছেই না, গল্প হয়ে উঠছে শুধুমাত্র 'সংলাপগ্রথিত চরিত্রায়ণ'—বোষ্টমী এই দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গল্পশিল্পলোকে সম্পূর্ণ অভিনব।

'সবুজপত্র' পর্বের গল্পমালায় 'বোষ্টমী' আর একটি দিক দিয়ে স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। লক্ষণীয় 'সবুজপত্র' পর্বের অনেক গল্পই উত্তম পুরুষে বিন্যস্ত। 'বোষ্টমী' গল্পের লেখকচরিত্রটি রবীন্দ্রনাথেরই বিকল্পসত্তা। এই গল্পে পাশাপাশি দুটি উত্তম পুরুষের অবস্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গল্পের প্রথম অর্ধাংশে 'লেখক আমি' বোষ্টমীর কথা বলেছেন আর গল্পের শেষ অর্ধাংশে বোষ্টমী উত্তম পুরুষের আত্মকথা বলেছে। অন্যের দৃষ্টিকোণ ও নিজের দৃষ্টিকোণ মিলিত হওয়ার ফলে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের ভারসাম্যে বোষ্টমী চরিত্রটি সামগ্রিক সম্পূর্ণতা পেয়েছে। বোষ্টমী যেখানে নিজেই নিজেকে দেখছে সেখানে ভাষায় এসেছে বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতা আর লেখক যেখানে বোষ্টমীকে দেখেছেন সেখানে ভাষা ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতায় সুন্দর।

এইভাবেই 'সবুজপত্র' রবীন্দ্র গল্পলোকে এক নতুন যুগের সূচনা করল, যার অন্তঃস্থলে রয়েছে 'সবুজপত্র'-এরই চরিত্রধর্ম ।

রবীন্দ্র কাব্যধারায় একটা বড় রকমের পালাবদল ঘটে গেল 'বলাকা'য় । নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী অশান্ত ইউরোপ পরিভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যধারার যে পালাবদল ঘটে গিয়েছিল, 'বলাকা'ই তার প্রথম সোপান । ভারতীয় কাব্যসাহিত্যে প্রথম আন্তর্জাতিক মাত্রা যোগের পরিচয় 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থ। জীবনের অদম্য গতিপ্রবাহ এবং সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতকে কাব্যে প্রকাশ করার এই প্রচেষ্টা 'সবুজপত্র'-এর পৃষ্ঠাতেই সম্ভবপর হয়েছিল । কবি নিজেই বলেছেন—

এই কবিতাগুলি প্রথমে সবুজপত্রের তাগিদে লিখতে আরম্ভ করি ।[১৮]

'সবুজপত্র'-এর তাগিদে রচিত কবিতাগুলির বিশেষত্ব হল পূর্ববর্তী পর্যায়ের যে স্থিতির প্রশান্তিতে তিনি আত্মনিমজ্জিত হতে চেয়েছিলেন, তাকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে কবি চলমান, বিক্ষুব্ধ, বিস্ফারিত আন্দোলিত জগতের দিকে মোহহীন দৃষ্টিতে নেত্রপাত করলেন । এই কাব্যের বিশিষ্টতা এখানে জীবন-দর্শন, জীবানুভব এবং তাকে প্রকাশ যত না আবেগেব দৃষ্টিতে, তার অপেক্ষা অনেক বেশি বুদ্ধির দীপ্তিতে, বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞায় । ভাবের আচ্ছন্নতায় নয়, জাগ্রত জীবন বোধের উজ্জ্বল আলোকে এবং সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ কোনো বিশেষ ধারণার মাপকাঠিতে নয়, সামগ্রিব বিশ্ব চেতনার নিরিখেই কবিতাগুলির মূল্যায়ণ করা যায় ।

এই কাব্যের আর একটি বিশিষ্টতা এর আঙ্গিক, বিশেষত এর ছন্দ । এই কাব্যের প্রকাশভঙ্গিতে সঙ্গীতধর্ম ও চিত্রধর্মের মিলন । আর ছন্দের মধ্যে এসেছে এক অপূর্ব গতিময়তা। কবিতাগুলির ভাবের মধ্যে যে মুক্তির দ্যোতনা আছে, ছন্দও সমমাত্রার চরণের শৃঙ্খলকে ভেঙে যেন সেই মুক্তিকেই অবারিত অথচ দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলেছে । ভাব বুদ্ধিদীপ্ত অথচ তার প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত ও আবেগময় ছন্দের মধ্যে । এই বৈপরীত্যের সম্মিলনেই রবীন্দ্রসাহিত্যে এসেছে অভিনব সৌন্দর্যব্যঞ্জনা । রবীন্দ্র কাব্যধারার এই অভিনবত্বের ধাত্রীও 'সবুজপত্র' ।

'সবুজপত্র' রবীন্দ্রদূষণের উল্লেখযোগ্য পর্বে রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনায় একটা পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছে। 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশিত 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস নিয়ে যখন চারিদিকে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তখন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'দাদার ডায়েরী' (অগ্রহায়ণ-মাঘ, ১৩২৩) রচনায় চলতি অভিযোগগুলির মৌল কারণটি অনুসন্ধানের প্রয়াস করলেন । রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গেল । সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীও রবীন্দ্রনাটক 'অচলায়তন'-এ একটি মনোজ্ঞ সমালোচনা প্রকাশ করলেন তাঁর 'পঞ্চক' (অগ্রহায়ণ, ১৩২৪) প্রবন্ধে । এমন পূর্ণাঙ্গ ও অভিনব ভঙ্গিতে ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাট্য সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়নি । সামাজিক বা নৈতিক দৃষ্টিতে নয়, শৈল্পিক দৃষ্টিতেই নাটকটির মূল্যায়ণ করা হয়েছে । ১৩২৫ সালের বৈশাখে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারও এই নাটকটির বিস্তৃত আলোচনা করেন তাঁর 'গুরু' প্রবন্ধে । শিল্পমূল্য বিচার অপেক্ষা সমকালীন প্রতিক্রিয়ার উত্তর দেওয়ার উপলক্ষেই এ প্রবন্ধ রচিত । প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে প্রগতির পক্ষেই এই সকল প্রবন্ধ সওয়াল করে । বিশ্লেষণে

অসাধারণত্ব না থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গি এবং রচনাকুশলতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিমূলক সমালোচনার যে ধারা পরবর্তীকালে কিছুটা প্রতিষ্ঠা পায়, তার মূলে 'সবুজপত্র'-র একটা বিশিষ্ট ভূমিকা বর্তমান । সংঘবদ্ধ রবীন্দ্রবিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র সাহিত্যকে অপ্রমত্তচিত্তে মূল্যায়নের প্রয়াস 'সবুজপত্র'ই সূচনা করে । রবীন্দ্রনাথও অকুণ্ঠচিত্তে 'সবুজপত্র'-র ঋণ স্বীকার করে বলেছেন—

> আমি যখন সাময়িক পত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথ-র আহ্বান মাত্র সবুজপত্র বাহকতায় আমি তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলুম । প্রমথনাথ এই পত্রিকাকে একটা বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন। তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য সাধনায় একটি নতুন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল । প্রচলিত অন্য কোন পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভ ব হতে পারে না সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নতুন ভূমিকা রচনা প্রমথ'র কৃতিত্ব । আমি, তার কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হইনি ।[১৯]

স্বয়ং কবির মুখে এই স্বীকারোক্তিই প্রমাণ করে রবীন্দ্রসাহিত্য ধারায় 'সবুজপত্র'-র ভূমিকা ।

বাংলা সাহিত্যে 'সবুজপত্র'-এর দান প্রসঙ্গে আলোচনা কালে বিশিষ্ট সমালোচক ও সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন—

> এর প্রথম দান প্রমথ চৌধুরী বা বীরবল... । প্রচলিত অন্য কোনো পত্রিকায়, অন্য কোনো সম্পাদকের আশ্রয়ে প্রমথ চৌধুরীর স্বকীয়তার বিকাশ হতে পারতো না, তাছাড়া শুধু রচনাতেই নয়, সম্পাদনাতেও তিনি ছিলেন প্রতিভাবান ।[২০]

সমালোচকের এই মন্তব্যকে শিরোধার্য করে বলা যায়, 'সবুজপত্র' রবীন্দ্রনাথ এবং বিশেষভাবে প্রমথ চৌধুরীকে দিয়েছিল আত্মপ্রকাশের অভিনব ক্ষেত্র । 'সবুজপত্র' সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েই প্রমথ চৌধুরী তাঁর সাহিত্য প্রতিভার যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন ।

রতনে রতনই চেনে । তাই প্রমথ চৌধুরীর চিন্তার তীক্ষ্মতা ও সজীবতা এবং তাঁর ভাষার জোর ও উজ্জ্বলতা দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই সাহিত্যশাসনে গান্ডীবীরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হবার কয়েকমাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে একটি চিঠিতে লিখছেন—

> আমার তো দেখে শুনে মনে হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে তোমার একটা দিন আসছে এবং তোমার একটা কাজ আছে । এইবার সাহিত্য-সিংহাসনে তুমি রাজদন্ড গ্রহণ করে শাসনভার নেবে এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ।[২১]

প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন । নাম গ্রহণের পিছনে তাঁর খেয়ালের চেয়েও বেশি ছিল বোধ হয় মনের বিশেষ ধরনের গড়ন । বীরবল ছিলেন আকবরের সভার অন্যতম সুরসিক সভাসদ । বীরবলের রসিকতা ও বাক্চাতুর্যের গল্প ছড়িয়ে আছে বাংলার ঘরে ঘরে । প্রমথ চৌধুরী স্বীকার করেছেন—'আমি বাঙালী জাতির বিদূষকমাত্র' । (বীরবল, চৈত্র, ১৩৩৩)

বীরবল নাম গ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

বছর কুড়ি আগে আমি যখন দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্য কথা শোনাতে মনস্থ করি, তখন আমি না ভেবে চিন্তে বীরবলের নাম অবলম্বন করলুম। এ নামের দুটি স্পষ্ট গুণ আছে, প্রথমত নামটি ছোট, দ্বিতীয়ত শ্রুতিমধুর।[২২]

বীরবল নাম ভেবে চিন্তে গ্রহণ করলেও সার্থক হয়েছিল। নাগরিক জীবন যাপনে, রসিকতার ছলে সত্য কথা বলা, দিলখুশভাবে বৈঠকী আড্ডায় মিলিত হওয়া সমস্ত দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বীরবলেরই দোসর। বীরবলের সঙ্গে তিনি নিজেকে এতটাই একাত্মবোধ করেছেন যে বীরবল ছদ্মনামের রচনা এবং তাঁর স্বনাম প্রমথ চৌধুরীর রচনার মধ্যে কোনও সীমারেখা টানা সম্ভব নয়।

প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যে ও জীবনে যে কটি গুণের চর্চায় বিশেষ উৎসাহ বোধ করেছিলেন সেগুলি হল যুক্তি বিচারে শ্রদ্ধাশীলতা, প্রসাদগুণ (ক্ল্যারিটি) ও দৃঢ় সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও পরিশীলিত সংস্কৃতিবোধ। প্রমথ চৌধুরীর সমালোচকের বিশ্লেষণটি নিম্নরূপ—

ভাবালুতা, অস্পষ্টতা, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি, বিশৃঙ্খল-পদান্বয়, অকারণ বিশেষণবাহুল্য, অনুরূপ ক্রিয়াপদের একঘেয়েমি—বাংলা গদ্যের এই দুর্লক্ষণ প্রমথনাথ তাঁর রচনায় সমূলে উচ্ছেদ করেছেন। বাংলা গদ্যের যে একটি পরিমিত, সুসভ্য, সংযত, ব্যঙ্গনিপুণ, তীক্ষ্ণাগ্র উজ্জ্বল চেহারা বীরবলী গদ্যে দেখি, তা আসলে পরিশীলিত, নাগরিক সহাস্য, বিদগ্ধ বীরবলী মনের বহিঃপ্রকাশ।[২৩]

এটিই প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের সাহিত্যিক মূল্যায়ন যা 'সবুজপত্র'-এর মাধ্যমে বাংলা গদ্যভাষার ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করে দিতে সফল হয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী।

'সবুজপত্র'-এর সবচেয়ে বড় কাজ ভাষা আন্দোলন। সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে দীর্ঘ বিরোধের একটা মীমাংসা 'সবুজপত্র'-এর মাধ্যমে সম্ভব হয়ে ওঠে। অবশ্য 'সবুজপত্র' প্রতিষ্ঠার অর্ধ-শতাব্দীরও অধিক কাল থেকে কথ্য ভাষাকে সাহিত্যিক কৌলিন্য দেওয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছিল। প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' কিংবা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় তার সাক্ষর রয়েছে। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় প্যারীচাঁদ মিত্র 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় বাংলা ভাষার এক নতুন রূপদানের চেষ্টা করা হয়েছিল। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল'কে আকস্মিক বলা যায় না—'মাসিক পত্রিকা'কে আশ্রয় করে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীও গড়ে উঠেছিল। এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সমালোচক ড. সুকুমার সেন বলেছেন—

কথ্যভাষার রীতিতে কাব্যরচনা, প্রচুর তদ্ভব ও চলিত ফারসি শব্দের ব্যবহার, এবং ক্রিয়াপদে সাধু ও কথ্যভাষার মিশ্রণ—ইহাই হইতেছে, 'মাসিক পত্রিকা'র বাগ্‌ভঙ্গির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।[২৪]

এছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দের রচনায়, মধুসূদন, দীনবন্ধুর নাটকের সংলাপে, রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ কাহিনীতে, পত্রসাহিত্যে কথ্য ভাষার সুমার্জিত রূপ বা রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাক্-সবুজপত্র যুগের কথ্য ভাষার প্রয়োগ পদ্ধতির মূলে সার্বজনীন স্বীকৃত ছিল না। তাছাড়া এগুলি একটি বিস্তৃত, আন্দোলনও নয়, বিক্ষিপ্ত ও পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা মাত্র।

'সবুজপত্র' পত্রিকা অবলম্বন করে কথ্য ভাষার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শুধু একটি বিচ্ছিন্ন সাহিত্যিক উদ্যম মাত্র নয়, এর বিস্তৃতি ও প্রভাব একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মর্যাদাবাহী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ইতিপূর্বে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু 'সবুজপত্র'-এর যুগ থেকে এল দুর্বার বন্যা। এই অসাধারণ রূপদক্ষ তাঁর রচনার ভেতর দিয়ে শুধু চলিত ভাষার কৌলিন্যই নয়, যথার্থ শিল্পরূপও প্রতিষ্ঠিত করলেন। যেমন 'ঘরে-বাইরে'-র ইস্পাতের মতো কঠিন মননের দীপ্তিতে ভাস্বর এই ভাষায় রাজকীয় ঐশ্বর্য নেই সত্য, কিন্তু আতিশয্যহীন বুদ্ধিমার্জিত গদ্যরীতির এ এক নিজস্ব রূপ। শুধুমাত্র সর্বনাম বা ক্রিয়াপদের চলিত রূপ ব্যবহারেই এই ভাষা প্রতিষ্ঠিত নয়, তার প্রাঞ্জলতা, দ্রুত সঞ্চারী লঘুতা—যা আমাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ, তাকেই মর্যাদা দেওয়া এই ভাষার প্রধান লক্ষ্য। বাংলা গদ্যের এই চলিত রূপকে চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই 'ঘরে-বাইরে'র গদ্য একদিন 'শেষের কবিতা'র বাণীবিলাসে পরিণত হল। 'সবুজপত্র'-এর যুগের ভাষাকে ভেঙেচুরে আর এক নতুন ভাষার সৃষ্টি হল। এভাবেই 'সবুজপত্র'-এর চলিত ভাষার আন্দোলন সাহিত্যিক কৌলিন্য লাভ করেছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

> সবুজপত্র বাংলা ভাষার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেল।[২৫]

'সবুজপত্র'-এর এই চলিত ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে তার সমকালে 'নারায়ণ' বা 'আর্য্যাবর্ত্ত' লেখনী ধারণ করেছিল। তবে সর্বশেষ সক্রিয় লেখনী ধারণ করেছিলেন কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার। তাঁর মতে চলিত ভাষা বাঙালির সুদীর্ঘকালেব ভাষাগত আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করেছে। 'জাতির আত্মভ্রষ্টতা'ই এর মূল কারণ। রবীন্দ্রনাথকেই তিনি এ বিষয়ে প্রধানত দায়ী করে বলেছেন—

> ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের চিঠির ভাষা, শান্তিনিকেতনে তাঁহার মৌখিক আলাপ-আলোচনা ও ধর্ম-ব্যাখ্যানের ভাষা এবং তাহার লিপিবদ্ধ রূপ, বাংলা গদ্যের জাত্যন্তর ঘটাইতে, শিষ্যবিদ্যা, গরীয়সী করিয়া তুলিতে যথাসম্ভব সহায়তা কবিয়াছিল।[২৬]

তিনি আরও বলেছেন—

ক. গদ্যে যাহাবা চলিত ভাষাকে আদর্শ করিতে চাহিল তাহারা একটি কৃত্রিম ভাষা গড়িযা তুলিল—সমাজের এক সম্প্রদাযের বৈঠকখানায়, কৃত্রিম স্বরভঙ্গিতে আধো-আধো টানা টানা উচ্চারণে যে ধরনের কথাবার্তা হয়, ইহা সেই ভাষা; ইহাতে। 'ক‌্‌নি' উচ্চারণযুক্ত 'ক‌্‌নি' বুলির মিশ্রণও অল্প নহে। এ ভাষা যেমন পুঁথির ভাষাও নয়, তেমনি ইহা বাঙালি সন্তানের মুখের বুলিও নহে।[২৬ক]

খ. রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতেছি না, এত বড়ো ওস্তাদের ওস্তাদীর কথাই স্বতন্ত্র। অপর দু-একজন যাঁহারা সাধুভাষাতেই উচ্চারণ বদলাইয়া 'চল্‌তি' নামে চালাইয়া থাকেন, তাঁহাদের কথাও বলি না—যদিও এই নাটের গুরু তাঁহারাই; যাঁহারা এই নূতন ভঙ্গির অনুকরণ করিয়া থাকেন, খাঁটি বাংলা-বুলি তাঁহাদের জানা নাই, কেবল ক্রিয়াপদগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়াই তাঁহাদের একমাত্র বাহাদুরী। এই ক্রিয়াপদের খর্বতা সাধনই যেমন এ ভাষার একমাত্র মৌলিক লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমনই এই রন্ধ্রপথেই যত অনাচার প্রবেশ করিতেছে।[২৬খ]

মোহিতলালের এই উদ্ধৃতি-দুটির মধ্যে তীব্র আক্রমণেব ভাষা ও উষ্মার বঙ্কিমান হয়ে উঠেছে। বীরবলী ভাষা যে 'বাঙালী সন্তানের মুখের বুলি' নয়, একথাও তিনি প্রবল আত্মপ্রত্যযেব সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। এর থেকে এটাই স্পষ্ট যে 'সবুজপত্র'-এর ভাষা-আন্দোলনের বিরুদ্ধতার সন্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের নিয়মেই 'সবুজপত্র'-এর প্রগীতশীল ভাবনাকে স্তব্ধ করে রাখা যায়নি, যার ফলে বাংলা ভাষা হযে উঠতে পেরেছিল যথার্থ আধুনিকতার বার্তাবাহক।

'সবুজপত্র'-এর এই মুক্ত চিন্তা ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তথা আধুনিক নবীন চিন্তাধাবার চরিত্রকে সমকালীন বিভিন্ন প্রাচীনপন্থী পত্রিকা বিরোধিতা করে। 'সাহিত্য' (১৮৯০), 'আর্য্যাবর্ত্ত', 'ভারতবর্ষ' (১৯১৩), 'বসুমতী' (১৯২২), 'যমুনা' (১৯০৩), 'মানসী' (১৯০৮), 'মানসী ও মর্মবাণী' (১৯১৫-১৬), 'অর্চনা' এবং 'নারায়ণ' (১৯১৪) 'সবুজপত্র'-এর বিরোধিতায় সরব হয়ে ওঠে। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া, সাধু ও চলিত, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা, গোঁড়ামি বনাম মুক্ত চিন্তার দ্বন্দ্ব 'সবুজপত্র'কে সর্বদা বিতর্ক-সঙ্কুল করে তুলেছিল। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনাও এইসব প্রতিক্রিয়াপন্থী সাহিত্য পত্রিকাগুলির আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

ধারাবাহিকভাবে 'সবুজপত্র' সমালোচনায় যে সকল পত্রিকা অগ্রণী হয়, তার মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকা অন্যতম। প্রভাবশালী সাময়িকপত্র সম্পাদকদের মধ্যে সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম সেকালে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। 'সাহিত্য' পত্রিকা যতখানি 'সবুজপত্র'-বিরোধী ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল রবীন্দ্র-বিরোধী। আসলে রবীন্দ্র বিরোধের পথ ধরেই 'সাহিত্য' 'সবুজপত্র'-বিরোধী হয়ে ওঠে। 'সাহিত্য'-এর 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা বিভাগ'-এ সহযোগী পত্রিকাগুলির আলোচনা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। এইসব সমালোচনাতেই 'সাহিত্য' পত্রিকার গোঁড়ামি এবং সীমাবদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'সবুজপত্র'-এর বৈশাখ, ১৩২৩ সংখ্যাটির পাঠ্যালোচনাটি কৌতুককর—

'সবুজপত্র রবীন্দ্রনাথের খাসমহল, তাই ইহাতে রবীন্দ্রনাথের খাস খোসমেজাজের এত ছড়াছড়ি। রবীন্দ্রনাথ আজ প্রহেলিকায় সিদ্ধ হইয়াছেন, যা লেখেন তা-ই প্রায় হেঁয়ালি হইয়া যায়। বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের নববর্ষের আশীর্বাদ পড়িয়া মনে হয় যেন বর্ধমানের গোলাপবাগের গোলোকধাঁধায় ঢুকিয়াছি। 'দূর হতে দূরে......একতারা' পথে বাজিতেছে। ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, বাঁয়া বাজে, তবলা বাজে... ..দুঃখের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের পথেও বেতালা বাজিতেছে। অনেক উৎকট সমস্যা শোনা গিয়াছে, কিন্তু এমন উদ্ভট কল্পনা রবীন্দ্রনাথের অথর্ববেদেও ইতিপূর্বে দেখি নাই।' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩)।

'সাহিত্য' সম্পাদকের ব্যক্তিগত মনোভাবটিই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। সাহিত্যের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তার প্রতি তাঁর কোন দৃষ্টি নেই।'

এই সংখ্যাতেই হারীতকৃষ্ণ দেবের প্রবন্ধ 'বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষা' (আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৩) সম্পর্কে বিদ্রূপপূর্ণ মতামত অত্যন্ত তীব্র—

'আমরাও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি হারীতকৃষ্ণ। তাহার কারণ এই যে 'বাংলায়

হালে পানি পায় না । প্রমথ কি করিতেছেন জানেন ? ঠিক যেন কোন বখা ছোকরা বুড়ো ঠাকুরদাদাকে গাঁজার আড্ডায় টানিয়া লইয়া গিয়া মজা করিতেছে । প্রমথর 'উচিত আদরে' কলিকাতার ককনির দরদে বুড়ো সংস্কৃত হাঁফাইয়া উঠিতেছে ।'

এছাড়া সুরেশানন্দের 'প্রাণ ও মরণ' (আশ্বিন-কার্তিক; ১৩২৩) কবিতা সম্পর্কে তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক মন্তব্য বর্ষিত হয়েছে—

'শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্যের প্রাণ ও মরণ প্রহেলিকা এমন ভীষণ লেখা এ যুগেও চোখে অল্প পড়িয়াছে ।'

এই সংখ্যাতে প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট'টি সম্পর্কে মন্তব্য—শ্রী প্রমথ চৌধুরীর সনেট পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি । লজ্জা পাইবার উপায় নাই কেননা আমরা বিবসন যুগের জন্য প্রস্তুত হইতেছি ।'

'সাহিত্য' সম্পাদকের উদ্দেশ্যই ছিল 'সবুজপত্র'-এর নতুনত্বকে উপেক্ষা করা । ঐ সংখ্যাতেই যে সমস্ত রচনা ছিল, তার সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর মনোযোগ ছিল না । হারীতকৃষ্ণ দেব 'সাহিত্য' সম্পাদকের এই সমালোচনার দিকে প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রমথ চৌধুরীর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যবহ । তিনি লিখেছেন—

> সাহিত্যের সমালোচনা পড়েছি । গালের ভাগ তুমিও পেয়েছ, কিন্তু বেশি মাত্রায় নয় । সুরেশানন্দের উপর সমালোচনার টোটকা বেশি । রবিবাবুর তো কথাই নেই । আর আমাকে সুরেশ পূর্বে কখনো এভাবে আক্রমণ করেনি । শেষ কথা কটি ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করেছে। এদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আমবা নিশ্চয়ই হারবো । কেননা আমরা সাহিত্যের যুদ্ধক্ষেত্রে Poisonous (পয়জনাস) গ্যাস ছড়াতে পারবো না । আমরা বড়জোব লিকুইড ফায়ার প্রয়োগ করতে পারি।[২৭]

প্রমথ চৌধুরীর এই চিঠিতেই 'সবুজপত্র'-এর দৃষ্টিভঙ্গি উচ্চারিত হয়েছে ।

'সাহিত্য' পত্রিকার মতো 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকাও 'সবুজপত্র'-এর বিরোধিতায় অগ্রসর হয়েছিল । 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকার হিন্দুয়ানী ও রক্ষণশীলতা এবং নব্যতন্ত্রীদের প্রতি আক্রমণের তীব্রতা 'সাহিত্য' অপেক্ষা অনেক বেশি । 'আর্য্যাবর্ত্ত'এর আক্রমণের ভাষাও স্থূল ও অরুচিকর । 'আর্য্যাবর্ত্ত' যেমন 'সবুজপত্র'র আন্তর্জাতিকতা ও মুক্ত চিন্তাকে সুনজরে দেখেনি, ঠিক তেমনই 'সবুজপত্র'র নতুন গদ্যরীতিকেও 'আর্য্যাবর্ত্ত' সমর্থন করেনি । এমনকি 'আর্য্যাবর্ত্ত'-এর ১৩২১ সনের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্ত্রীর প্রতি পত্র' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত ।'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিতে সনাতনপন্থী গোড়ামির বিরুদ্ধে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে সনাতনপন্থীদের পক্ষ থেকে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে চেয়েছেন লেখক । গল্পটি সম্পাদকেরই রচনা বলে অনুমান করা যায় । চিঠির প্রারম্ভেই 'সবুজপত্র'কে আক্রমণ করে লেখা হয়েছে—

'তোমার পত্র পাইলাম এবং সেই সঙ্গে সবুজপত্র নামে একখানি মাসিকপত্র পাইলাম। সবুজপত্রের কভার ভিন্ন সব পাতাগুলিই তো সাদা, তবে ইহার নাম সবুজপত্র কেন বুঝিলাম না।'

পত্রলেখিকা মৃণালিনী দেবী । পত্রলেখার কারণ—

'সবুজপত্রে স্ত্রী-র পত্র নামে একখানি পত্র বাহির হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিতে চাই। না বলিলেও চলিত, কিন্তু দেখিলাম পত্রখানিতে আমার নাম স্বাক্ষর রহিয়াছে ও আমার জীবনের কয়েকটি ঘটনার সহিত পত্রোল্লিখিত ঘটনার মিল আছে। .... দেখিলাম 'বাস্তব লেখক' (রবীন্দ্রনাথ) এই পত্রের প্রচারক। 'বাস্তব লেখক'-এর প্রশস্ত হস্ত হইতে দুই চারটি বাস্তব ঘটনার সহিত অবাস্তব পরিপূর্ণ এইরূপ পত্র বাহির হইয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। বাঁচা মানুষের নামে এমন জাল পত্র বাহির করাতে দুঃখিত হই নাই, কেবল হাসি পাইতেছে।'

'সবুজপত্র'-এর চলিত ভাষাকেও অপ্রাসঙ্গিকভাবে টেনে আনা হয়েছে এই গল্পে—

'এত কাল জন্মভূমি পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া কলিকাতায় বাস করিতেছি, কখনও গেলুম খেলুম বলি না তোমরা জানো। পূর্ববঙ্গের নরনারী—কথা ভাষাকে ও লেখ্য ভাষাকে এক করিতে একেবারে নারাজ। কলিকাতায় কথ্য ভাষায় ঝুড়ি ঝুড়ি পুস্তক লিখাতে আমাদের মত একটা প্রকান্ড দেশ হাতছাড়া হইয়া গেল।'

সমগ্র পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি, রবীন্দ্ররচনার প্রতি ও 'সবুজপত্র'-এর চলতি গদ্যরীতির উপর কটাক্ষ করা হয়েছে। সনাতনপন্থী মানসিকতারই নারীর স্বাধীন ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করতে চায়নি 'আর্য্যাবর্ত্ত'। 'সবুজপত্র'-এর আধুনিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রগতিশীলতা এবং তার চলিত ভাষারীতিকে 'আর্য্যাবর্ত্ত' নানা উপলক্ষে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে।

'আর্য্যাবর্ত্ত' যেমন 'সবুজপত্র'-এ প্রকাশিত যাবতীয় রচনাকেই অল্পবিস্তর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আহত করতে চেয়েছে, তেমনি 'নারায়ণ'ও 'সবুজপত্র' বিরোধিতায় সেই পন্থা অনুসরণ করেছে। বিপিনচন্দ্র পালের 'মৃণালের কথা' (অগ্রহায়ণ, ১৩২১), গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর 'দোসরা নম্বর' (শ্রাবণ, ১৩২৪) এবং যতীন্দ্রমোহন সিংহ রচিত 'একটি মামলার রায়' (আষাঢ়, ১৩২৪) গল্পগুলিতে 'সবুজপত্র'-এর প্রগতিশীল ভাবনার বিরোধিতাই অভিব্যক্ত।

'স্ত্রী-র পত্র'-এর নারীর স্বাধীন চিন্তা, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিবাদ স্পৃহাকে 'নারায়ণ' গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেনি। প্রথমাংশে 'ভগিনীর পত্র' মেজদাকে অর্থাৎ মৃণালের স্বামীকে লেখা তার বোনের চিঠি—এই পত্রে মৃণালের গৃহত্যাগ কোন সমস্যার পরিণতি হিসেবে আদৌ গণ্য করা হয়নি, বরং একে মৃণালের সাময়িক অভিমান হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে। 'দিনকতক যদি না ঘাঁটাও সে আপনি ফিরে আসবে।' এখানে উক্ত ভগিনী সনাতন হিন্দু রমণী, স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর গৃহত্যাগ তার কাছে অকল্পনীয়—কোন কারণে তার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে থাকতে পারে, নইলে কোন স্ত্রী হাজার অসম্মান গ্লানি বহন করেও স্বামীগৃহ ত্যাগ করে না।

দ্বিতীয়াংশে 'ঠাকুরপোর কথা' অর্থাৎ মৃণালের ননদের ঠাকুরপো নরেনের চিঠি। মৃণালের ওপর নজর রাখার জন্যই তাকে পুরীতে পাঠানো হয়েছে এবং আত্মপরিচয় গোপন রেখে মৃণালের পাশের বাড়ি সে ভাড়া নেয়। উভয়ের পরিচয় এবং দিদি ও ভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। নরেন তার বৌদিকে গোপনে মৃণাল সংক্রান্ত প্রতিদিনকার খবর পাঠায়। মৃণালের রোমান্টিক মনকে নিয়ে যথেষ্ট রঙ্গ ও ব্যঙ্গ করা হয় পত্রে। অপর দিকে মৃণালের ভাইয়ের বন্ধু জনৈক নব্য কবি নরেনের অসুখের সুযোগ নিয়ে মৃণালকে প্রেম নিবেদন করে এবং হঠাৎ সেখানে

নরেনের প্রবেশ ও উক্ত কবিকে উত্তম-মধ্যম পাদুকাপীড়ন করা হয়। মানসিক উত্তেজনায় মৃণাল অসুস্থ হয়ে পড়ে ও অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে, পতিগৃহে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে খবর আসে বিন্দুর আত্মহত্যার সংবাদ মিথ্যা। বিন্দু চিঠিতে মৃণালকে জানায়—'আমি এমন সুখে আছি মরিবার কোন সাধ নাই।' বিন্দু পতিগতপ্রাণা আদর্শ হিন্দুকুলবধূ—সে মৃণালকে পরামর্শ দেয় তার স্বামীর কাছে ফিরে যাবার জন্য। মৃণাল দ্বিধা সংকোচ দূরে ঠেলে স্বামীকে চিঠি দেয়—

'বড় সাধ হইয়াছে এবার যদি তুমি এ কলঙ্কিণীকে আবার চরণাশ্রয়ে স্থান দাও তবে তোমার মধ্যে, তোমার পরিবারের মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়ে এ নারী জন্মটা সার্থক করি। বিন্দি আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। সে নিঃশেষে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া সত্যকে পেয়েছে। আর আমি নিজেকে নষ্ট করতে বসে সত্যকে দেখেছি। তুমি আমাকে রাখ বা না রাখ বা ছাড়, যাই করনা কেন, আমি তোমার চিরদিনের চরণাশ্রিতা মৃণাল।'

গল্পটিতে শুধু প্রগতিপন্থার বিরূপতাই নয়, রবীন্দ্রনাথের লিখনশৈলী, তাঁর রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতিকেও এখানে কটাক্ষ করা হয়েছে।

গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরীর 'দোসরা নম্বর' রবীন্দ্রনাথের 'পয়লা নম্বর' গল্পের প্রতিবাদ। প্রাচীন কুসংস্কারের প্রতি অন্ধ আনুগত্যই এ গল্পে লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'সঙ্গীতের মুক্তি' (ভাদ্র, ১৩২৪) প্রবন্ধ ও তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বপতি রায়চৌধুরীর মত পার্থক্যের বিষযটি 'নারায়ণ' পত্রিকায়(ফাল্গুন, ১৩২৪) 'সঙ্গীতের মুক্তি বনাম বন্ধন' প্রবন্ধে শরৎচন্দ্র সিংহ আলোচনা করেছেন। বিষয়ের গভীরে প্রবেশ না করে তিনি প্রাচীনপন্থী মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন।

'মানসী' কিংবা 'মানসী ও মর্মবাণী' 'সবুজপত্র' বিরোধিতায় উৎসাহী না হলেও 'সবুজপত্র'-এর গদ্যরীতিকে এই পত্রিকাগুলি সমর্থন করতে পারেনি। তবে রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে 'মানসী'র বা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'ব কোনরকম বিরূপতা ছিল না। আলোচ্য পত্রিকাগুলি প্রগতিশীল না হলেও কোনরকম সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামিও ছিল না।

এছাড়াও সমকালীন 'যমুনা' পত্রিকাও সনাতনপন্থী পত্রিকাগুলির সঙ্গে 'সবুজপত্র'-এর বিরোধিতায় কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়েছিল। ১৩২৩ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত একটি মন্তব্যের মধ্যে 'সবুজপত্র' সম্পর্কে 'যমুনা'র মনোভাব ধরা পড়েছে—

'সবুজপত্রের এমন দশা হইল কেন ? যেন পোড়া পোড়া, তাঁবাটে তাঁবাটে, শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে না তো ?'

'ভারতবর্ষ'-এর মতো পত্রিকাও 'সবুজপত্র'-এর নব্য-ভাবনাকে সুনজরে দেখেনি। এছাড়া সাপ্তাহিক 'রাণাঘাট বার্তাবহ', 'উপাসনা' প্রভৃতি পত্রিকা বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করে 'সবুজপত্রের' পাতা মুড়িয়ে' খাবার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠেছিল।

'সবুজপত্র'-এর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্য-সাময়িকীব ক্ষেত্রে যে একটি পর্বান্তরের সূচনা করেছিল তার প্রমাণ 'সবুজপত্র'-কে বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার তীব্রতার মধ্যেই পাওয়া যায়। স্রোতের

বিপরীত পথে 'সবুজপত্র'কে অগ্রসর হতে হয় । তাই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় পদে পদে। 'সবুজপত্র'কে যে সমসাময়িক পত্রিকাগুলির এই প্রতিক্রিয়াশীল বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হবে, তার রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন । তাই 'সবুজপত্র'-র দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ হতেই প্রমথ চৌধুরীকে অগ্রিম সতর্ক করে বলেছিলেন—

> আমার তো বোধ হচ্ছে তোমার কাগজ এইরকমভাবে যদি বছরখানেক চলে, তাহলে বাংলা সাহিত্যকে নতুন শক্তি, গতি এবং রস দিতে পারবে । সবুজপত্রের উচিত হবে খুব একচোট গাল খাওয়া। সেইটেই একটা লক্ষণ যে, ওর কথাগুলো মর্মস্থানে গিয়ে লাগছে ।[২৮]

এই যে, রবীন্দ্রনাথ কথিত 'সবুজপত্র'-এর কথাগুলো মর্মস্থানে গিয়ে লাগা বা স্রোতের বিপরীত পথে 'সবুজপত্র'-এর যে হাঁটা অর্থাৎ 'সবুজপত্র'-এর এই যে প্রতিবাদধর্মিতা বা বিদ্রোহীচেতনা—এটিই সুধী সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । উক্ত বৈশিষ্ট্যেই 'সবুজপত্র'-কে তিনি বাংলার প্রথম 'লিটল ম্যাগাজিন' বলে চিহ্নিত করেছিলেন—

> 'সবুজপত্র' বাংলা ভাষার প্রথম লিটল ম্যাগাজিন ।...কিন্তু লিটল ম্যাগাজিন নামেই যখন প্রতিবাদ, তখন অন্তরেও নিশ্চয়ই তো থাকা চাই—আর সেটা শুধু একজন অধিনায়কেরও নয়, একটি সাহিত্যিকগোষ্ঠীর । 'সবুজপত্র'-এ এই লক্ষণ পুরোমাত্রায় বর্তে ছিল । তাতে বিদ্রোহ ছিলো, যুদ্ধঘোষণা ছিলো, সেই সঙ্গে ছিলো গোষ্ঠীগত সৌষম্য ।[২৯]

এই বিশ্লেষণেই 'সবুজপত্র'-এর সাহিত্য-আন্দোলনের স্বীকৃতিও লক্ষ্য করা যায় ।

বাংলা সাহিত্যে 'সবুজপত্র'-এর যে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য কিংবা 'সবুজপত্র'-এর যে সাহিত্য-আন্দোলন তা 'সবুজপত্র'-পরবর্তী পত্রিকাগুলির কাছে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছিল । পত্রিকার অঙ্গবিন্যাসের সুচারুতা এবং চিন্তাভাবনার আধুনিকতা উভয়ক্ষেত্রেই পরবর্তীকালের বিশিষ্ট পত্রিকাগুলি উৎসাহিত হয়েছিল । 'বিচিত্রা', 'পরিচয়', 'কবিতা' প্রভৃতি পত্রিকাগুলির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় 'কল্লোল'-এর সংস্কার মুক্তি অন্য ধরনের হলেও আত্মশক্তির প্রতি আস্থা, গতানুগতিকতার প্রতি অনাগ্রহ 'সবুজপত্র'-এর প্রেরণাজাত । বিশেষত 'পরিচয়' পত্রিকার আদর্শ, চিন্তা, রচনা নির্বাচন, আন্তর্জাতিকতা, মননের নিরপেক্ষতা এবং আঙ্গিকবিন্যাস সবই 'সবুজপত্র'-এর প্রভাবজাত । যদিও এ পত্রিকার উদ্যোক্তারা সকলেই সবুজপত্রী । সুধীন্দ্রনাথ, নীরেন্দ্রনাথ রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, হারীতকৃষ্ণ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ সবুজপত্রীরাই অগ্রণী হয়েছিলেন 'পরিচয়'-এর মতো উন্নত রুচির পত্রিকা প্রকাশে । বাঙালিত্ব বা ভারতীয়ত্বের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হবার প্রয়াস অবশ্যই 'সবুজপত্র'-র প্রেরণাজাত । 'সবুজপত্র মরে পরিচয়ে পরিণত'— এই অভিযোগের মূলে অনেকটাই সত্যতা আছে ।[৩০]

'কবিতা'র আঙ্গিকবিন্যাস, নতুন প্রতিভা আবিষ্কার এবং সর্বোপরি চিন্তাশক্তি এবং প্রকাশভঙ্গির নিজস্বতা 'সবুজপত্র'-এর কথা স্মরণ করায় । 'সবুজপত্র'-এর গদ্যরীতি সম্পর্কে 'কবিতা'ই নিরপেক্ষ চিন্তার পরিচয় দিয়েছে । 'সবুজপত্র'-র মতোই 'কবিতা' আন্তর্জাতিক সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল।

বাংলা গদ্যরীতির কর্ষণায় 'সবুজপত্র'-এর ভূমিকা বিস্ময়কর । তাছাড়া প্রমথ চৌধুরী

বা 'সবুজপত্র'-এর সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁরা যেমন পরবর্তীকালেও বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন, ঠিক তেমনি যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সবুজপত্রী নন তাঁদেরও মনোভঙ্গি ও রচনারীতির উপর 'সবুজপত্র'-এর প্রভাব যথেষ্ট ছিল। অন্নদাশংকর রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, সৈয়দ মুজতবা আলী, দিলীপকুমার রায় প্রমুখের মনোজগতে 'সবুজপত্র' যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বয়ং অন্নদাশংকর স্বীকার করেছেন—

> আমাকে আকর্ষণ করেছিল 'সবুজপত্রে'র লেখক বীরবলের তথা প্রমথ চৌধুরীর লিখনশৈলী। স্টাইলের জন্য আমাকে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে শিক্ষানবিশী করতে হয়েছে। তাঁর অজ্ঞাতে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা আর্ট সম্বন্ধে আমার যে ধারণা সে ধারণা আমি তাঁর কাছেই পেয়েছি।[৩২]

রম্যরচনার যে ধারাটি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক চর্চায় জনপ্রিয়তা লাভ করে সেই ধারাটিকেও 'সবুজপত্র' যথেষ্ট শিল্পমন্ডিত করে তুলতে পেরেছিল প্রমথ চৌধুরীর উৎসাহে ও প্রেরণায়। এস. ওয়াজেদ আলী, রঞ্জন, যাযাবর প্রমুখ লেখকের স্বচ্ছন্দ রচনা, তির্যক বাক্‌ভঙ্গিমা 'সবুজপত্র'-এরই আদর্শ অনুসরণের ফল।

বস্তুতপক্ষে প্রমথ চৌধুরী বা 'সবুজপত্র'-এর রচনারীতির প্রভাব আজ বাংলা গদ্যের সর্বশরীরে। প্রাক্-সবুজপত্র যুগের তুলনায় আজকের বাংলা গদ্য অনেক সংহত, প্রাঞ্জল, অনাড়ষ্ট, গতিশীল। 'সবুজপত্র'-র এই প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় দান বলে স্বীকৃত।

এইভাবে বৈদগ্ধমার্জিত, যুক্তিনির্ভর, রুচিশীল বুদ্ধির উদ্বোধনে ও অনর্থক জটিলতাকে বর্জন করে ভাষাকে তীক্ষ্ণ, পরিচ্ছন্ন, প্রাঞ্জল ও উজ্জ্বল এক চেহারা দেবার প্রয়াসে 'সবুজপত্র' যে সাহসী ভূমিকা পালন করেছে, সেজন্য বাংলা সাহিত্য সাময়িকীর ইতিহাসে তার বিশিষ্ট স্থান আছে। একটি দশক ব্যাপী 'সবুজপত্র' গোঁড়া রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চালিয়েছিল, তারই হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক স্তরে উত্তরণের পথে যাত্রা সহজতর হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের এই পালাবদলের নিয়ামকরূপে 'সবুজপত্র'-এর সাহিত্য-আন্দোলন তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়।

কল্লোলিত কল্লোল (১৯২৩)

'সবুজপত্র' পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে এল 'কল্লোল' (১৯২৩)। বিশ শতকের গোড়া থেকে নাগরিক জীবনের নানা সমস্যা—মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, বস্তিবাসী ও সমাজের অবহেলিত নানা শ্রেণীর জীবন সমস্যা ও অর্থনৈতিক সঙ্কটে বিধবস্ত সমাজজীবনের বাস্তবতা কল্লোল-পূর্ববর্তী পটভূমিতে প্রকট হলেও তৎকালীন সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকায় তা একান্তভাবে অনুপস্থিত ছিল। পূর্ববর্তী লেখকরা যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, প্রভাতকুমার প্রমুখের রচনায় সমসাময়িক বাস্তবতার চেয়েও বেশি পরিমাণে প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁদের সু-উচ্চ আদর্শবাদ। বস্তুতপক্ষে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণনীতি এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি, সর্বাত্মক হতাশা, নৈরাশ্য, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম, রুচি ও সাধ্যের নানা দ্বন্দ্ব তথা বিধবস্ত ও পরিবর্তিত এই সমাজজীবনের চিত্রই প্রতিফলিত হল 'কল্লোল'-এর রচনাবলীতে। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট কল্লোলযুগের গল্পকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন—

> যাকে বলে 'ম্যালডি অফ্ দি এজ' বা যুগের যন্ত্রণা তা কল্লোলের মুখে স্পষ্ট রেখায় উৎকীর্ণ।[১]

তাই বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখের কলমে বিধবার প্রেম ও বিবাহ, পণপ্রথা, শ্রমিকের দুরবস্থা, গণিকার জীবনকথা, শিক্ষিত বেকারের হতাশা, মধ্যবিত্তের জীবনযন্ত্রণা ও অর্থনৈতিক সঙ্কট, সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি সমস্যার কথা মুখর হয়ে উঠল। 'সবুজপত্র'-এর আভিজাত্যের পর 'কল্লোল' হয়ে গেল সাধারণ মানুষের জীবনের শরিক। এইভাবে দেখা গেল 'কল্লোল'-এর লেখকেরা সর্বপ্রথম সর্বস্তরে এক জীবনানুসন্ধিৎসা ও সহানুভূতি প্রকাশে সচেষ্ট হয়ে পূর্বসূরীদের প্রচলিত সাহিত্যাদর্শের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন সংগঠনে প্রয়াসী হলেন। এই আন্দোলন ছিল মূলত পূর্বতন আদর্শবাদের বিরুদ্ধে প্রখর বাস্তবতার আনয়নে, নর-নারীর যৌন সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাব ও শুচিতাবোধের বিপরীতে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের আলোকে যৌন বাস্তবতার প্রকাশে, কথাসাহিত্যে সমাজের অবজ্ঞাত,নগন্য মানুষের সরব আবির্ভাবে, সামাজিক ও পারিবারিক চেতনা ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ব্যক্তিচেতনার স্বাধিকারের প্রতিষ্ঠায় এবং রবীন্দ্রপ্রভাবকে অস্বীকার করে স্বকীয়তা আনবার প্রয়াসে। বিশিষ্ট সমালোচক অধ্যাপক জীবেন্দ্র সিংহরায়ের মতে—

> বিদ্রোহ কল্লোল পত্রিকা ও কল্লোল গোষ্ঠীর প্রজাতিক লক্ষণ সেই বিদ্রোহ বিচিত্র বিষয়ে, বিচিত্র ভঙ্গিমায়।[২]

কল্লোল-গোষ্ঠীর আন্দোলন সম্পর্কে দু-চার কথা বলার আগে 'কল্লোল' পত্রিকা সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া যাক। বৃক্ষ যখন জন্ম নিল তখন নিশ্চয়ই তার বীজও ছিল। আর এই বীজ হিসাবে নাম করতে হয় 'ফোর আর্টস ক্লাব'-এর (১৯২১)। সুধী সমালোচকের কথায়—

কল্লোলের অগ্রদূত ফোর আর্টস ক্লাব ।[৩]

দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগ প্রতিষ্ঠিত 'ফোর আর্টস ক্লাব' চর্চিত চতুষ্কলা সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প এবং কারুশিল্প-র মধ্যে মুখ্য কলা ছিল সাহিত্য । এই ক্লাবের সাহিত্য বিভাগ থেকে উদ্যোক্তাদের একটি পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা ছিল । মাত্র দুবছরের মধ্যে ক্লাবটি বন্ধ হয়ে গেলেও পত্রিকা বের করার পরিকল্পনায় তাদের উৎসাহ অটুট ছিল । কিন্তু কোথায় লেখা, কোথায় অর্থ, কোথায় কি—তার কিছুই ঠিক নেই । এমতাবস্থায় ১৩২৯ সালের চৈত্র সংক্রান্তির দিন হ্যান্ডবিল বিলি করা হয়; আর ১৩৩০ সালের ১ বৈশাখ, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কল্লোল' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে । যে নির্বোধ জীবনচর্চা, জীবনবন্দনা, অন্তহীন পথ চলার আবেগ, নানামুখী চিন্তা ও অনুভূতির উষ্ণ রক্তপ্রবাহ, সাহসিক দৃষ্টির দিশাসন্ধান, নব্যরুচির সজীব হাওয়া 'কল্লোল'-এর কালে উদ্বেলিত হয়েছিল চতুষ্কলা সমিতিতে তার প্রথম সাড়া জেগেছিল। 'কল্লোল' নামকরণটি সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ প্রদত্ত । সহ-সম্পাদক ছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ । আশ্চর্যের বিষয় 'কল্লোল'-এর প্রথম সংখ্যায় কোনো পত্রসূচনা, মুখপত্র, ভূমিকা, সম্পাদকীয় নিবেদন ছিল না । প্রথমাবস্থাতে তাই পত্রিকাটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা আমরা পাই না । বিশিষ্ট সমালোচকের মতে—

কল্লোল ছিল দুজন স্বপ্নাভিলাষী সাহিত্যনবিশের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা মাত্র ।[৪]

অনেকটা যেন আকস্মিকভাবেই আবির্ভূত হল এই পত্রিকা ।

'কল্লোল'-এ প্রকাশিত সমস্ত রচনা, সম্পাদকীয় মন্তব্য, বিজ্ঞাপন, নানা বিভাগের উল্লেখ, 'কল্লোল'-এর নব নির্মিত কায়া প্রভৃতির মধ্যে উদঘাটিত হয়েছে 'কল্লোল'-এর মূল বক্তব্য । পত্রিকা পরিবেশক এবং সাহিত্য গোষ্ঠীর যেসব মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তাতে আলাদাভাবে ঘোষণা-পত্রের উল্লেখ না থাকলেও সেখানেই ব্যক্ত হয়েছে পত্রিকাটির আদর্শ, উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য এবং গোষ্ঠীচেতনা ।

মাসিক পত্রিকা 'কল্লোল'-এর প্রথম সংখ্যার (বৈশাখ, ১৩৩০) প্রথম রচনা দীনেশরঞ্জন দাশের 'কল্লোল' শীর্ষক কবিতা । কবি লিখেছেন—

আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা নিশিদিন,
অজানা জানার নয়নের বারি
নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি ফিরে আসি নিশিদিন ।

এই সমুদ্রের কলরোলের মধ্যে কবি শুনেছেন সৃষ্টির প্রথম যুগ থেকে ভেসে আসা মানুষের কান্নার প্রতিধ্বনি—সে কান্না দুঃখের, সে কান্না রোষের । তাই মানুষের চিরন্তন দুঃখ দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন—

জানি এই ধ্বনি জনমে মরণে হবে না'ক তার সারা,
যাবে না শুকায়ে সাগরের বুক
যাবে না ঘুচিয়া মানুষের দুখ
তবু নিরুপায় কেঁদে দিন যায়, আমি যে বাক্যহারা ।

কল্লোল

১৩৩০ | বৈশাখ | ১ম সংখ্যা

কল্লোল

আমি কল্লোল শুধু কলরোল ঘুমহারা দিশাহীন,
অজানা জানার নয়নের বারি
নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি' ফিরে আসি নিশিদিন।

মনে নাই মোর কোন্ আদিকালে কে দিল এমন ধারা!
মোর নীল জলে কোন্ গতিহীন
ঝাঁপ দিল আসি কবে, কোন্ দিন?
চিরদিন তরে জাগাইল এই বিপুল স্রোতের কান্না!

জানি এই ধ্বনি জনমে মরণে হবে না'ক তার সারা
যাবে না শুকায়ে সাগরের বুক
যাবে না ঘুচিয়া মানুষের দুখ
তবু নিষ্ফল কেঁদে দিন যায়, আমি যে বাক্যহারা!

আশা আছে তবু যদি কোন দিন শত শত যুগ পরে
বধির শিলার ফেটে যায় বুক
গুঁড়াইয়া যায় তার নিচু মুখ,
জল-কল্লোল তুমি উতরোল বক্ষ তাহার ভরে!

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কল্লোল পত্রিকার একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

কবি বাক্যহারা হলেও পত্রিকা সম্পাদক আশা করেছেন 'কল্লোল'-এ ব্যক্ত হবে নিঃস্ব রিক্ত মানুষের দারিদ্র্যভরা জীবন। এতই প্রেক্ষাপটে তিনি লিখেছেন—

আশা আছে তবু যদি কোনো দিন শত শত যুগ পরে
বধির শিলার ফেটে যায় বুক
গুঁড়াইয়া যায় তার নিজ সুখ
জল-কল্লোল তুলি ভীমরোল বক্ষ তাহার ভরে!

'কল্লোল'-এর মুখবন্ধ হিসেবে কবিতাটিকে ধরে নিলে এর মধ্যেই ব্যক্ত হয়েছে পত্রিকার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য। এছাড়া পরবর্তী সময়ে অন্যান্য সংখ্যায় বিবৃত হয়েছে 'কল্লোল'-এর উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। এইভাবে অনেকটা যেন আকস্মিকভাবেই 'কল্লোল'-এর জন্ম হল। অনাড়ম্বর সেই জন্মের ইতিহাস। সাত বছর পরমায়ু নিয়ে পত্রিকাটি অভূতপূর্ব আলোড়ন তুলেছিল বাংলাদেশে।

বিষয়ানুসারে 'কল্লোল'-এর বিভিন্ন বিভাগ ছিল: সংগ্রহ (সুভাষিত সংগ্রহ), সমাচার, আলোচনা, অন্যান্য পরিচয় লিপি, ছবি, ডাকঘর, প্রবাদ, কাহিনী ইত্যাদি বিভাগ।

'সংগ্রহ' নামক বিভাগে থাকত গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি থেকে নির্বাচিত ও উদ্ধৃত সুভাষিতবলী। উদ্ধৃত অংশের নিচে সাধারণত লেখার নাম থাকত, লেখকের নাম নয়।

'সমাচার' বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল দেশ-বিদেশের খবরাখবর পরিবেশন করা। কিন্তু শেষের দিকে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার পরিচয়ের মধ্যেই উক্ত বিভাগ সীমাবদ্ধ থাকায় এর উদ্দেশ্য অনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।

'কল্লোল'-এর একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ ছিল 'আলোচনা'। এই বিভাগে বিভিন্ন পুস্তক, পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে নানা ধরনের চিন্তা ও মতামত থাকত। 'পরিচয় লিপি' বিভাগে লেখক-লেখিকাদের রচনার একটি বিশেষ ভাব উপস্থাপিত করা হত। এটিই ছিল এর অন্যতম প্রধান কাজ। একটু সহজ করে বলা যেতে পারে, লেখক বা লেখিকার লেখার স্টাইল সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হত।

'ছবি' বিভাগে ছবির বিষয় সংগ্রহ করে শিল্পকৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা এবং শিল্পীদের পরিচয় করানই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

'কল্লোল'-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ 'ডাকঘর'। কল্লোলের তৃতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা থেকে পূর্ববর্তী সমস্ত বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব না রেখে তার পরিবর্তে সমস্ত বিভাগের একত্রীকরণ করা হল 'ডাকঘর' নামক বিভাগে। এই বিভাগে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার আলোচনা, সংবাদ পরিক্রমা, চিত্তরঞ্জন স্মৃতিতর্পণ, গোকুল নাগ, রঁলা, জাঁ ক্রিসতফের অনুবাদ, সাহিত্য সম্মেলনের নানা কথা, সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হত। এছাড়াও কোথাও কোথাও পৃথকভাবে পুস্তক-পরিচয় এই বিভাগের অস্তিত্ব সত্ত্বেও প্রদত্ত হয়েছে। 'ডাকঘর' বিভাগের পরিবর্তে' প্রবাহ নামে যে বিভাগটি খোলা হয় তাতে ডাকঘরের মতো বিচিত্র প্রসঙ্গের অবতারণা করতে আর দেখা যায় না।

'কাহিনী' নামক বিভাগে রয়েছে দেশ-বিদেশের সাহিত্যিকদের পরিচয়। বিদেশী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে এই বিভাগের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তবে বিভাগটির ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব একটি আক্ষেপের বিষয়।

'কল্লোল'-এর উল্লেখিত বিজ্ঞাপন ও বিভাগগুলির মধ্যে পত্রিকা সম্পাদক ও পৃষ্ঠপোষকদের দেশি ও বিদেশি সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ ও মতামত, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা, বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, শিল্পের মান উন্নয়নের জন্য উৎসাহ যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাতে 'কল্লোল' পত্রিকাটি সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

'কল্লোল'-এর মনোভাব, আদর্শ ও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গেলে কেবলমাত্র এই বিভাগগুলির বা বিজ্ঞাপন প্রকাশের মধ্যে অনুসন্ধান করলে হবে না। বরং এ ব্যাপারে 'কল্লোল'-এর সপ্তবর্ষের লেখক ও বিষয়সূচী পর্যালোচনা ও শ্রেণীবিভাগ করা নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ 'কল্লোল'-এর প্রকৃত পরিচয় 'কল্লোল'-এর প্রকাশিত সাহিত্যকর্মে। 'কল্লোল'-এর গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, গান, অনুবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন বিচিত্র বিষয় প্রকাশিত হত।

পত্রিকাটি প্রথমে গল্প মাসিকরূপে আত্মপ্রকাশ করলেও কবিতার জন্য সব সময়ে তার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতাটিই হচ্ছে দীনেশরঞ্জন লিখিত 'কল্লোল' নামক কবিতা। সপ্তবর্ষীয় 'কল্লোল'-এর প্রতি প্রথম সংখ্যার অঙ্কেই একাধিক কবিতা স্থান পেয়েছে মাত্র তিনটি সংখ্যায় কবিতা প্রকাশিত হয়নি। সংখ্যা তিনটি হল—১৩৩১-এর আশ্বিন, ৬ষ্ঠ সংখ্যা; ১৩৩৪-এর কার্তিক, ৭ম সংখ্যা এবং ১৩৩৫-এর কার্তিক, ৭ম সংখ্যা। তবে শুধুমাত্র কবিতা নিয়ে কোন বিভাগ আত্মপ্রকাশ করেনি। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে 'কল্লোল'-এ গল্পের পরেই স্থান ছিল কবিতার। কবিতাগুলি বিভিন্ন মাপের গীতিকবিতা। 'কল্লোল'-এর কবিরা হলেন—দীনেশরঞ্জন দাশ, কালিদাস নাগ (দীপঙ্কর), নজরুল ইসলাম, জীবনময় রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, গিরিজাকুমার বসু, সুধীরকুমার চৌধুরী, বনফুল, সুনীতিদেবী, রবীন্দ্রনাথ, সুবোধ রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, সুরেশচন্দ্র ঘটক, জসীমউদ্দীন, হেমেন্দ্রকুমার রায়, নলিনীকান্ত সরকার, নরেন্দ্র দেব, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, জগৎবন্ধু মিত্র, গোপাললাল দে, অজিতকুমার দত্ত, হুমায়ুন কবীর, প্রিয়ম্বদা দেবী, হেমচন্দ্র বাগচী, জীবনানন্দ দাশ, রাধারাণী চক্রবর্তী, সুনির্ম্মল বসু, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রলাল রায়, আবদুল কাদের, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী (দত্ত), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সরকার, কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়, ভবানী ভট্টাচার্য, অন্নদাশঙ্কর রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, বন্দে আলী মিয়া, মনোজ বসু প্রমুখ।

কবিতা ছাড়া গানও ছাপা হয়েছে 'কল্লোল'-এর পৃষ্ঠায়। রচয়িতারা হলেন—নজরুল ইসলাম, অতুলপ্রসাদ সেন, চিত্তরঞ্জন দাশ, নিরুপমা দেবী, বিশ্বপতি চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কল্যাণী ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ, জসীমউদ্দীন, আবদুল কাদের প্রমুখ। প্রকাশিত কবিতাগুলির মধ্যে

অনুবাদ কবিতাও আছে— অবনীন্দ্রনাথের খাসিয়া গান, তারাকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ইংরেজী কবিতার অনুবাদ (মূল : হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়), সারদাচরণ রায় (মূল : সংস্কৃত) ও অজিতকুমার দত্তের (মূল : পুশকিন) অনুবাদ কবিতা।

'কল্লোল'-এর প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত গল্প সংখ্যায় প্রচুর। এমনকি শুধুমাত্র গল্প নিয়েই 'কল্লোল'-এর কোনো সংখ্যাকে আত্মপ্রকাশ করতেও দেখা যায়। যেমন, ১৩৩১-এর আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৩৪-এর কার্তিক সংখ্যা। 'কল্লোল' নিয়ে যে তুমুল আলোড়ন শুরু হয় তা মুখ্যত গল্প নিয়ে, কবিতা নিয়ে সে তুলনায় আলোড়ন কম হয়েছে। পত্রিকাটিতে প্রকাশিত গল্প বা উপন্যাস দুই শ্রেণীর— মৌলিক ও অনূদিত। মৌলিক গল্পের লেখকরা হচ্ছেন— সুনীতিদেবী, কেতকীদেবী, দীনেশরঞ্জন, শৈলজারঞ্জন, রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সান্ত্বনা বসাক, সুশীলকুমার রায়, গোকুলচন্দ্র নাগ, কৃষ্ণধন দে, নৃসিংহদাসী দেবী, অহল্যা গুপ্ত, ভূপতি চৌধুরী, সুরুচিবালা রায়, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, রামকান্ত সামন্ত, সুকুমার ভাদুড়ী, প্রবোধ সান্যাল, প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত, সুবোধ রায়, রবীন্দ্রলাল রায়, অনিল ভট্টাচার্য, সোমনাথ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমারী দেবী, মিনতি দেবী, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ আচার্য চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নীলিমা বসু, মুরলীধর বসু, বিজয় সেনগুপ্ত, সুধাংশুবিকাশ রায়চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রমথনাথ বিশী, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, বেণুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধা দাশগুপ্ত, সুষমা মুখোপাধ্যায়, শান্তাদেবী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ রায়, শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী (দত্ত), রবীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, মনীশ ঘটক(যুবনাশ্ব), শৈলবালা ঘোষজায়া, রমেশচন্দ্র দাশ, প্রফুল্লকুমার রায়চৌধুরী, দেবীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার রায়, পবিত্র গঙ্গো-পাধ্যায়, জলধর সেন, বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, পঞ্চানন ঘোষাল, তারানাথ রায়, গিরিজাকুমার বসু, প্রভাবতীদেবী সরস্বতী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ঘোষ, সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বিমলা দেবী, সত্যভূষণ সেন, প্রীতি সেন, হরিপদ গুহ, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, মায়া বসু, বুদ্ধদেব বসু, অদিতিদেবী, উমা মিত্র, অখিল নিয়োগী, শশিভূষণ পাল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরমাদেবী, নিরুপমাদেবী, পঞ্চানন মজুমদার, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাংকুর আতর্থী, পরিমল গোস্বামী, তারানাথ রায়, অনিন্দিতাদেবী, ভবানী ভট্টাচার্য, পান্নালাল অধিকারী, তারাশঙ্ক র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কিশোরীমোহন ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রনাথ মজুমদার, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সুশীলকুমার ধর, ফণীন্দ্র পাল, তারা মুখোপাধ্যায়, প্রণব রায়, রবীন্দ্রনাথ সেন, দেবকী বসু, বিষ্ণু দে, কল্যাণী পাল প্রমুখ। এছাড়া পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার ভাদুড়ী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন আচার্য প্রমুখ লেখকের অনুবাদ গল্পও 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হয়েছে।

'কল্লোল'-এ এগারোটি মৌলিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়— গোকুলচন্দ্র নাগের 'পথিক', হরিপদ বসুর 'ঘাটের কথা', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'পান্থবীণা' ও 'ডাকপিওন', সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্মৃতির আলো', সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'রূপছায়া', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

'বেদে', দীনেশরঞ্জন দাশের 'দীপক' ও অসমাপ্ত 'রাতের বাসা', নরেন্দ্র দেবের 'জাদুগর' এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মিছিল'। অনুবাদ উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল দুটি—কালিদাস নাগ, গোকুলচন্দ্র নাগ ও শান্তাদেবী অনূদিত রমাঁ রলাঁর 'জাঁ ক্রিসতফ' এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অনূদিত ন্যুট হামসুনের 'মীনকেতন'।

দীনেশরঞ্জন ও গোকুলচন্দ্র উভয়েই নাট্যকলার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তাঁরা দুজনেই শখের অভিনয় অংশগ্রহণ করতেন। নাট্যশিল্প ও চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, ভাবতে অবাক লাগে, 'কল্লোল'-এ কোন পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রকাশিত হয়নি। একাঙ্ক নাটকই যে বাংলার নাট্যশিল্পের ভবিষ্যৎ একথা বোধহয় তারা বুঝতে পেরেছিলেন। কয়েকটি নাটিকা বা একাঙ্কিকা 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'মুক্তি' ও 'কেয়ার কাঁটা', মনীশ ঘটকের 'পটলডাঙার পাঁচালী', হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'অকাজের বাঁশী', মন্মথ রায়ের 'চরকা', 'মাতৃ-মূর্তি' ইত্যাদি।

গদ্য-নিবন্ধ 'কল্লোল'-এর বিশেষ অনুশীলনের বিষয় ছিল বলে মনে হয় না। প্রথম দিকে সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশের কোন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। দেখা যায় না প্রবীণ অভিজ্ঞ প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধ কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই অভাব কিছুটা দূর হয়েছিল। 'সবুজপত্র'-এর যুগে একদল প্রাবন্ধিকের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা নিজেদের মতো করে চিন্তা ও বিচার করতে পারতেন, তাঁদের বলার বিষয় হাল্কা ছিল না, কিন্তু বলার ধরনটা ছিল হাল্কা। তাঁদের কয়েকজনকে 'কল্লোল'-এর আসরে দেখতে পাই—প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায় ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। নতুন প্রাবন্ধিকেরা হচ্ছেন—কালিদাস নাগ, কাজী আবদুল ওদুদ, দীনেশরঞ্জন দাশ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জসীমউদ্দীন, বুদ্ধদেব বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, মনীশ ঘটক, নীহাররঞ্জন রায়, অমলেন্দু বসু, ভবানী ভট্টাচার্য, হুমায়ুন কবীর, মহেন্দ্রচন্দ্র রায়, শান্তাদেবী, বিষ্ণু দে, অন্নদাশঙ্কর রায়, আবদুল কাদের, হেমচন্দ্র বাগচী, সুরেশচন্দ্র নন্দী, সত্যানন্দ রায়, জগৎবন্ধু মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, সত্যেন্দ্র দাস, গিরিজাকুমার মুখোপাধ্যায়, অভিনব গুপ্ত, বিজনবিহারী বসু। প্রবীণদের মধ্যে পাই মাত্র কয়েকজনকে—বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও পৃথ্বী সিং নাহার। আর ছিলেন বাংলা গদ্যের চিরকালের যাদুকর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁদের রচনা প্রায় সবই মৌলিক।

'কল্লোল'-এ বিভিন্ন শিল্পীর ছবিও ছাপা হত। যেমন, তরুণ শিল্পী যামিনী রায়ের 'শীতার্ত মা ও ছেলের ছবি', 'জপের ঝুলি হাতে বৃদ্ধের ছবি', দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর আঁকা 'পাহাড়ী যুবতীর ছবি' (কার্তিক, ১৩৩১), 'অতীতের প্রহরী' (বৈশাখ, ১৩৩৪), দীনেশরঞ্জনের আঁকা রঙীন ছবি 'বিষ ও বাঁশী' (১৩৩৫-এর কার্তিক সংখ্যা), সুধাংশু চৌধুরীর 'জীবন ও মৃত্যু' শীর্ষক ছবি (বৈশাখ, ১৩৩৬), ললিতমোহন সেনের 'বীণাবাদিনী' চিত্র (ভাদ্র, ১৩৩৬)। তাছাড়া মৃন্ময় মূর্তি 'আলো ও ছায়া' (ভাদ্র, ১৩৩৫), 'তাজমহল' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬), 'প্রজ্ঞাপারমিতা' (আশ্বিন, ১৩৩৬), 'দিনের শেষে' (আশ্বিন, ১৩৩৬), 'কবি ফেরদৌসী' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪),

'বিস্ময়' (পৌষ, ১৩৩৫) ও 'ওমর খৈয়ম'-এর (আষাঢ়, ১৩৩৬) চিত্রও মুদ্রিত হয় । 'কল্লোল'-এ প্রচারিত চিত্রকলা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলার কথা এই যে, পরবর্তীকালের বাংলাদেশের গৌরব যামিনী রায় ও দেবীপ্রসাদের শিল্প প্রতিভার বিশেষ সমাদর এখানেই প্রথম হয়েছিল । সেদিক থেকে পত্রিকাটির একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রাপ্য ।

কিছু কিছু রঙিন ছবি ও অনেকগুলি ফোটোর চিত্র ছাড়া 'কল্লোল'-এ আর যা ছাপা হয় তা হচ্ছে ব্যঙ্গচিত্র । দীনেশরঞ্জন ছিলেন এক নতুন পদ্ধতির ব্যঙ্গচিত্রের প্রবর্তক এবং সেগুলি পাঠক সমাজে খুবই সমাদৃত হয়েছিল । সাদায় কালোয় মুদ্রিত এই ধরনের কিছু ছবি 'কল্লোল'-এর প্রথম দিকে মুদ্রিত হয় । যেমন—'রাত পোহাল শুনছি সখি' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০), 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে' (আষাঢ়, ১৩৩০), 'আবার তোরা মানুষ হ' (শ্রাবণ, ১৩৩০), 'আমার দেশ' (ভাদ্র, ১৩৩০), 'বাজারেতে দাম মেলে না' (কার্তিক, ১৩৩০), 'তুমি যে সুরের আগুন' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), 'জীবন' (পৌষ, ১৩৩০) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের উত্তরযুগ থেকেই রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালি, বিশেষভাবে যুবসমাজ ক্রমশ এক হতাশা, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা এবং সব মিলিয়ে প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় বিহ্বল হয়ে পড়ে । প্রখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

> বাঙালির মানসিক জগতে স্বদেশী আন্দোলন একটি চিহ্ন, ইহাকে বলা যায় বাঙালির সংস্কৃতির water shed —ইহার দুই দিকে সংস্কৃতির দুই বিভিন্ন মূর্তি একদিকে আশা, অন্যদিকে আশাভঙ্গ; একদিকে উদ্যম, অন্যদিকে অবসাদ; একদিকে আত্মপ্রত্যয়, অন্যদিকে আত্মঅনাস্থা...।[৫]

বাঙালি যুবসমাজের এই অনিশ্চয়তা ও নৈরাশ্যবোধকে তীব্রতর করেছিল দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দুরবস্থা ।

কল্লোল-গোষ্ঠীর অধিকাংশ লেখক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি হওয়ায় তাদের মানসচেতনায় সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনের প্রভাব সর্বাপেক্ষা গভীর ও বিস্তৃত হয়েছিল । দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তীকালে অর্থনৈতিক সঙ্কটের প্রাবল্যহেতু মধ্যবিত্ত সমাজে শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকরির সুযোগ কমে যেতে লাগল । অর্থ উপার্জনের প্রয়াসে শিক্ষিত যুবক সামান্য কেরানীর চাকরিও যোগাড় করতে না পারার ফলে তার হতাশা ও পারিবারিক অশান্তি ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগল । সর্বোপরি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ফলে মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক জীবন ক্রমশই সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে উঠল । এই আর্থিক দুর্গতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আলোচনাটি প্রণিধানযোগ্য—

> য়ুরোপীয় মহাসমরে (১৯১৪-১৯১৮) পৃথিবীর সর্বত্র দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকেদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল । ভারতবর্ষ ধনী দেশ অর্থাৎ গত একশত বৎসরে ব্রিটিশ শাসন-শোষণ নীতির ফলে ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য কাঁচামাল উৎপন্ন ও সরবরাহ করিয়া আসিতেছে ও বিদেশে প্রস্তুত শিল্পজাত নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয় করিতেছে । যুদ্ধের জন্য বিদেশী জাহাজ পাওয়া যায় না, রেলপথ কমিয়াছে, ফলে বিদেশে মালের চাহিদার

অভাবে রপ্তানিযোগ্য কাঁচামালের দর নাই। আবার আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কারণে বিদেশী শিল্পজাত সামগ্রীর মূল্য অসম্ভব চড়া। তখনও ভারত বিলাতী বস্ত্রের মুখাপেক্ষী। কিন্তু মিলগুলি যুদ্ধ উপকরণের বস্ত্রাদি বয়নে ব্যস্ত, বাঙালীর পরিধেয় ধুতি-শাড়ী বয়ন করিবার সময় নাই।...দুর্মূল্যতার মূলে যে একটা আন্তর্জাতিক যোগাযোগের সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না।[৬]

এই পটভূমিকায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যেসব শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করেছিল, তার দ্বারা একদিকে যেমন জীবিকা অর্জনের পথ দেখা যাচ্ছিল না, তেমনি যে সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছিল, তারও ধ্বংস অনিবার্য দেখে হতাশ হয়ে পড়েছিল। এই মুহূর্তের অনুভবটি বুদ্ধদেব বসুর লেখনীতে স্মরণীয় হয়ে আছে—

বাহ্যিক অবস্থার ওলট-পালট হলে চিন্তাজগতেও কিছু না কিছু বিপ্লব আসতে বাধ্য। বর্তমান বাঙালীর চিন্তাধারার বর্ণনা করতে গেলে এককথায় বলা যেতে পারে, তাদের সম্পূর্ণ disillusionment এসে গেছে। আমরা মোটের ওপর অনেক বেশী rational হয়েছি। অন্ধ ভক্তির ওপর আর আমাদের আস্থা নেই; আমরা বিশ্বাস করতে শিখেছি বিজ্ঞানকে। ভগবান, ভূত ও ভালবাসা—এ তিনটি জিনিসের ওপর আমাদের প্রাক্তন বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।[৭]

কৈশোর যৌবনের স্বপ্ন আশা অনেক কিছুই একে একে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এই পর্বের ঘটনাস্রোতের কঠিন আঘাতে। এমনি করে একদিকে তাঁরা জীবনের প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশ্বাস হারিয়েছে, নেতিবাচক সংশয়বোধে ভরে গেছে তাদের মন, তারা বিদ্রোহীর মতো মাঝে মাঝে ভেঙে ফেলতে চেয়েছে যা কিছু পুরনো সব। অন্যদিকে আবার উদ্‌ভ্রান্ত বিহ্বলতায় রোমান্টিকের মতো সম্মুখের অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। হয়ত ঠিক নির্দিষ্ট কোন কিছুর নিশ্চিত প্রত্যাশায় নয়, যৌবনের স্বাভাবিক বিশ্বাসপ্রবণতার প্রেরণায়। এমনই এক কালের সামাজিক পটভূমিতে 'কল্লোল'-এর লেখকবৃন্দ সাহিত্যের আসরে এসেছিলেন। 'কল্লোল'-এ অঙ্কিত বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে কেরানী, শিক্ষক, সাহিত্যিক, পোস্টমাস্টার, হিসাবরক্ষক প্রভৃতির জীবনকথা যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, বিশিষ্ট কল্লোলীয় লেখক বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়—

তার জন্য বর্তমান জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পূর্ণ দায়ী। এ হচ্ছে টাইম-স্পিরিট বা যুগধর্মের ফল।[৮]

তাই দেখা যায় তৎকালীন মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভয়াবহ আর্থিক জীবনের রূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সুকুমার ভাদুড়ী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল প্রমুখের কথাসাহিত্যে।

সুকুমার ভাদুড়ী তাঁর 'ঝাপট' (কার্তিক, ১৩৩১) গল্পে তিরিশ টাকা মাইনের কেরানীর শোচনীয় সাংসারিক অবস্থার চিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন। এই কেরানীর স্ত্রী যক্ষ্মা রোগগ্রস্তা ও পাঁচ বছরের ছেলেটি কালাজ্বরে আক্রান্ত। চিকিৎসা করাতে গিয়ে সে সর্বস্ব হারিয়েছে। এমতাবস্থায় যখন চিকিৎসা করবার বিন্দুমাত্র সামর্থ্য তার আর নেই তখন সে আত্মহত্যার কথা ভেবেছে। এটিই তার সংকট থেকে পরিত্রাণের পথ। মধ্যবিত্ত সমাজের আর্থিক ভাঙনের বাস্তব সমীক্ষা ও

নিখুঁত রূপায়ণের লেখক যথার্থই প্রশংসার দাবি করতে পারেন ।

মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সংকটের তীব্র রূপ তথা গোটা মধ্যবিত্ত সমাজের সার্বিক অবক্ষয় খুব স্পষ্টভাবে সরোজকুমার রায়চৌধুরী তাঁর 'দুনিয়াদারি' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫) গল্পে অঙ্কন করেছেন । এই গল্পে বি. এ. পাশ বেকার রঙ্গলালের জীবনের যন্ত্রণা ও অনিশ্চয়তা যেমন উন্মোচিত, তেমনি সেই যুবকের চাকরি প্রাপ্তির পর জীবনে হতাশা ও নিঃসঙ্গতাও প্রকাশিত । গল্পকার এখানে কেরাণীকূলের বাস্তব জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা এবং বৈচিত্র্যহীন, বিশেষত্বহীন জীবনের আলেখ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন । রঙ্গলাল ও তার বৌদির কথাবার্তার মধ্য দিয়ে গল্পকার কেরানীর দাম্পত্য জীবনেরও এক বড় বাস্তব দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । রঙ্গলালের কাছ থেকে হতভাগ্য কেরানী দলের প্রকৃত অবস্থার পরিচয় পেয়ে বৌদি বললেন— 'তোমার বিয়ে নাকি ঠিক হয়ে গেছে ...... এর পরেও কি বিয়ে করবে ? রঙ্গ হাসিয়া বলিল— কেন করব না বৌদি, কেরানীর কি কামনা থাকতে নেই ?'

কেরানীর কামনা তার স্বল্প আয়ের দ্বারা চরিতার্থ করা যে কিভাবে সম্ভব এবং সেই সম্ভাব্যতার প্রশ্নেই নেমে আসে যে অনিশ্চয়তা, এই গল্পের শেষাংশে গল্পকার তাও তুলে ধরতে চেয়েছেন ।

এ প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংক্রান্তি' (শ্রাবণ, ১৩৩১) গল্প ও 'মিছিল' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫-আষাঢ়, ১৩৩৬) উপন্যাসের বেকার যুবকদের এক ভয়াবহ বাস্তব জীবনচিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । এক কপর্দকশূন্য, দুঃস্থ, নৈরাশ্যপীড়িত যুবকের আত্মহত্যা হল 'সংক্রান্তি' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় । মেসে বসবাসরত এক যুবক দর্জিকে পাঞ্জাবি বানানর টাকা শোধ করতে পারে না । অপরপক্ষে তার মা দেশ থেকে তার বোনের অসুস্থতা ও তার ভগ্নিপতির মৃত্যুসংবাদ দিয়ে চিঠি লেখেন । এই যুবকের জীবনকে যখন চারিদিকের নানা আঘাত অপমান দারিদ্রের তীব্র অসহনীয় জ্বালা ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে, তখন সে ভাবছে—

'তার শেষের সঙ্গীরা, তার যৌবনের প্রিয়া, আর দুঃখী মা, তার অসহায় বিধবা বোন, যে কেউ তাকে একদিনের জন্যও ভালোবেসেছে বা স্নেহ দিয়েছে সবাইকে প্রীতি নিবেদন করে যদি সে শান্ত অবিচলিত মনে সংসার থেকে বিদায় নিতে পারে ।'

তাই বাধ্য হয়ে সে আফিং কিনে আত্মহত্যার পথে পা বাড়াল । যখন তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে তখনও আবার তার বাঁচতে ইচ্ছে হল । শিথিল দুর্বল হাতে সে ডাক্তারের দরজায় আঘাত করল । কিন্তু সে ডাক বোধহয় পৌঁছল না । তার সেই মুমূর্ষু অবস্থাতেই তার হাতের মুঠোয় ছিল প্রণয়িনী ছবি-র চিঠি । অন্তরে বাইরে রিক্ত এই যুবকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অর্থাৎ দর্জির কাছ থেকে অপমান, তার বিধবা মা ও বোনের অসহায়তা এবং তার প্রিয়ার আর্থিক দুর্দশার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজের অবলম্বনহীন যুবকদের জীবনযন্ত্রণাকেই গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রকাশ করেছেন তাঁর 'সংক্রান্তি' গল্পে ।

এই সমস্ত যুবকের বেকারত্ব, জীবিকা-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র সমকালীন অর্থনৈতিক ভাঙনের বাস্তব চিত্র অঙ্কনের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত 'মিছিল'

উপন্যাসেও। এখানে যুবসম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক দুর্দশার যে চিত্র লেখক উদ্‌ঘাটন করেছেন, তাতে তাদের জীবিকা যন্ত্রণা, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম ও অনিশ্চয়তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে লেখক মেসে বসবাসকারী একদল স্বদেশী যুবক শচীন, রবীন, বিনয়, শরৎ প্রমুখের দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধন, দুর্বিষহ দুর্ভোগের কথা বলেছেন। দুটি ঘটনার আশ্রয়ে এদেশের বেকার সমস্যা সমকালে যে কত প্রকট হয়ে উঠেছিল, আলোচ্য গল্পে তার আভাস পাওয়া যায়। প্রথমটি হল, শচীনের হাত সাফাই করে স্যাকরার চোখে ধুলো দিয়ে তার প্রেয়সী মনুর বালা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয়ত, দেখতে পাওয়া যায় কর্মপ্রার্থী শচীন ও রবীন নামক যুবকদ্বয় 'নির্ভীক' পত্রিকার অফিসে গিয়ে অর্জুন সিং-এর কাছে কাগজ ফেরির আবেদন জানায়। কিন্তু ফেরিওয়ালার কাজও জোটে না। তৎকালীন সামাজিক পটভূমিকায় অর্থনৈতিক ভাঙনের মুখে ন্যায়-নীতি-আদর্শ ও শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে যে পরিবর্তন ঘটতে দেখা যাচ্ছিল, লেখক এখানে অত্যন্ত বাস্তবসম্মত দৃষ্টিতে তা ফুটিয়ে তুলেছেন।

তৎকালীন সমাজের প্রভাব কল্লোল-গোষ্ঠীর আর একজন লেখক সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দা গোঁসাই' (শ্রাবণ, ১৩৩২) গল্পে লক্ষণীয়। অর্থনৈতিক ভাঙনের আঘাতে যুব সমাজের মধ্যে যে হতাশা ও অনিশ্চয়তা তাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল তাই বাস্তবচিত্র উক্ত গল্পের নায়ক চরিত্রের ভাবনার মধ্যে প্রকাশিত। সেই বেকার মধ্যবিত্ত যুবকের উক্তি—

'পরীক্ষা পাশের পর বরাবর কলকাতায় এসে আশ্রয় নিলাম আমাদের সেই পুরনো মেসে—উদ্দেশ্য চাকরী দেখব। চেষ্টা করলে কৃতকার্য হওয়া যায়—এই নীতিবাক্যটা আর কোন ব্যাপারে কেমন খাটে জানি না কিন্তু চাকরীর বেলায় এটা যে একেবারে অর্থশূন্য, নিঃসংশয়ে বলতে পারি।'

এই মনে করে সে হঠাৎ তার বন্ধুর সহায়তায় একটা ফার্মে ম্যানেজারের চাকরি পেল সত্য কিন্তু দুঃখের ব্যাপার ফার্ম যেটা সেটা নামেমাত্র আর তার ম্যানেজারের পদটাও নিতান্ত নগণ্য। তার কাজ হল এই ফার্মের ঋণগ্রস্ত মালিক দা গোঁসাই-এর সঙ্গে গল্প করা, হিসাব লেখা, বাজার করা ইত্যাদি। গল্পকার এই গল্পের মধ্য দিয়ে তৎকালীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের যে সমস্যা তুলে ধরতে চেয়েছেন তা হল পরীক্ষায় পাশ করা আর চাকরি প্রাপ্তির মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেরানী ছাড়া সে আমলে শিক্ষক ও পোস্টমাস্টারদের আর্থিক দুর্দশা যে কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ে 'পোস্টাপিস' (চৈত্র, ১৩৩৩) ও নৃসিংহ দাসী দেবীর 'বিধির বিদ্রূপ' (চৈত্র, ১৩৩৪) গল্পে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং আলোচ্য লেখকদের উপন্যাস ও গল্পগুলি বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য করা যায় কল্লোল-গোষ্ঠীর এই লেখকদের কথাসাহিত্যে নাগরিক চেতনা ও সমাজ বাস্তবতা বোধ বেশ স্পষ্ট। তাঁদের বিষয়বস্তু চরিত্র ও মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সমকালীন স্থান-কাল-পাত্রের প্রতিফলন অবলোকন করা যায়।

বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদের প্রবল ঢেউ এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব 'কল্লোল'-এর তরুণ লেখকবৃন্দকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। যার ফলে শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে সাহিত্যরচনার এক প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল। কল্লোল-গোষ্ঠীর কথাসাহিত্যে যে সমস্ত শিল্পসংস্থার শ্রমিকদের জীবনের কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে সেই সমস্ত শিল্পসংস্থাগুলি হল কয়লাশিল্প, পাটকল, ছাপাখানা, চালকল, কারখানা ইত্যাদি। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে যেভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাতে সমাজের যে কোনো শ্রেণীর বেতন বৃদ্ধি পেলেও উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিক সম্প্রদায়ও এক অর্থনৈতিক ভাঙনের সম্মুখীন হয়। ড. রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশিত এক সমীক্ষা থেকে জানতে পারা যায়—

> The years 1917 and 1920 which were years of increased cost of living and were followed by big strikes and an increased wages by 10 percent and 40 percent respectively It is evident that these increases were not at all proportionate to the cost of living.[১]

ড. মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশিত এই সমীক্ষা থেকে তৎকালীন শিল্প শ্রমিকদের আর্থিক জীবনের এক বাস্তব চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়। সর্বোপরি ছিল মালিক শ্রেণীর অধিকতর মুনাফা শিকারের ফলে শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চনা। বিদেশি কোম্পানিগুলি ও সরকার তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির দিকে যতটা নজর দিত, শ্রমিকদের সুখ-সুবিধার প্রতি ততটা নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। এই পটভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে কল্লোল-গোষ্ঠী শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন না, কুলি, মুটে, মজুরের অস্তিত্বের সংকটের নানা কাহিনী ব্যক্ত করলেন বিভিন্ন গল্পে। বাংলা সাহিত্যের পূর্বাপর পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, সমাজের নিচু স্তরের এইসব মানুষেরা এত দিন ছিল অনুক্ত অথবা অপাংক্তেয়। কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকরাই সাহিত্যের আসরে এদের বরণ করে নিলেন। ফলে কাব্যলক্ষ্মী সমাজের উঁচু মন্দিরের চূড়া থেকে নেমে এলেন ধূলি-ধূসর মর্ত্য পৃথিবীর নগ্ন ধূলার পরে। 'কল্লোল'-এর লেখকরা একটু বৃহৎভাবেই এদের কথা লিপিবদ্ধ করলেন, সমাজের চোখে অবহেলিত এই সব হতভাগ্যদের অভিষিক্ত করলেন নায়কে।

কল্লোল-গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান গল্পকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত 'মা' (বৈশাখ, ১৩৩০), 'মরণ বরণ' (মাঘ, ১৩৩০) ও 'ঝমরু' (আশ্বিন, ১৩৩০) গল্পে কয়লাখনির শ্রমিকদের আর্থিক দুরবস্থা ও দাম্পত্য জীবনের অশান্তির প্রতি আলোকপাত করলেন। এই গল্পগুলিতে রাণীগঞ্জ, দিশেরগড় অঞ্চলের সাঁওতাল, বাউরি, কুলিদের বাস্তব জীবন অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে অঙ্কন করা হয়েছে। তাঁর 'মা' গল্পে কয়লা খাদের শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাবের কথা বিবৃত। 'মা' গল্পে সাঁওতাল মেয়েদের মাতৃত্বের অন্তর্দ্বন্দ্ব আলোচ্য বিষয় হলেও, গল্পকার বৃদ্ধ দুখনের মর্মান্তিক জীবনের কথা প্রকাশ করে আকর্ষণ করেছেন। এছাড়াও সাঁওতাল ছেলের কয়লা খাদের কুলি হওয়া এবং কুলি জীবনের ব্যভিচারের ছবিও এই গল্পে পাওয়া যায়।

'মরণ বরণ' গল্পে বৃদ্ধ ভাটুলের দুর্ভাগ্যের কথা বলতে গিয়ে লেখক কয়লাকুঠিতে কুঠি

সাহেবের যৌন ব্যভিচার, নিষ্ঠুর আচরণ, নারীর অসহায়তাকে নির্মমভাবে উন্মুক্ত করেছেন ।

প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'ব্যথা' (পৌষ, ১৩৩০) গল্পে সুবোধ রায় তাঁর 'কালের গতিক' (মাঘ, ১৩৩০) গল্পে চটকল শ্রমিকদের জীবনকথা প্রকাশ করেছেন। 'ব্যথা' গল্পের নায়ক গোকুল চটকলে কাজ করে ২৫ টাকা বেতন পায় । ঘরভাড়া বাবদ বাড়িওয়ালাকে দিতে হয় মাসে ৭ টাকা । বাকি টাকায় কোনোরকমে তার সংসার চলে । পুজোর সময় তার সন্তানকে জামা, জুতো কিনে দিতে গিয়ে গোকুল ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে । শুধু তাই নয়, জুতো জামায় তার পুত্র সন্তুষ্ট না হলে তার বিকারের অবস্থা হয় । এই হল তার করুণ পরিণতি ।

কলের শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে জড়িত আরো নানা সমস্যা, যেমন ঘুষ, যৌন ব্যভিচার ইত্যাদি আলোচ্য গল্পগুলিতে পরিলক্ষিত হয় । বিশেষ করে সুবোধ রায়ের 'কালের গতিক' গল্পে দেখা যায় নায়ক অমূল্যকুমার পিতার মৃত্যুর পর সকলের কাছ থেকে নির্মম অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে । অবশেষে কলেজের পড়াশোনা ছেড়ে সে চটের কলে তৃতীয় বিভাগে কেরাণীর চাকরি পেল । যে অমূল্য কুলি সর্দারের কাছ থেকে দুটাকা উৎকোচ গ্রহণ করা একদিন অন্যায় বলে মনে করত কালের গতিকে আজ তার মানস পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে । তার—

'ঘুষ লইতে শুধু যে বাধে না তা নয়, এখন সে গরীব কুলিদের নিকট হইতে জোর করিয়া ঘুষ আদায় করে । কলের স্ত্রীলোক কুলিদের সহিত ঠাট্টা তামাসা করা এখন তাহার কর্তব্যের মধ্যেই হইয়াছে । এমনকি বলিতে লজ্জা করে সাহেবদের লালসার অগ্নিতে এই সমস্ত কুলি রমণীকে ইন্ধন স্বরূপ জোগাইয়া সাহেবকে খুশি করিতে সে একটুও দ্বিধা বোধ করে না ।'

উক্ত গল্পে গল্পকার কলের এই কেরাণী জীবনের নৈতিক অধঃপতন এবং শিল্প জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎকোচ গ্রহণ, মালচুরি, যৌন ব্যভিচার ইত্যাদি সমস্যাকে বলিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত করে তাঁর নিপুণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং শিল্প ও সমাজ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন ।

অন্যান্য সমস্ত শিল্পের ন্যায় ছাপাখানার সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের অবস্থা প্রায় অভিন্ন ছিল । ছাপাখানার শ্রমিকদের অবস্থার সঙ্গে 'কল্লোল'-এর কয়েকজন কর্মকর্তা ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন । ছাপাখানার শ্রমিকদের আর্থিক ও সামাজিক দুরবস্থা এই গোষ্ঠীর অনেক লেখক স্বচক্ষে লক্ষ্য করেছেন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অর্জন করেছেন । ছাপাখানার শ্রমিকদের জীবনের আর্থিক দুরবস্থা, পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের অশান্তি প্রকাশিত হয়েছে জলধর সেনের 'রামলাল' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২), তারানাথ রায়ের 'মেশিনের পাশে' (ভাদ্র, ১৩৩২), গোকুলচন্দ্র নাগের 'ব্যথার প্রদীপ' (আশ্বিন, ১৩৩২), পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'স্বাগত' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫) প্রভৃতি গল্পে ।

ছাপাখানার শ্রমিকদের জীবন নিয়ে 'কল্লোল'-এ যে কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হয় সেগুলির মধ্যে তারানাথ রায়ের 'মেশিনের পাশে' গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 'মেশিনের পাশে' গল্পে তারানাথ একজন সাধারণ শ্রমিকদের জীবন উপস্থাপিত করেছেন । এই শ্রমিক মদ্যপায়ী, দাম্পত্য জীবনে অসুখী এবং উচ্ছৃঙ্খল। এই শ্রমিকের এক টুকরো জীবনচিত্র এইরূপ—

'মেশিনের পাশে বসে সেই কথাগুলো ভাবছি । কেন পাঁচীকে মারলাম ? অপরাধ তার অসুখ করে কেন ? অসুখ আবার মানুষের করে না, কিন্তু অমন্ করে সে বলবার কে ? আমি

মদ খাই, গোল্লায় যাই ও বলবার কে ?

ভাল লাগছে না—মনোকাগজের রোলটা জড়িয়ে ফেলে রেখে বোতলের ছিপি খুলে খাব কি ? বাড়ীতে গেলে সেই ঘেনর ঘেনর কেন বাপু ? দিনে ১৮ ঘন্টা খেটে দু মিনিট বাড়ী যাব তাও সইবে না । ধুৎতোর মাগছেলে । বোতল উড়িয়ে দিয়ে আবার মেশিনের পাশে বসে পুরোদমে কাজ চালালাম ।

রাত তখন দুটা । শিষে ফুটছে ।...বুকের ভিতর কেমন করছে—কেন মারলেম । আহা ওর যে পেটে আজ কয়দিন দানা পড়েনি । কচিগুলো,—চোখ মুছে মেশিন ছেড়ে উঠলাম ।

অপারেটর বল্লে—কোথায় চললে ?

কোথায় আবার গোল্লায়...'

উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিক মদ্যপান করে, স্ত্রীকে প্রহার করে, কিন্তু বিবেকের দংশনেও দংশিত হয় । প্রশ্ন হতে পারে, কেন সে মদ্য পান করে ? 'মেশিনের পাশে' গল্পে লেখক নির্দেশ করতে চেয়েছেন শ্রমিকের পারিবারিক বা দাম্পত্য জীবনের অশান্তির মূল কারণ কোথায় । এই শ্রমিকের মদ্যপান, তার স্ত্রীর ব্যভিচারিতা, তাদের জীবনের অশান্তি—মোটকথা, ভগ্নগৃহের পরিবেশ সাধারণ শ্রমিক সমাজের পটভূমিকায় উপস্থাপিত করা হয়েছে, যেখানে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার একান্ত অভাব এবং পারিবারিক অশান্তির মূল কারণ অর্থনৈতিক সমস্যা ।

'কমলি' (চৈত্র, ১৩৩৪) গল্পে কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য কারখানা শ্রমিকদের দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন ।

'কম্‌লির একটি বর জুটলো, ওই কাশীপুরের কারখানারই কর্মচারী' ।

'তার স্বামীর প্রথম পক্ষের দুটো অপগন্ড সন্তান', 'স্বামীর গৃহও পাশের বাড়ীর মতোই গোলপাতার ঘর' তাদের এই বাসস্থানের চিত্র থেকেই তাদের আর্থিক দুরবস্থা প্রকট হয়ে ওঠে । কাশীপুরের কারখানার ভোরের বাঁশি শুনে কম্‌লি ধড়মড় করে উঠে রান্না করে স্বামীকে খাইয়ে কারখানায় পাঠাত । তাদের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করল । একদিন সন্ধ্যায় কমলির শিশু সন্তানটি মারা গেল । তার স্বামী তার কোল থেকে কুঠিঘাটার শ্মশানে নিয়ে গেল । সে খানিকটা কাঁদল । পরদিন থেকে আবার সব পূর্বের মতো চলতে লাগল । কমলি আবার রান্না করে স্বামীকে কারখানায় পাঠায় । সন্তান মারা গেলেও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না তাদের জীবনে। গল্পকার তাদের বিশেষত্বহীন সাধারণ দাম্পত্য জীবন অঙ্কন করে সাধারণ শ্রমিকের জীবনকথা প্রকাশ করেছেন । এই জীবন নিতান্তই সরল, গতিহীন, একঘেয়ে ।

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'স্বাগত' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫) গল্পে চালকলের শ্রমিক জীবনের সমস্যার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত করে পতিতা জীবনের অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার গুরুত্ব আরোপ করেছেন । পতিতার সমস্যার সঙ্গে কারখানার জীবনের সমস্যা অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত থাকায় শ্রমিকদের মদ্যপান ও যৌন ব্যভিচার বাস্তব পটভূমিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যারূপে ফুটে উঠেছে । শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে । বৃদ্ধি পেয়েছে পতিতাবৃত্তি । কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে গ্রামের অদূরে রায়বাবুদের প্রকান্ড চালের কল । দিনের

বেলায় শ্রমিকরা সেখানে কাজ করে, সন্ধ্যায় তারা উৎসবে মেতে ওঠে, মদ্যপান করে, আর পরী ও তার মা সেই উৎসবে নিত্য নতুন অতিথিদের সম্বর্ধনা জানায় । রাতের অন্ধকারে চলতে থাকে তাদের দেহের ব্যবসাও ।

'মেয়েদের মধ্যে পরী ও রাসমণির এখানে নিত্য উপস্থিতি আছে । মা ও মেয়ে । রাসমণির বয়স হইয়াছে ... পরীর বয়স অল্প, গড়নটিও ছিমছাম । সেই দুর্ধর্ষ গণতন্ত্রের সেই একমাত্র অনভিষিক্তা মহারাণী ।'

চালকলের শ্রমিক ছিরু, ঠ্যাং-কালী, রসুল প্রমুখ শ্রমিকবা পরীর দেহের খদ্দের । এইভাবে লেখক সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি ও সহৃদয়তার সঙ্গে শিল্প জীবনের গভীর সমস্যাকে তুলে ধরেছেন ।

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় 'রাতের তারা' গল্পেও মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক এবং যৌন জীবনের সমস্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন । সখি নামে এক কুলি রমণী কলে কাজ করে । অন্যান্য শ্রমিকরাও সেখানে কাজ করে । তবে মালিকের নির্দেশে সেখানে পুরুষ ও নারীকে পৃথক করে কাজ করতে হয় । পীরু এই কারখানার একজন শ্রমিক । সখিকে কাছে পেলেই তার 'মনটা রঙে উঠে' ।

'একদিন কি একটা দরকারে সখি ফারনেসের মধ্যে এল । ইনচার্য সাহেবটা তখন বুঝি টিপিন করতে গেছে । সখিকে কাছে ডেকে দুটো কতা শুধোচ্ছি । শালা পেছন থেকে এসে মারলে এক লাতি । থুবড়ে পড়লুম গিয়ে কলের কাছে । ...সখির একটা ছেলে হয়েছে । বাচ্চাটা নাকি ঐ শালা ইনচার্জের মতো রাঙা ।'

এই প্রসঙ্গে পাঁচুগোপালের 'রাতের তারা'র সঙ্গে শৈলজানন্দের 'মরণ-বরণ' গল্পের কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষণীয় । উভয় গল্পে সাহেবের সঙ্গে কুলি রমণীর যৌন ব্যভিচার ও রাঙা ছেলের জন্ম উল্লেখ করে শিল্প সমাজের যৌন সমস্যা উভয় গল্পকারই অভিন্ন দৃষ্টিতে উপস্থাপিত করেছেন।

ভূপতি চৌধুরী তাঁর 'বিদ্রোহীর ডায়েরী' গল্পে (কথিকা, আশ্বিন, ১৩৩০) মালিক শ্রমিকের সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । গল্পের নায়ক দরিদ্র ঘরের সন্তান। সে শিক্ষিত । কিন্তু তার পিতার আকস্মিক মৃত্যু, সংসারের ঋণভার, সমাজের অত্যাচারে তার কন্যার অগ্নি-স্বয়ম্বর ও তার পত্নীর মৃত্যু ইত্যাদির ফলে সে বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয় । পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় 'রাতের তারা' গল্পে সেখানে মালিক-শ্রমিকের তিক্ত সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দিয়েছেন সেখানে ভূপতি চৌধুরী তাঁর 'বিদ্রোহীর ডায়েরী' গল্পে শ্রমিক-বিদ্রোহের যে সামান্য আভাস দিয়েছেন তাতে অবশ্য দুঃস্থ শিক্ষিত নায়ক কুলিদের দলে মিশে বিদ্রোহের ভীতি প্রদর্শন করেছে ।

'এই পোশাক পরা ভদ্রতার ছদ্মবেশী বর্বর হৃদয়হীন সভ্যসমাজ ছেড়ে সভ্যতার ছলা-কলা অজ্ঞ হৃদয়বান এই কুলির দলে মিশে তাদের বিদ্রোহী করে তুলব—এই অন্ধ নির্মম অবিচারক সুসভ্য সমাজের বিপক্ষে ।'

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মার্কসবাদের ও সাম্যবাদের মতবাদ এবং ট্রেড ইউনিয়নের কর্মসূচীব প্রভাব আলোচ্য লেখকদ্বয়ের চিন্তাধারায় বিস্তার লাভ করেছিল । সুতরাং শিল্প সংস্থার

পরিবেশে সমাজের দলিত মানুষের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, সমস্যা, অন্তর্জীবনেব চিন্তাভাবনা, মালিক-শ্রমিক সম্পর্কে ইত্যাদি বাংলা সাহিত্যে প্রথম উদ্‌ঘাটিত হল বিশিষ্ট কথাকারদেব বিচিত্র সব গল্পে। 'কল্লোল' পূর্ববর্তী সাহিত্যে এ জাতীয় মনোভাবের প্রকাশ বিবল ।

ঠিক একইভাবে সমাজের একেবারে নগণ্য অবজ্ঞাত পতিতা, ভিখারী ইত্যাদিব কাহিনী অত্যন্ত সহানুভূতিসহকারে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উন্মুক্ত করার প্রয়াস 'কল্লোল'-এর লেখকবৃন্দের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় । কল্লোলের কালে জীবনসংগ্রামে বিপর্যস্ত ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে দুঃস্থ নারীরাই শিল্পাঞ্চল ও শহরগুলিতে পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হচ্ছিল । শিল্প ও শহরের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে সুস্থ উপায়ে জীবিকা অর্জনেব সহজ দ্বাব উন্মুক্ত না থাকায় সমাজে বেশ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল । এ সম্পর্কে সমাজতত্ত্ববিদ অধ্যাপিকা বেলা দাশগুপ্তা বলেন—

Prostitution has grown apace with industrialisation and urbanisation [১০]

পতিতাবৃত্তির মূলে নারীদের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ তা একালের কল্লোলীয় লেখকরা বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে নির্দেশ করতে প্রয়াসী হলেন । ১৩৩১ সালের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'কল্লোল'-এ প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী ভগবান কাঁদে' গল্পে গণিকাদের জীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, জীবনসংগ্রাম ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে চরম পরাজয় ও নৈরাশ্যের বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করেছেন । প্রেমেন্দ্র মিত্রের উক্ত গল্প সম্পর্কে প্রাজ্ঞ সমালোচক অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি এখানে স্মর্তব্য—

> 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' গল্পটিতে পতিতাজীবনের ভাবাবেগ বর্জিত, অথচ সহানুভূতির বেশে পূর্ণ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে—ইহার নিরুপায় বীভৎসতায় সংযত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । ইহাতে পতিতাকে আদর্শবাদের সাহায্যে রূপান্তবিত করিবাব চেষ্টামাত্র লক্ষিত হয় না ।[১১]

পতিতাশ্রেণীর দুরবস্থার প্রতিফলন সুকুমার ভাদুড়ীর 'পাঁকের পোকা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২) গল্পে লক্ষণীয় । এক ভিখারিণীর কঙ্কালসার দেহ, বড় বড় হলুদবর্ণ চোখ, দেখে মনে হয় জীবনীশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ । তার কোলে মৃত্যুপথযাত্রী শীর্ণ শিশু । নরেশ এই ভিখারিণীর জীবনের পূর্ব বৃত্তান্ত থেকে অনুমানে জানতে পারল—

'ভিক্ষুকের দলভুক্ত হওয়ার আগে সে মর্ত্যের নরকপথে নিমজ্জিত ছিল আর তারই বিষময় পরিণাম হয়ত তাকে হাসপাতালে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ।'

সেখান থেকে এসে তাকে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয় । এইসব পতিতাদের জীবন অনুসন্ধান করলে হয়ত জানা যাবে যে এই বৃত্তি গ্রহণ কবতে তারা বাধ্য হয়েছে । তাই অনেক লেখকের বেশ কিছু গল্পে পতিতাদের অতীত জীবন উদ্‌ঘাটন করার প্রয়াস লক্ষণীয় ।

সত্যেন্দ্রকুমার দাসের 'মরুর বাতাস' (আষাঢ়, ১৩৩২) গল্পের বিষয় হল পতিতাদের অতীত জীবন। গল্পের কাহিনীতে দেখা যায় বিবাহের রাত্রেই যার বিবাহ ভঙ্গ হয়েছে, তার জীবন পতিতাবৃত্তি গ্রহণের মাধ্যমে পরিণতি লাভ করেছে । হৃদয়হীন সমাজব্যবস্থায় বিবাহের বাত্রে নারীর জীবনকে অবহেলা করে পণ্য বস্তুর ন্যায় দরকষাকষি, বচসা ও বিবাহভঙ্গের ঘটনা একেবারে

অবাস্তব ব্যাপার নয় ।

এই প্রসঙ্গে সুবোধ দাশগুপ্তের 'মহামানব' (আষাঢ়, ১৩৩২) গল্পটি স্মরণ করা যেতে পারে । কেন নারীরা পতিতা জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তার কারণ নির্দেশ করে মানব অশোককে বলেছে—

'বাল বিধবা আছে সত্য কিন্তু তারা অনেকেই আমরণ ব্রহ্মচর্য পালনও করে সত্য । কিন্তু তাদের ভেতরও সকলে তা পাবে না । যারা পারে না তারাই ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে আসে, তারপরেই পাপ কাজে লিপ্ত হয়, এদের এই ব্যর্থ জীবনের জন্য সমাজও অনেকখানি দায়ী ।' এখানে গণিকাবৃত্তি গ্রহণের সামাজিক কারণ অত্যন্ত সহানুভূতি সহকারে নির্দেশিত ।

মনীষ ঘটক (যুবনাশ্ব), 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত 'গোষ্পদ' ((পৌষ, ১৩৩১) ও 'রাতবিরেতে' (চৈত্র, ১৩৩১) গল্পদুটির মধ্যে দিয়ে রূপব্যবসার কারণ নির্দেশ করেছেন । সভ্য সমাজের অন্ধকার গলিতে যে বীভৎস জীবনধারা চলেছে তার প্রতিফলন কল্লোল-গোষ্ঠীর কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে যুবনাশ্বের গল্পেই অধিক লক্ষণীয় । যুবনাশ্বের গল্পগুলি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন—

> যুবনাশ্ব গল্প লিখেছেন কলকাতার Under world অর্থাৎ পেশাদার, ভিক্ষুক, চোর, গাঁটকাটা, বুড়ো, বেশ্যা—তাদের জীবনকাহিনী অবলম্বন করে ।[১২]

বস্তি ও বেশ্যালয়ের জীবনকথা প্রসঙ্গে এখানে স্মরণ করা যেতে পারে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত 'মোট বারো' (আশ্বিন, ১৩৩২) গল্পে অধঃপতিতা জীবনের দুঃসহতা, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত 'একটুকরো'তে (মাঘ, ১৩৩২) দারিদ্রপিষ্ট বেশ্যা জীবনের কারুণ্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা, ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'পারুল' (মাঘ, ১৩৩৫) গল্পে মদ্যপ পুরুষের অত্যাচারে তার একাধিক স্ত্রীর মৃত্যু ও একজন স্ত্রীর পতিতাতে পরিণত হওয়ার করুণ কাহিনী । পতিতাদের জীবনকাহিনী তথা সমাজের ঘৃণিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের সাহিত্যের আসরে এই সরব আবির্ভাব 'কল্লোল'-এর সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ।

শুধু পতিতাদের নয়, সমাজের অসহায় দরিদ্র মানুষ বিশেষত, ঝি, এদের জীবনের নিষ্ঠুর করুণ কাহিনী নীলিমা বসুর 'বুড়ো ঝি' (আশ্বিন, ১৩৩১) গল্পে উদ্‌ঘাটিত । এই ঝি অনাথা, নিঃসন্তান, স্বামী পরিত্যক্তা ও গৃহহারা । সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রতি লেখিকার অপরিসীম দরদের প্রকাশ ঘটেছে তার রচিত 'বরুণা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১) নামক গল্পেও । শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'ভিখারী' (ফাল্গুন, ১৩৩১) নামক গল্পেও সমাজের খল কপটাশ্রয়ী চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা ভিক্ষুকের করুণ মিনতিকে অগ্রাহ্য করে গাড়ি করে চলে যায় 'ভারতের দারিদ্র্য ও তার প্রতিকারের উপায়' প্রবন্ধ পাঠ করতে । এই পর্যায়ের গল্পের সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প হলেও আলোচ্য গল্পগুলিতে লেখক-লেখিকার উঁচু তলার সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন এবং সমাজের নিচু তলায় যে সব অসহায় দীন-দুঃখী, ভিক্ষা যাদের উপজীবিকা, ভদ্রসমাজের নিষ্ঠুর ব্যবহার যাদের অনুদান তাদের প্রতি আপন মমতা ও সহানুভূতিকে উজাড় করে দিয়েছেন ।

কল্লোল-গোষ্ঠীর কথাসাহিত্যে সমাজের নানা শ্রেণীর অর্থনৈতিক চিত্র যেমন প্রতিফলিত

হয়েছে, তেমনি সমাজ ও পরিবারের আরও অন্যান্য শ্রেণীর বিভিন্ন চিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজ ও পরিবারের বিধবাদের সমস্যা, জমিদাবদের কথা, পণপ্রথার কথা, দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক সম্পর্ক, ধর্মীয় জীবন—ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ 'কল্লোল'-এর লেখক-লেখিকারা গভীর সহানুভূতির সাহায্যে তাদের কথাসাহিত্যে বিবৃত করেছেন।

পূর্বতন বাংলা কথাসাহিত্যের বিধবাদের জীবনকথা এক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশস্ত স্থান দখল করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকেরা বিধবাদেব ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করে নানাপ্রকার সামাজিক জিজ্ঞাসা উত্থাপন করেছিলেন 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত বিধবা-বিবাহ বিষয়ক গল্পগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা কল্লোল-গোষ্ঠীর মনোভাব পর্যালোচনা করতে পারি। পূর্ববর্তী কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখেরা বিধবাবিবাহকে স্বীকার করেননি। তৎকালীন সমাজে বিধবার যৌন জীবন ধিকৃত ও অস্বীকৃত ছিল। কিন্তু কল্লোলীয় লেখকরা এই পথ থেকে সরে এলেন।

'কাব্যকানন' (ফাল্গুন, ১৩৩১) গল্পে বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় দেখালেন, বিধবা অনিমার সঙ্গে অমলের কাব্য আলোচনা করতে করতে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত এদের বিবাহ হয়নি। কিন্তু নায়ক জানল অনিমা বিধবা ও সে স্বামীর ফটো পূজা করে তখন তাদের সম্পর্ক মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। এখানে নায়ক চরিত্রের এই মনোভাবের মধ্যে বিধবা সম্পর্কে সমাজের বদ্ধমূল সংস্কারের পরিচয় লক্ষণীয়।

ভূপতি চৌধুরীর 'অগ্নিশিখা' (চৈত্র,১৩৩১) গল্পে বিধবা পূর্ব প্রণয়ীর কাছে সমাজের অন্যায়েব বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা করে আপনার প্রণয় ব্যক্ত করেছে। এ গল্পেও নায়ক বিধবাকে বিবাহ করেনি। বিধবা নায়িকার সমাজদ্রোহিতার অগ্নিস্রাবী বাণী এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

'সমাজের কাপুরুষের দল এই অসহায়া নারীর উপর এইভাবে তাদের শাসন-দন্ডের অপব্যবহার করে আত্মপ্রসাদে উল্লসিত হয়ে উঠল। এই হীন পঙ্গু সমাজ যে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। আমরা নিজেরা একত্রিত হয়ে তাদের উপর এই অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিশোধ নেব। প্রতিহিংসা নিতে হবে, এই তার পথ।'

রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'ঘাসফুল' গল্পেও বিধবা লীলা ও নরুর ব্যর্থ প্রণয় ব্যক্ত হয়েছে। বিধবার মৃত্যু সম্পর্কে নায়কের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—

'ঐ ঘাস ফুলটির মতো নিতান্ত অযত্ন ও অবহেলার মধ্য দিয়াই সে বাড়িয়া উঠিয়াছিল।'

সমাজ-সংসার তাদের প্রতি বিরূপ, তারা অযত্নে ও অবহেলায় শুধু বেড়ে ওঠে তা নয়, এইভাবে তাদের জীবনের করুণ পরিসমাপ্তিও ঘটে। রাধারাণী দত্তের 'পাতানো মা' (শ্রাবণ, ১৩৩৫), প্রবোধকুমার সান্যালের 'বাতাস দিল দোল' (ভাদ্র, ১৩৩৫), ভূপতি চৌধুরীর 'সর্পিল পন্থ' (কার্তিক, ১৩৩৪) প্রভৃতি গল্পেও বিধবার বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ের সন্তান-বাৎসল্য ও শূন্যতাবোধের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বিধবাদের জীবন অবলম্বনে রচিত অহল্যা গুপ্তের 'বিধবা' (আষাঢ়, ১৩৩১) গল্পটির গুরুত্ব অপরিসীম। উক্ত গল্পে বিধবা মাধবী ও অমিতের প্রেম ও বিবাহের স্বীকৃতির ইঙ্গিত দিয়ে

বৈধব্য সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। মাধবীর মতো বিধবা নারী চরিত্র বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে অনন্য। মাধবীর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও দুঃসাহসী প্রেম বিরলদৃষ্ট।

কল্লোল-গোষ্ঠীর কথা সাহিত্যে কয়েকটি গল্পে জমিদারের ব্যভিচার, অত্যাচার ও অবিচারের কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। প্রবোধকুমার সান্যালের 'মার্জনা' (মাঘ, ১৩৩০) গল্পে অত্যাচারী, স্ত্রী হত্যাকারী জমিদারের চরিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। প্রজাদের ওপর জমিদারের নির্মম উৎপীড়ন ও অবিচারের পরিচয় পাওয়া যায় মনীশ ঘটকের 'ভুখা ভগবান' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২) গল্পে। দেশজোড়া আকাল, কোথাও একদানা শস্য জন্মায়নি। তাই প্রজার পক্ষে জমিদারকে খাজনা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা যায়, জমিদারের পেয়াদা বাকি খাজনার জন্য অনাহারক্লিষ্ট কালুকে ধরে নিয়ে যায়। প্রজাপীড়ন ও বিচারের প্রহসন লক্ষ্য করা যায় প্রিয়কুমার গোস্বামীর 'বিচার' (মাঘ, ১২৩১) গল্পে। জমিদার ও জমিদার পুত্রের নারীদেহ লোলুপতা ও সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যায় জগদীশ গুপ্তের 'খিদের খোরাক' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩), কিরীট ঘোষের 'পুরোহিত' (অগ্রহায়ণ. ১৩৩২) ইত্যাদি গল্পে। এছাড়া জমিদারের বহুবিবাহের পরিচয় পাওয়া যায় সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের 'অগ্নিশুদ্ধি' (শ্রাবণ, ১৩৩৩) গল্পে। গল্পে আছে—

'ইছাপুরের জমিদার ও সমাজপতি নন্দলাল সেন ষাট বছর বয়সে চতুর্থবার বাইশ বছরের বিভাকে বিবাহ করিয়া নহবৎ পিটাইয়া গ্রামে ঢুকিলেন।'

তাঁর এই অপকর্মের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে তিনি পাড়ার বৃদ্ধদের কাছে জানান—

'এক গেলাস জল তেষ্টা পেলে কে গড়িয়ে দেয় বল দিকি নি, হ্যাঁ, তার উপর একটি জন্মদুঃখিনী মেয়েরও কুল ইজ্জত রইল' ইত্যাদি।

ইছাপুরের জমিদারের ন্যায় আরও জমিদারদের স্বৈরাচার ও খেয়ালখুশির জন্য বহুবিবাহের ফলে কত নারীর জীবন যে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই কাহিনীতে।

পণপ্রথা বাংলার সমাজজীবনে জগদ্দল পাথরের মতো এক গুরুভার বিষয় ছিল, এমনকি এখনও আছে—একথা কারও অজানা নয়। কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার আর্থিক বিপর্যয়, সামাজিক অপমান, কন্যার বিবাহভঙ্গ বা তার দাম্পত্যজীবনে বিচ্ছেদ ও নির্যাতন—সবই যে পণপ্রথার পরিণাম তা সর্বজনস্বীকৃত সমাজের এই দুষ্ট ক্ষতের প্রতি কল্লোলীয়ানরাও নীরব ছিলেন না। বিমলাদেবীর 'বিজলী' (চৈত্র, ১৩৩২) গল্পে বিধবার জীবনকথা যেমন ব্যক্ত, তেমনি পণপ্রথা সম্পর্কেও লেখিকার সহানুভূতি প্রকাশিত। পণপ্রথার ফলে কন্যার পিতা কন্যার বিবাহে যেহেতু দুই হাজার টাকা বরপণ দিতে পারেনি, তাঁর আর্থিক অসামর্থ হেতু, তাই তৃতীয় পক্ষের পর বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে তিনি কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হন। এক বছরের মধ্যেই কন্যা বিধবা হয়ে যায়। আলোচ্য গল্পে লেখিকা বৈধব্য জীবনের সঙ্গে যুক্ত পণপ্রথার কুফলের ইঙ্গিত প্রদান করে বাঙালি নারীসমাজের বিপর্যয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন।

নীলিমা বসুও তাঁর 'ডায়েরীর একপাতা' (কথিকা, ভাদ্র, ১৩৩০) গল্পে পণ প্রথার এই কুফলের কথা ব্যক্ত করে নারী সমাজের সমস্যা উত্থাপন করেছেন। বিবাহের সময় দেনা-পাওনা

আশানুরূপ না হওয়ায় কন্যার বিবাহের দুমাস পরে যখন সে অসুস্থ হয়ে পিত্রালয়ে এল, সেই সুযোগে তার স্বামীর পুনর্বিবাহ ঘটে গেল । নায়িকা তার মনঃপীড়া বর্ণনা করে তার ডায়েরিতে লিখছে—

'কেন এমন করে সবাই আমায় শাস্তি দিলে ? একটা প্রাণ এমন অকালে শুকিয়ে ঝরে পড়বে, আর সে দেখবে ?'

সুকুমার ভাদুড়ীর 'পারুল' (কার্তিক, ১৩৩২) গল্পেও পণপ্রথার কুফল আলোচিত হয়েছে । পাওনা নিয়ে ঝগড়াঝাটির ফলে নায়ক-নায়িকার বিবাহ ভেঙে যায়। তারপর নায়িকা পারুলকে সারা জীবন জমিদার পুত্রের রক্ষিতা হিসাবে অতিবাহিত করতে হয় । আসলে গল্পকার এই ধরনের নারীদের অসামাজিক জীবনের অপমানের মূলে পণপ্রথার মতো সামাজিক অন্যায়কে দায়ী করতে চেয়েছেন ।

'কল্লোল'-এ প্রকাশিত কয়েকটি গল্পে দাম্পত্য জীবনের গতানুগতিক ও আধুনিক সমস্যাদি লক্ষ করা যায় । দাম্পত্য জীবনধারার গল্পগুলিতে আছে বিচ্ছেদ, ব্যর্থতা, তিক্ততা, আবার কোথাও উৎপীড়ন, নির্যাতন, আবার কোথাও মিলন ও অতৃপ্তি । বিচ্ছেদ, ব্যর্থতা ও তিক্ততার পরিচয় পাওয়া যায় প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'শেষেব দিক' (আশ্বিন, ১৩৩২), 'সমাজদ্রোহী' (ফাল্গুন, ১৩৩৩) ; নৃসিংহদাসী দেবীর 'পাশের বাড়ী' (চৈত্র, ১৩৩১) ; প্রফুল্লকুমার রায়চৌধুরীর 'বন্ধ্যা' (মাঘ, ১৩৩১) ইত্যাদি গল্পে । উৎপীড়ন, নির্যাতনের ছবি পাওয়া যায় তারা মুখোপাধ্যায়ের 'স্রোতের মুখে' (শ্রাবণ, ১৩৩৬), পঞ্চানন ঘোষালের 'নীচের সমাজ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২), প্রবোধকুমার সান্যালের 'ভুঁই চাঁপা' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩১) ইত্যাদি গল্পে । মিলন ও অতৃপ্তির পরিচয় পাওয়া যায় পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'মৃত্যুর অমৃত'(মাঘ, ১৩৩৩)নৃসিংহদাসী দেবীর 'ব্যথার তৃপ্তি' (চৈত্র, ১৩৩১), সরোজকুমারী দেবীর 'মাধবীর পত্র' (কার্তিক, ১৩৩৩) ইত্যাদি গল্পে ।

বাঙালি সমাজে আমাদের পারিবারিক প্রীতি বন্ধনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, মা-সন্তানের সম্পক, পিতা-সন্তানের সম্পর্ক, ভাই-বোনের সম্পর্ক, দেবর-বউদির সম্পর্ক ইত্যাদি আবহমানকাল থেকে চলে আসছে এবং সেগুলো নিবিড়, স্নেহ, প্রেম, প্রীতির দ্বারা মাধুর্যমন্ডিত। 'কল্লোল'-এর কথাসাহিত্যেও বাঙালি সমাজের পারিবাবিক স্নেহের বিচিত্র সম্পর্ক পরিদৃষ্ট হয় । 'কল্লোল'-এর লেখকেরা অনেকাংশে পূর্ববর্তী ঐতিহ্যধারা অনুসরণ করে চললেও সামাজিক পটভূমি পরিবর্তনের সঙ্গে বাঙালির পারিবারিক সম্পর্কের পরিবর্তনেরও কোন কোন গল্পে লক্ষ করা যায় ।

মা-সন্তানের সম্পর্কের বিভিন্ন দিক উদ্ভাসিত হয়েছে অনিলকুমার ভট্টাচার্যের 'স্মৃতিচিহ্ন' (চৈত্র, ১৩৩০) অমলেন্দু বসুর 'ঘুম' (পৌষ, ১৩৩৫), তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'স্থলপদ্ম' (শ্রাবণ, ১৩৩৫), শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'ঝরাফুল' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১), নৃসিংহদাসী দেবীর 'মা' (ভাদ্র, ১৩৩০), নির্মলচন্দ্র সিংহের 'স্নেহের ক্ষুধা' (শ্রাবণ, ১৩৩০), রবীন্দ্রলাল রায়ের 'মা-হারা' (ফাল্গুন, ১৩৩০), হেমেন্দ্রলাল রায়ের 'গোত্রহীনের মা' (কার্তিক, ১৩৩৩) ইত্যাদি গল্পে । দেবর-বউদির সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে নৃসিংহদাসী দেবীর 'যাত্রাপথে' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০) গল্পে ।

পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক পর্যালোচিত হয়েছে পশুপতি মজুমদারের 'আমিনা' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩), শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বন্ধন' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), প্রবোধকুমার সান্যালের 'চব্বিশ ঘন্টা' (আষাঢ়, ১৩৩৫) ইত্যাদি গল্পে। ভাই-বোনের সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে প্রবোধকুমার সান্যালের 'দিদি' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১); প্রবোধচন্দ্র ঘোষের 'কল্যাণী' (আশ্বিন, ১৩৩৩) ইত্যাদি গল্পে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় ঐতিহ্যের ধারা—বিশেষ করে বৈষ্ণব সহজিয়া প্রেমের ধারা পুরনো হলেও একালের কথাসাহিত্যে তার অনুসৃতি লক্ষণীয়। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব এবং চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রমুখের পদাবলীতে অঙ্কিত রাধা কৃষ্ণের বিরহ-মিলনের চিত্র অনুসরণ করে 'কল্লোল'-এর কয়েকজন কথাসাহিত্যিক ধর্মীয় জীবনের আলেখ্য উদ্‌ঘাটন করে বাঙালি সমাজে ধর্মীয় জীবনের প্রভাব ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। বাংলার বৈষ্ণব জীবন ঐতিহ্য ধারার ভিত্তিতে রচিত গল্পগুলির মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রসকলি' (ফাল্গুন, ১৩৩৪), 'হারানো সুর' (বৈশাখ, ১৩৩৫), 'রাইকমল' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬) উল্লেখযোগ্য। 'রসকলি' গল্পে পুলিন ও মঞ্জরীর প্রেম-বিরহের চিত্র অঙ্কন করে তারাশঙ্কর বৈষ্ণব সহজিয়া প্রেমের এবং রাধাকৃষ্ণের বিরহ-প্রেমের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। গল্পের শেষে মঞ্জরী বৃন্দাবনে যাবার সময় পুলিন ও গোপিনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিচিত্র রহস্যময় হাসিতে যে গান ধরেছে তা ধারারই অন্তরের গান।

'লোকে কয় আমি কৃষ্ণ কলঙ্কিনী/সখী, সেই গরবে আমি গরবিনী গো/আমি গরবিনী।' এই গানে, তার জীবনাচরণে, প্রেমের গভীরতায়, বিচ্ছেদ-বিরহ কাতরতায় মঞ্জরী বৈষ্ণবের আহ্লাদিনী শক্তি অর্থাৎ রাধিকারই সংস্করণ বলা যায়। এখানে মানব-মানবীর প্রেমের সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম গল্পকার একাত্মরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। তারাশঙ্করের 'হারানো সুর' গল্পেও ঐ একই সমাজের প্রতিফলন ঘটেছে। এছাড়া প্রবোধকুমার সান্যালের 'আলেয়া' (কার্তিক, ১৩৩৩), প্রণব রায়ের 'একটি মুহূর্ত' (আষাঢ়, ১৩৩৬) ইত্যাদি গল্পে রাধাকৃষ্ণের প্রেম, বিরহ, ব্যাকুলতা ইত্যাদিকে অনুসরণ করে চিত্রিত হয়েছে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক।

প্রবোধকুমার সান্যাল 'ঠাট্টা' (কার্তিক, ১৩৩৪) গল্পে দেখিয়েছেন বলিদান, মহামারী ও মানুষের আর্তনাদ সত্ত্বেও পাষাণ দেবতা নিরুত্তর। আলোচ্য গল্পে লেখক আমাদের সমাজ জীবনের অন্ধ ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রতি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। সুনীতিদেবীর 'মন্দিরে' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০) গল্পে এক দেবদাসীর করুণ জীবন কথার মধ্য দিয়ে দেবতা সম্পর্কে তার মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। কিরীট ঘোষের 'পুরোহিত' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩২) গল্পটি সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পতিতা মন্দিরে পুজো দিতে এলে সমাজপতিরা যখন বলেন—'পতিতার পুজা দেবতা নেন না।'

তখন পূজারী হাসিমুখে জানাল—'কেন ? তোদিগে যারা পতিতা করেছে তাদের পূজা যদি মা নিতে পারেন তাহলে তোদের পূজা নেবেন না কেন ?'

ধর্মকে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ যে উদার মানবিক দৃষ্টিতে পরিশীলিত করেছিলেন তারই প্রভাব এখানে পড়েছে। ধর্মীয় কুসংস্কারের দুঃসাহসিক প্রতিবাদাত্মক পরিপ্রেক্ষিতে 'পুরোহিত'

গল্পটি বাংলা ছোটগল্পের ধারায় এক অসাধারণ সৃষ্টি ।

'কল্লোল'-এর তরুণ লেখকেরা প্রাচীন যে সমস্ত ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে নরনারীরা যৌন সম্পর্কের রক্ষণশীল মনোভাব ও শুচিতাবোধ । তাই কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকেরা সমাজের যৌন শিথিলতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে মনস্তত্ত্বের আলোকে তাদের সাহিত্যে যৌন প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করেছেন । বিশেষত ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব তাদেব উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল । ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রয়েডের 'Interpretation of Dreams' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সব বুদ্ধিজীবী মহলে এক আলোড়ন পড়ে যায় । ফ্রয়েড Id, Ego, Super Ego—মনোলোকের এই ত্রিস্তর আবিষ্কার করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখালেন যে অবচেতনের প্রভাব মানুষের চিত্তে সর্বাধিক প্রবল । মনোবিশ্লেষণ করে তিনি দেখালেন যে মানুষের অবচেতন স্তরে সচেতন মন বা অহং সত্তার প্রভাব কত সীমিত, অপরপক্ষে অবচেতন বা 'Id'-এর প্রভাব অপ্রতিরোধ্য । ফ্রয়েড তাঁর তত্ত্বের দ্বারা সভ্য মানুষের মনের গভীর তলদেশে তার অসন্তোষ, বিদ্রোহ, তার বিকার অকপটে প্রকাশ করলেন । তিনি দেখালেন মানুষের এই যে সভ্যতা, সংস্কৃতি তার মৌল ভিত্তি হল যৌন-তৃষ্ণা এবং সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব তার অন্তর স্তরে বার বার অবদমন ঘটাচ্ছে আর এই অবদমনের ফলে তার চিত্তে রয়েছে বিদ্রোহ ও অসন্তোষের ভাব । ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ফলে ব্যক্তিমনের স্বরূপ তার অবদমিত আকাঙ্ক্ষা, আদিম যৌন ক্ষুধা ও সভ্যতার মেকি চেহারা সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল ।

ফলে ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যে মানুষের অন্তর্জগতের নানা রহস্য যেভাবে উন্মোচিত হতে লাগল, ঠিক তেমনি কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকেরাও উনিশ শতকের জীবনাদর্শ থেকে মুক্ত হয়ে নর-নারীর সম্পর্কের জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব উন্মোচনে প্রয়াসী হলেন । তাই দেখা যায় 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু, বিজয় সেনগুপ্ত, ভূপতি চৌধুরী, সত্যেন্দ্র দাস, সুকুমার ভাদুড়ী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের গল্পে নরনারীর নিষিদ্ধ প্রণয় অভিব্যক্তিতে যেভাবে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মানসিক জটিলতা উপস্থাপিত করা হয়েছে তাতে একান্তই ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অনুগামী । যৌন প্রবৃত্তি বা মিথুনাসক্তিকে কল্লোল-গোষ্ঠীর সাহিত্যিকেরা যে কতখানি প্রাধান্য দিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লিখিত অন্নদাশঙ্কর রায়ের চিঠিতে । সেই চিঠির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

> ..আমার মনে হয় মিথুনাসক্তি নিয়ে আরেকটু ব্যাপকভাবে ভাববার সময় এসেছে । হঠাৎ একই যুগে এতগুলো ছোট বড় মাঝারি লেখক মিথুনাসক্তিকে অত্যাধিক প্রাধান্য দিতে গেলেন কেন ? Personal immorality-তে তাঁদেব আস্থা নেই---race immorality-ই তাঁদের একমাত্র আশা । এবং race immorality-র কুঞ্চিকা হচ্ছে sex । যে বস্তু গত কয়েক শতাব্দীব বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া সাহিত্যে taboo হযেছিল কিংবা বড় জোব বেস্টোরেশন যুগের ইংলন্ডে বা ভারতচন্দ্রীয় যুগের বাংলাদেশে বৈঠকখানা বিহারী বাবুদের মদের সঙ্গে চাঁটের স্থান নিয়েছিল, সেই বস্তুই আজকের সমস্যাসঙ্কুল বিশ্বে নতুন নক্ষত্রের মতো উদয়

হলো । একে যদি বিকারের লক্ষণ মনে করা যায় তবে ভুল করা হবে । আসলে এটা হচ্ছে প্রকৃতির পুনরাবিষ্কার ।...অনেকখানি আবর্জনা না সবালে পুনরুদ্ধার হয় না । sex সম্বন্ধে ঘাঁটাঘাঁটি সেইজন্য বড় বীভৎস বোধ হচ্ছে ।

... sex-কে আমরা বিস্ময়করভাবে প্রণাম করবো । আদিম মানব যেমন করে সূর্যদেবকে প্রণাম করত ।[১৩]

যৌন প্রবৃত্তি সম্পর্কে এখানেই রয়েছে পূর্বসূরীদের ও কল্লোল-গোষ্ঠীর মনোভাবের মৌল পার্থক্য । যৌন মনস্তত্ত্বের ভিত্তিতে সাহিত্য রচনা করে কল্লোলীয়রা যে অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন তা তাঁদের রচনাগুলি বিশ্লেষণ করলেই জানা যাবে । যেমন বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩) গল্পটিতে এক রোমান্টিক পরিবেশ চিত্রণের মধ্যে আসঙ্গ মদিরা পানের উন্মাদনা রয়েছে । লেখার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি —

'তারপর হঠাৎ আমার মুখের উপর কি কতগুলো খস্‌খসে জিনিস এসে পড়ল—তার গন্ধে আমার সর্বাঙ্গ রিমঝিম করে উঠলো । প্রজাপতির ডানার মত কোমল দুটি গাল, গোলাপের পাপড়ির মতো দুটি ঠোঁট, চিবুকটি কি কমনীয় হয়ে নেমে এসেছে, চারুকণ্ঠটি কি মনোরম অশোকগুচ্ছের মত নমনীয়, স্নিগ্ধ শীতল দুটি বক্ষ—কি সে উত্তেজনা, কি সর্বনাশা সেই সুখ তা তুমি বুঝবে না, নীলিমা ।'

যৌন জীবনে দেহ ও মনের, কাম ও কামনার সম্ভোগ ও প্রেমের দ্বৈত সম্পর্ককে গল্পকার এই গল্পে গুরুত্ব দিয়েছেন । বুদ্ধদেব বসুর নিজের গল্পটি সম্পর্কে মন্তব্য—

গল্পটি হয়তো মর্বিড ।[১৪]

গল্পটি সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সমকালের তুমুল আলোড়নের কথা উল্লেক করে বলেছেন, গল্পটি—

হালের মাপকাঠিতে হয়ত ফিকে, পানসে । কিন্তু এর জন্য সেদিন চাবদিকে তুমুল হাহাকার পড়ে গেল—গেল, গেল, সব গেল—সমাজ গেল, সাহিত্য গেল—ধর্ম গেল, সুনীতি গেল ।[১৫]

বলা বাহুল্য, সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদির দোহাই দিয়ে যাঁরা সেদিন প্রতিবাদ জানালেন, তাঁরা ছিলেন প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল । তাই তাঁরা যুগধর্মকে, যৌন মনস্তত্ত্বের উদ্‌ঘাটনকে স্বীকার করে নিতে পারছিলেন না অথচ সেই স্বীকৃতি ছিল 'রজনী হল উতলা' গল্পের স্বগতোক্তিতে। প্রাচীনপন্থীদের বিরুদ্ধে এখানেই 'কল্লোলে'-এর আন্দোলন ।

বিজয় সেনগুপ্ত তাঁর 'আঁধি' (কার্তিক, ১৩৩১) গল্পের নায়ক ও নায়িকা উভয়ের গোপন প্রেম, তাদের সূক্ষ্ম আকাঙ্খা, না পাওয়ার বেদনা ইত্যাদি প্রকাশ করেছেন । যতীন ও প্রতিভার প্রেমের ও বিবাহের গোপন ইচ্ছা ছিল অবদমিত । এই গল্পে উভয়ের অবদমিত মনের জটিল অবস্থা লেখক বর্ণনা করেছেন । গল্পকারের ভাষায় বলা যায়, যতীনের 'এখনো তার বিয়ের কথা মনে করতে গেলেই প্রতিভার কথা মনে পড়ে । বিয়ে আর প্রতিভা এই দুই কথা আজো তার মনে এক সূত্রে গাঁথা হয়ে আছে । অপরপক্ষে এক সন্তানের মাতা প্রতিভা যতীনদার বিবাহের কথা শুনে 'তার মনের ভেতর বিষম টানা হেঁচড়া পড়ে গেল তা কে বলবে ? ...যতীনদা বিয়ে

করবে সে তো ভালই। এই কথাটা সে বার বার মেনে নিতে চাইলে, কিন্তু মন কিছুতেই সায় দিল না, এতে তার অন্তরের জ্বালা আরও বেড়ে উঠল।'

অনিন্দিতা দেবীর 'স্বীকার' (মাঘ, ১৩৩৪) গল্পেও বিবাহিতা নারী সুনীতির পূর্ব গোপন প্রণয়ের কথা চিঠিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। সুনীতি তার পূর্ব প্রণয়ী অরুণকে লিখেছে—

'কুমারী জীবনের সমগ্র ভালোবাসা.. ...আমি উৎসর্গ করেছিলাম, তোমার সে দেবত্বে আমার বিশ্বাস আছে। পরজন্মে যেন সেবার সুযোগ ভগবান দেন,' এখানেও তার অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত।

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরস্ত্রী' (ফাল্গুন, ১৩৩৪) গল্পেও নিষিদ্ধ পূর্ব প্রণয়ের কথা ব্যক্ত এবং নায়কের অবদমিত ইচ্ছাও প্রকাশিত হয়েছে। বীণা বিবাহিতা এবং তার পূর্ব প্রণয়ী ছিল বিজন। তাদের আবাল্য প্রেম তার বিস্মৃত হয়নি। এই গল্পে যৌন বিদ্রোহের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। পূর্ব প্রণয়িনী পরস্ত্রী জেনেও তার পূর্ব প্রণয়ী বিজন নিজে স্বীকার করে বলেছে— 'ভবিষ্যৎ ভুলে গিয়ে শুধু তৃষিত আবেগে বীণার বিকম্পিত দেহখানি নিজের বুকের ভিতর টেনে নিয়েছিলাম। নিয়ে আমার সেই যৌবন জীবনের অসম্পূর্ণ চুম্বন নিবেদন সম্পূর্ণ করে অন্তরের উৎস মুক্ত করে নিয়েছিলাম।' এমনভাবে তার আবেগ, তার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়েছে যেখানে তার যৌনতার মুক্তি ঘটেছে বলা যায় কিন্তু বিবাহিতা নারীর প্রচলিত সংস্কার বোধে কোন আঘাতের কথা এখানে উল্লেখ করে তার অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ করা হয়নি।

সত্যেন্দ্র দাসের 'রামধনু' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬) গল্পের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা একটু ভিন্ন ধরনের। এই গল্পে নায়ক, মমতা ও ললিতা দুজনকেই ভালোবাসে। আসলে মমতা পল্লীপ্রকৃতির মেয়ে আর ললিতা শহুরে মেয়ে। নায়কের সঙ্গে ললিতার ভালবেসে বিবাহ হলেও, মমতাকে সে বিস্মৃত হতে পারেনি। তাই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও অন্তর্দ্বন্দ্বটি গল্পকার বেশ নিপুণ মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে প্রকাশ করেছেন। মিলন রাত্রে নায়কের মনে হয়েছে—

'ললিতা যদি মমতা হইত তবে বুঝি এ রাত্রে সেও এমনি করিয়া আমার কোলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকিত। ললিতা ঘুমাইয়াছে, ঘুমাইয়া ভাল করিয়াছে, কিন্তু মমতার চোখে আজ রাতে কিছুতেই ঘুম আসিত না। ...ললিতা যদি মমতা হইত।' এমনভাবে নায়কের অবচেতন মনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যক্ত করে তার মনস্তত্ত্ব উদঘাটন ও বিশ্লেষণে লেখক যথেষ্ট কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

সুধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের 'জংলা' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩২) গল্পটিতে লক্ষ করা যায় মনস্তত্ত্বের আলোকে এক নারীর হৃদয়ে একদিকে প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষের ভাব জাগ্রত হয়েছে, অপরপক্ষে প্রেমের জন্য আত্মবিসর্জনও প্রদর্শিত হয়েছে। কাহিনীগত দিক থেকে দেখা যায় জংলা ও স্বরূপ এক চা-বাগানে কাজ করে। ছোটবেলা থেকেই তাদের দুজনের ভাব এবং শীঘ্রই তারা বিবাহ করবে স্থির করে। কিন্তু ইতিমধ্যে উজ্জ্বলা নামে এক বিধবা কুলি যুবতী স্বরূপকে হস্তগত করবার জন্য তাকে মদ খাওয়ায় এবং জংলার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার ও বিদ্বেষের ভাব জাগ্রত করতে চায়। আসলে জংলা ও এই যুবতী পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। যেখানে এই বিধবা যুবতীর হৃদয়ে

যতখানি প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষের ভাব ছিল, সেখানে জংলার হৃদয়ে ছিল ততখানি আত্মনিবেদনের আনন্দ। তাই স্বরূপের অসুখে তাকে জংলা সেবা-শুশ্রূষা করল কিন্তু স্বরূপকে কিছুতেই বাঁচাতে পারল না। যখন তার দিনগুলি হতাশায় কাটছিল তখন ডাক্তারের লোক তাকে বারবাব জ্বালাতন করতে লাগল এবং সে নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যা করল। উক্ত গল্পটি মনস্তত্ত্বের বিচারে সার্থক হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গত অমলেন্দু বসুর 'পতি' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩), ভূপতি চৌধুরীর 'হিসাবের বাহিরে' (কার্তিক, ১৩৩২), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'নারীর মন' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০) গল্পেও নিম্নশ্রেণীর জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে এবং তাদের আদিম মনের সন্দেহ, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে উদঘাটিত হয়েছে। সার্থক প্রেমের ভিত্তিতে রচিত বুদ্ধদেব বসুর 'অভিনয় নয়' (কার্তিক, ১৩৩৬), নীলিমা বসুর 'অভিমান' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩১) ও হিরণকুমার বসুর 'অভিসার' (মাঘ, ১৩৩০) গল্পগুলিতেও সন্দেহ, অভিমান, বিরহব্যথা ও মিলনের আনন্দ মনস্তত্ত্বের আলোকে অভিব্যক্ত হয়েছে।

মনস্তত্ত্বের আলোকে বিচার করলে 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত অহল্যা গুপ্তের 'কল্যাণী' (পৌষ, ১৩৩০), প্রবোধ কুমার সান্যালের 'নূপুর' (আশ্বিন, ১৩৩৬), জগদীশ গুপ্তের 'বিগলিত শিলা' (মাঘ, ১৩৩৪) ও 'ঘেন্নার কথা' (আষাঢ়, ১৩৩৩) প্রভৃতি গল্পগুলিতে যৌন বিকৃতি এবং যৌন লালসার চিত্র উদ্‌ঘাটিত করা যায়।

গোকুল নাগের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত 'পথিক' (বৈশাখ, ১৩৩০-কার্তিক, ১৩৩৩) উপন্যাসটি এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ইতিহাসকারের মতে—

পথিক "আধুনিক" উপন্যাসের পথ দেখাইয়াছে।[১৬]

উক্ত উপন্যাসটিতে বিকাশ, জীবন, বিমল, মুকুলের সঙ্গে মায়ার এবং বিকাশ, অমল, অসিতের সঙ্গে দীপ্তির এবং তটিনীর সঙ্গে শ্রীশের, আবার কল্যাণীর সঙ্গে মুনির ও শান্তার সঙ্গে সুপ্রকাশের এইরূপ বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পারিক সম্পর্ক স্থাপন করে মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে তাদের আশা-নৈরাশ্য, মিলন-বিচ্ছেদের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসটিতে লেখক তাঁর চরিত্রগুলিকে আধুনিক মনস্তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করে প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে ও নারীর আধুনিক মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের আধুনিক জীবনের বাস্তব সমস্যা উদ্‌ঘাটন করলেন।

এই প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে' (আশ্বিন, ১৩৩৩—ভাদ্র, ১৩৩৪) উপন্যাসটিকেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। 'বেদে' উপন্যাসে লক্ষ করা যায় নায়ক কাঞ্চন একের পর এক ছ'জন নারী—আহ্লাদী, আশমনী, বাতাসী, মুক্তা, বনজ্যোৎস্না ও মৈত্রেয়ীর সংস্পর্শে এসেছে, তাদের ভালোবেসেছে কিন্তু তার ভাবাসা কোথাও একনিষ্ঠ নয় এবং পরিতৃপ্ত নয়। নরনারীর ভালোবাসা, আসঙ্গলিপ্সা, অপরিতৃপ্তি—ছটি নায়িকা ও একটি প্রধান নায়কের চরিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে লেখক যেভাবে আলোকপাত করেছেন, তাতে এই উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব অনস্বীকার্য।

'কল্লোল'-এর তরুণ লেখকদের অধিকাংশই যে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের দ্বাবা প্রভাবিত হয়ে সাহিত্যরচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন তা অবশ্যই সেই কালে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল । ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে নবনারীর অবচেতন মনের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রতীকায়িত হলেও তাকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করার প্রচেষ্টা তাদের রচনায় লক্ষণীয় নয় । কিন্তু 'কল্লোল'-এর তরুণ লেখকেরা বিষয়টিকে আর নিষিদ্ধ বা আবৃত করে রাখতে চাইলেন না । তাই বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা', অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে', শৈলজানন্দের 'মা', যুবনাশ্বের 'ভুখা ভগবান'-এ সম্ভোগ চিত্রের নানা আয়োজন আছে; কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বা বিস্তৃত । বিশেষ করে অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে'র আহ্লাদীর ও শৈলজানন্দের 'মা' গল্পের পরীর কুমারী অবস্থায় জননী হওয়ার যে বিবরণ আমরা পাই সেক্ষেত্রে লেখকেরা কোথাও তিরস্কারের মনোভাব প্রকাশ করেননি; বরং সেই অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের প্রতি তাদের সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে ।

যদিও 'কল্লোল'-এর লেখকদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল দলের সাহিত্যিকেরা সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্ন তুললেন । বিশেষ করে 'শনিবারের চিঠি' এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিল । 'শনিবারের চিঠি'তে 'মণিমুক্তা' ও 'সংবাদ সাহিত্য' এই দুটি শাখায় লেখক-লেখিকাদের রচনাগুলি সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও নিজেদের মতামত ব্যক্ত করা হত। সজনীকান্ত দাশ 'শনিবারের চিঠি'র লেখকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়ে 'কল্লোল'-এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন, ইতিহাসের নিয়মেই তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আধুনিক সাহিত্যের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী 'কল্লোল' ইতিহাসের পাতায় আপন দায়িত্ব পালনে সাফল্যের আসনে অধিস্থিত ।

বস্তুতপক্ষে, অন্ত্যজ শ্রেণীর ব্যভিচার কিংবা নারীর পদস্খলনের পিছনে তাঁরা মুখ্যত দেখেছেন সম্ভোগের তাগিদ, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ এবং সামাজিক অত্যাচার ও নিরাশ্রয়তা । বলা যায়, কল্লোল-গোষ্ঠীর কথাসাহিত্যে যে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েছিল তার মূলে ছিল পূর্বকালীন সাহিত্যিকদের রক্ষণশীল মনোভাব ও শুচিতাবোধের প্রতি প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, তৎকালীন সংস্কৃতি মানসের অনুবর্তন, পাশ্চাত্য জীববিদ্যা ও মনস্তত্ত্বের নতুন নতুন আবিষ্কার, বিশেষত ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য বিশেষত নরওয়ে ও ফরাসী সাহিত্যিকদের প্রতি আত্যন্তিক আগ্রহ ।

কল্লোল -গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল । ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, চটকল ও ছাপাখানায় শ্রমিক, ধর্মঘট, ১৯২৬-২৭খ্রিস্টাব্দে শ্রমিক-কৃষক পার্টি স্থাপন ইত্যাদি এযুগের ঐতিহাসিক প্রধান ঘটনা । অপরপক্ষে বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই সন্ত্রাসবাদের প্রচলন, অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর প্রভৃতি দল গড়ে ওঠা, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারের বিরুদ্ধে এবং ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রাওলাট রিপোর্টে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্বের বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ও তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা, কল্লোল-গোষ্ঠীর তরুণ

লেখকবৃন্দকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল ।

'কল্লোল'-এর তরুণ লেখকগোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ না হলেও তার পরোক্ষ প্রভাবকে তাঁরা অস্বীকার করতে পারেননি । যেমন 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত গোকুল নাগের 'পথিক' (বৈশাখ, ১৩৩০-কার্তিক, ১৩৩১) উপন্যাসে স্বদেশী আন্দোলনের এক বাস্তব চিত্র লক্ষণীয়—

'আজ এক হপ্তা হইল শ্রীশ জেল হইতে ফিরিয়াছে । পথের ধারে দোকানে কতগুলি মহিলা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবার অনুরোধ করিয়া ফিরিতে ছিলেন । পুলিশ শান্তি-ভঙ্গের জন্যে তাহাদিগকে ধরে এবং পুলিশের ব্যবহার মহিলাদিগের উপযুক্ত হয় নাই বলিয়া প্রতিবাদ করিতে গিয়া শ্রীশ, তার বন্ধু সুধীর এবং আরও কতগুলি যুবক ধৃত হয় ।'

এছাড়া সেই সময় ব্রিটিশ বিচারের প্রহসনও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

'বিচারে শ্রীশ এবং ঐ দলের অন্য কতকগুলি যুবকের সশ্রম কারাদন্ড হয়, কিন্তু সুধীরের এই সঙ্গে হয় নাই; কারণ সুধীরের সুগঠিত দেহ । তাহার বিচার হইতে লাগিল শহরের খুনী গুন্ডা এবং ডাকাত প্রভৃতির সঙ্গে ।'

'কল্লোল'-এ প্রকাশিত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মিলন' (ফাল্গুন, ১৩৩১) গল্পেও অনুরূপ চিত্র লক্ষ করা যায়, তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মিছিল' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫-আষাঢ়, ১৩৩৬) উপন্যাসটি । গান্ধীজীর প্রদর্শিত জাতীয় আন্দোলন ও মতাদর্শের প্রভাব এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রে লক্ষণীয় । জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে রবীন, শচীন প্রমুখের আত্মত্যাগ, দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধন, দেশসেবা এই উপন্যাসের প্রধান বিষয় । তাই লক্ষ করা যায় রবীন স্বহস্তে চরকায় কাটা কাপড় পবিধান করতে চেয়েছে, পল্লী সংগঠন কাজে আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছে । অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবনে ভেসে এসে সে জেলে গিয়েছে, তারপরে মেসে তার সঙ্গে অন্যান্য স্বদেশী যুবকদের কৃচ্ছ্রসাধন ও অনাহারক্লিষ্ট দুর্ভোগ স্বদেশী আন্দোলনের যুগের চিত্র স্মরণ করিয়ে দেয় ।

সুনীলকুমার ধরের 'সংস্কার' (চৈত্র, ১৩৩৫) গল্পেও অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব নির্দেশ করা যায় । উক্ত গল্প থেকে কিছু অংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

'সারা বাংলায় তখন অসহযোগের মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে । তাহার একটু আবহাওয়া এই স্কুল বাড়িতেও আসিয়া লাগিল । বড় ছেলেরা যুক্তি করিয়া ছোটদের ভয় দেখাইয়া একদিন সকলে জোট বাঁধিয়া 'মহাত্মাজী কী জয়' বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল । আর তাহারা গোলাম হইতে শিখিবে না ।'

এখানে ছাত্রদের পিকেটিং-এর কথা, বিলিতি বস্ত্র পরিত্যাগ করে স্বদেশী বস্ত্র পরিধান, রাস্তাঘাট সংস্কার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে স্বদেশ সেবার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে । গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন আলোচ্য গল্পে সুস্পষ্ট ও গভীর । এইভাবে লক্ষ করা যায়, সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনের স্পর্শ 'কল্লোল'-এর বচনাকে এক নতুন মাত্রা দান করতে সমর্থ হয়েছিল।

'কল্লোল'-এর প্রধান ধর্ম যে যৌবনের উদ্দামতা ও রক্ষণশীলতার প্রতি বিদ্রোহ তার

সর্বাধিক প্রকাশ কবিতায় এবং সেক্ষেত্রে নজরুলই অগ্রগণ্য । বিদ্রোহী কবি নজরুলের বীর্য কণ্ঠ থেকে বিদ্রোহের বাণী ধবনিত হয়েছে 'কল্লোল'-এর পাতায় একেবারে প্রথম থেকেই । ১৩৩১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত নজরুলের 'ঝড়' কবিতাটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়—

ঝড় কোথা কই ?
বিপ্লবের লাল ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ,
ঐ শোনো শোনো তার হ্রেষার চিক্কুর,
এই তার ক্ষুর-হানা মেঘে ।
না, না, আজ যাই আমি; আবার আসিব ফিরে
হে বিদ্রোহী বন্ধু মোর ! তুমি থেকো জেগে ।

নজরুলের এই জাতীয় বিপ্লবাত্মক কবিতা সমকালের বিভিন্ন নবীন-প্রবীণ লেখকদের উজ্জীবিত করেছিল । তাই তাঁরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহের সুর তুলেছেন 'কল্লোল'-এর পৃষ্ঠায় । এক্ষেত্রে দীনেশরঞ্জন দাশেব 'ওঠ বীর' (মাঘ, ১৩৩০) যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'কান্ডারী' (কার্তিক, ১৩৩৩), বিভাবতী দেবীর 'বিদ্রোহী' (কার্তিক, ১৩৩২), সুধীরকুমার চৌধুরীর 'বিদ্রোহ' (ফাল্গুন, ১৩৩০) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

সমাজের নীচুমহলের আনাগোনা 'কল্লোল'-এর গল্প উপন্যাসে যতটা কবিতায় ততটা নয় । কারণ কবিতার রাজ্যে প্রেম ও নারীর ভিড়ে সমাজ ও জীবনের অন্যান্য সত্য তেমন জায়গা পায়নি । তবু কিছু কবিতায় কবিদের জনচেতনার সাক্ষর আছে । এদিক থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বেনামী বন্দর' (ভাদ্র, ১৩৩২) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা—

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
জগতের যত হতভাগাদের ভিড়
মাল বয়ে বয়ে ঘাল হল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয় নীড় ।

এছাড়াও দীনেশরঞ্জন দাশের 'লক্ষ্মীছাড়া' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০), অচিন্ত্যকুমাব সেনগুপ্তের 'সার্বজনীন' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬) কবিতাতেও গণচেতনার সাক্ষর বর্তমান।

'কল্লোল'-এর কিছু কিছু কবিতায় এক দুঃখ বিলাসিতা বা বিষাদাত্মক জীবন দর্শন রূপায়িত । যেমন—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'অনাগত কবি' (ফাল্গুন, ১৩৩১), সুধীরকুমার চৌধুবীর 'অম্লান পুষ্প' (ভাদ্র, ১৩৩১), বুদ্ধদেব বসুর 'কাল' (আষাঢ়, ১৩৩১), জীবনানন্দ দাশের 'সিন্ধু' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪), অজিত দত্তের 'রুদ্রলীলা' প্রভৃতি কবিতায় যে বেদনার বেদগান রচিত হয়েছিল তা অবশ্যই রবীন্দ্রোত্তর এক অদ্ভুত কাব্যদর্শন । বিশেষ করে এক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথ

সেনগুপ্তের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাঁর 'দুঃখবাদী' (ফাল্গুন, ১৩৩০), 'প্রাপ্তি স্বীকার' (শ্রাবণ, ১৩৩৪) প্রভৃতি কবিতায় যেভাবে জীবনের নৈরাশ্যময় অন্ধকার দিকটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ব্যঙ্গের আড়ালে তা বাংলা কাব্যে নতুন ভাবনার দিশারী ।

যে যৌবনের জয়পতাকা উড়িয়ে কল্লোল-গোষ্ঠীর সাহসী আবির্ভাব তার সর্বাধিক প্রকাশ কবিতাবলীতেও লক্ষণীয় । কবিতার বাধাহীন আকাশের মধ্যে যৌবনের বহুবর্ণ রঙ্গরাগ ছড়িয়ে আছে । দুরন্ত আবেগ, অনন্ত কামনা, কাব্যকল্পনার ডানায় ভর দিয়ে বল্‌গাহীন ভাবে মেতে ওঠে । 'কল্লোল'-এর প্রাণপুরুষ গোকুলচন্দ্র নাগকে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন 'যৌবন পথিক', 'নব বসন্তের সুরভিত দক্ষিণের বাতাস' । এই যৌবন পথিক গোকুলচন্দ্রের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত 'পথিক' উপন্যাসে দেখা যায় যৌবনের মেলা । গোকুলচন্দ্রের সহযোগী তরুণ কবিরাও সুর মেলালেন যৌবনের জয়গানে । সুনীতিদেবীর 'কল্লোল' শীর্ষক কবিতায় তাই দেখা যায় তারুণ্যের জয়ধবনি—

বাংলাদেশের ঘরে ঘরে জাগলো তরুণ প্রাণ;
জমাট করা অন্ধকারের বিশাল প্রাচীর টুটে
উৎসারিত আলোর পানে বেড়িয়ে এল ছুটে —
চক্ষে তাহার নবীন দীপ্তি কণ্ঠে নতুন গান ।

এরই সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর 'শাপভ্রষ্ট' (কার্তিক, ১৩৩৩), নজরুল ইসলামের 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কবি-নাস্তিক' (মাঘ, ১৩৩১), নরেন্দ্র দেবের 'তারুণ্য' (শ্রাবণ, ১৩৩৬), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'সূর্য' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২) প্রভৃতি কবিতায় যৌবনের দীপক তান ধবনিত হতে শোনা গেল ।

সর্বোপরি রবীন্দ্রবলয়কে অতিক্রম করে এক নতুন পথের সন্ধান দিলেন এই কবিরা । আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও স্তবক, অক্ষর, মাত্রা সৌষম্যের বদলে যে শৈথিল্য প্রকাশিত হয়েছিল, তাই ভাবীকালের গদ্য কবিতার ব্যাপক চর্চার পথকে বিস্তৃত করলো । সুধী সমালোচকের মতে —

> সাধারণভাবে আধুনিক বাংলা কবিতার প্রকরণিক ভিত্তিপ্রস্তর জুগিয়ে বিশেষভাবে কোনো কোনো তরুণ কবির স্বকীয় বাণীবন্ধন কর্মের সূত্রপাত করে কল্লোল এক ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়েছে । নজরুলের দ্রোহাত্মক প্রভাষণ কিংবা গজল গানের অন্তরঙ্গধ্বনি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের গণচেতনার সংহত স্বরায়ণ, বুদ্ধদেব বসুর প্রবৃত্তিবশ্যতার উদ্দাম উচ্চারণ এবং জীবনানন্দ দাসেব 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে' নির্জন সংলাপ—এই সমস্তই যৌগিক বিন্যাসে যেমন এক রবীন্দ্রেতব সামগ্রিক স্বরভঙ্গির জন্ম দিয়েছে, তেমনই পৃথক পৃথক নিহিতার্থে এক একটি বাচনিক বলয় রচনা করেছে । আজ আমবা কবিতাব কারুকর্মে প্রেমেন্দ্রীয় বা জীবনানন্দীয় বা বুদ্ধদেবীয় ঢঙ বলতে যা বুঝি তার অবতারণা কল্লোলের কালে এবং পরবর্তীকালে তার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা । সে কারণে বাংলা কবিতার আধুনিক পর্যায়ে কল্লোল যে প্রকরণিক মাত্রা নির্দেশ করেছে, তার মর্যাদা অনেক।[১১]

বাংলা সাহিত্যের সমস্ত অঙ্গনে স্বচ্ছন্দে পদচারণা করেছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং সর্বক্ষেত্রেই তিনি স্বরাট । আলোকসামান্য শিল্পব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার ফলে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে ও কথাসাহিত্যে

অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তরুণ শিল্পী গোষ্ঠীর পরম শ্রদ্ধাভাজন। 'কল্লোল'-এর তরুণ শিল্পীরা সেই সূর্যপ্রতিম প্রতিভার দিব্যদ্যুতিতে বিমূঢ়, অভিভূত। কিন্তু সামগ্রিক মূল্যবোধের ক্রম-পরিবর্তনের ফলে 'কল্লোল'-এর এইসব তরুণ উদীয়মান শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথকেও বিরোধিতা করতে আরম্ভ করলেন। এই গোষ্ঠীর বিশিষ্ট লেখক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন —

> যাকে কল্লোল যুগ বলা হয় তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।[১৮]

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালপর্বে সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, নৈতিক চেতনা— এক কথায় সমগ্র জীবন সম্পর্কে এক সংশয়-পীড়িত মূল্যবোধ যখন দেখা দিল তখন সাহিত্যেও তা সংক্রামিত হল।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেও যুবসমাজের প্রাণপিপাসা ও সাহিত্যতৃষ্ণার পূর্ণ নিবৃত্তি হয়নি রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে। যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আবর্তে পড়ে এ যুগের ক্রমোদ্ভিদ্যমান কৈশোর ও নবযৌবন চেতনার অঙ্কুরগুলি নিষ্পিষ্ট হয়েছে, যে অস্থিরতা বিষণ্ণতা ও নাস্তিক্যবোধ তাদের চেতনাকে অপ্রকৃতিস্থ করে তুলেছে, আবার আরেকদিকে যে চেতনা বিপ্লবী সমাজবাদী ভাবাদর্শ ও অবচেতনাশ্রয়ী যৌন ভাবনায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে—তাদের কোনটিই রবীন্দ্রনাথের অচল-প্রতিষ্ঠ অধ্যাত্ম-প্রবণ কল্যাণ-পরিণামী জীবনাদর্শের ভিত্তি শিথিল করতে পারেনি। তিনি এই যুগসঙ্কটকে প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু তাঁর শিল্পসত্তা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বরে তাঁর গভীর আস্থা যুগসঙ্কটের আঘাতে ভেঙে পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের প্রগতিশীল চিন্তাধারা যুগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাহিত্যের সমকালীন উপকরণ-বিষয় ও আঙ্গিক, আধার ও আধেয় অনেক কিছুকেই গ্রহণ করেছে কিন্তু তা কখনও জীবনের অন্তর্নিহিত মৌলনীতি ও বিশ্বাসের মূল্যে নয়।

একালের শিথিল-প্রত্যয়, অস্থিরচিত্ত, বেপরোয়া 'বিদ্রোহী' যুবমানসের কাছে রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পচেতনা 'যুগোপযোগী' বলে মনে হল না। তাদের কাছে কেবল কবিতার ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের আদর্শনিষ্ঠা এবং দেহচেতনার ঊর্দ্ধচারী এক দিব্য প্রেমচেতনায় আস্থা অপ্রীতিকর ঠেকল, উপন্যাসেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকাংশে অবাস্তব বলে মনে করলেন যুবসমাজ। 'চোখের বালি' এবং 'বিনোদিনী' চরিত্রও তাঁদের চোখে 'শুচিতায়' ভরা। 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত তরুণ প্রবন্ধকারের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করছি —

> ...কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের সবটুকু দান এক করিয়া বিচার করিলেও মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ জীবনের একটি দিক বাদ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সুচিত্রিত চরিত্রগুলির সকলই যেন শুচিতায় ভরা; এমনকি বিনোদিনীর মধ্যেও পঙ্কিলতা নাই। মানুষ যেখানে সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া বসিয়া আছে — হয়তো তাহার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে সত্যের স্ফুলিঙ্গটুকু বাঁচিয়া আছে মাত্র— সেখানে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাই না।[১৯]

এই সময়ে প্রকাশিত হয়ে গেছে 'নষ্টনীড়' (১৩০৮), 'চোখের বালি' (১৩০৮-৯), 'চতুরঙ্গ' (১৩২১), 'ঘরে-বাইরে' (১৩২২)। কিন্তু এই একই উপন্যাস বা চরিত্র সম্পর্কে

আবার একশ্রেণীর সমালোচকের মন্তব্য আমরা উদ্ধার করতে পারি—

> 'কাম প্রবৃত্তির পোষাকী রূপ' রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে যে বাস্তবের সহিত আমরা পরিচিত হই, তাহাতে শুধুই রক্তমাংস—ইন্দ্রিয় লালসার নগ্ন ও কুৎসিত মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তব এখানে রক্তমাংসের, ভোগ-লালসার ; ইহা অনিত্য, মিথ্যা ও সমাজদ্রোহী।[২০]

যৌন মনস্তত্ত্ব ও দারিদ্রের অভিজ্ঞতা—রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে মুখ্যত এ দুয়ের তথাকথিত অভাববোধ তরুণ লেখকগোষ্ঠীকে রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত পথ থেকে সরিয়ে আনল। রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র সুরে সাহিত্য সৃষ্টির একটি ধারা প্রথমে প্রকাশ পেল কাব্যের ক্ষেত্রে—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বুদ্ধিদীপ্ত দুঃখবাদ, মোহিতলাল মজুমদারের বলিষ্ঠ দেহাত্মবাদ এবং নজরুলের বেপরোয়া বিদ্রোহী যৌবনধর্মের মধ্য দিয়ে। এই আবহাওয়ার মধ্য থেকেই জন্ম নিয়েছে কল্লোলগোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর কবিতায় ও কথাসাহিত্যে রবীন্দ্র-উত্তরণের প্রয়াস সুস্পষ্ট। 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'আবিষ্কার' (কার্তিক, ১৩৩৬) কবিতার বিদ্রোহ-বাণীর মধ্য দিয়ে সমগ্র গোষ্ঠীর মনোভাব ধ্বনিত হয়েছে —

> সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,
> আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
> যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর !
> গভীর আত্মোপলব্ধি—এ আমার দুর্দান্ত সাহস,
> উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছি নব নর-জন্ম-সম্ভাবনা;
> অক্ষরতুলিকা মোর হস্তে যেন রহে অনলস,
> ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি—নবীন প্রেরণা !

বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিচার প্রসঙ্গে বলেছেন—

> তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হলো তাঁর জীবন-দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।[২১]

এ শুধু বুদ্ধদেবের কথা নয়, সমগ্র কল্লোলগোষ্ঠীরই মনোভাব। তরুণ কল্লোলীয়দের বিদ্রোহ মূলত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে নয়, বিদ্রোহ ঐ জীবনাদর্শনের বিরুদ্ধে। এই বিরোধিতার মধ্য দিয়ে তরুণ গোষ্ঠীর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপকে চিনে নিতে হবে। নতুবা তা নিছক রবীন্দ্র-বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত রচনার প্রহসনে পরিণত হবে।

'সবুজপত্র'-এর যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথ সবুজের অভিযানকে সমস্ত অন্তর দিয়ে সমর্থন করে এসেছেন। তা সত্ত্বেও 'কল্লোল'-এর তরুণ লেখকগোষ্ঠীর রবীন্দ্র-বিরোধিতার কারণ অনুসন্ধানে সুধী সমালোচকের বিশ্লেষণটি যথার্থ বলেই মনে হয় —

> এই অর্থে তিনি নিজেই বিশ শতকেব তৃতীয় দশকেব কল্লোল গোষ্ঠীর যুবসমাজেব উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকাংশে প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু তবু শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র পথে যেতে চাইল যুবসমাজ তথা 'কল্লোলগোষ্ঠী'।

সবুজপত্রেব যুগে রবীন্দ্রনাথ যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাণী প্রচার করেন তার পবেই যুদ্ধোত্তর কালের নানা ঘটনার প্রভাবে যুবমনেব ভারসাম্য বিচলিত হয় । সেই অস্থির অনিশ্চিত ভাবোম্মাদনার মুহূর্তে যুবচিত্ত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অন্তর্নিহিত সুগভীর তত্ত্বনিষ্ঠার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ না করে তার 'বিদ্রোহে'র, তার 'অবিবেচনা'র 'উদ্ধত বেগ'টিকে গ্রহণ করতে চাইল । চলার সেই 'উদ্ধত বেগে'র মুহূর্তে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই শুনতে হল, 'হেথা হতে যাও পুরাতন' ।[২]

কল্লোল-গোষ্ঠীর এই মনোভাব সম্পর্কে একজন কল্লোলীয়ান সঠিক বলেছেন—

রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল' । সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায় । নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসারে । কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাথে । প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায় ।[২৩]

কল্লোল-গোষ্ঠীর মানসগঠনে ও শিল্পসৃষ্টিতে যেমন পারিপার্শ্বিক জীবনের নানা প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল, অপরপক্ষে তেমনি পাশ্চাত্য প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় না । ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলাদেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনচর্চার যে সূত্রপাত হয়েছিল কল্লোল-গোষ্ঠীর পাশ্চাত্য জীবন ও সাহিত্যচর্চা এবং তার প্রভাবকে সাঙ্গীকরণ করে তাদের রচিত সাহিত্যে তা প্রবলতর হতে লাগল । নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজনের 'কল্লোল'-এ প্রকাশিত পাশ্চাত্য লেখকদের জীবনী ও সাহিত্য অবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধ গুলি থেকে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রমাণ নির্দেশ করা সম্ভব । যেমন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'ন্যুট হামসুন' (ফাল্গুন, ১৩৩১), 'ম্যাক্সিম গর্কী' (চৈত্র, ১৩৩১), 'রুশ সাহিত্য ও তরুণ বাঙালী' (বৈশাখ, ১৩৩৩), 'টমাস হার্ডি' (মাঘ, ১৩৩৪), শেলী (আষাঢ়-মাঘ, ১৩৩৫); হুমায়ুন কবীরের 'এইচ. জি. ওয়েলস' (ভাদ্র, ১৩৩৪) ইত্যাদি ।

বিদেশী গল্পের অনুবাদও 'কল্লোল'-এ প্রচুর প্রকাশিত হয়েছিল । যেমন—অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়ের 'উৎসব রাতে' (ইটালীয়ান লেখক Masuecio of Saleruo -এর Friend in Love;ফাল্গুন, ১৩৩২);তারানাথ রায়ের 'সন্ন্যাসী' (Chekov-এর The Black Monks;আশ্বিন, ১৩৩৪); সুবোধ দাশগুপ্তের 'তেপান্তরের মাঠে' (ম্যাক্সিম গর্কীর In the Steppes; ফাল্গুন, ১৩৩৪); সুধীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্বীপান্তরের আসামী' (ফরাসী লেখক Francois Coppe-এর The Substitute, শ্রাবণ, ১৩৩৬) ইত্যাদি । লক্ষণীয় যে, কল্লোল-গোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন লেখকের রুশ, ফরাসী, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান লেখকদের প্রতি অনুরাগ ছিল সবচেয়ে বেশি । কল্লোল-গোষ্ঠীর মানস গঠনে পাশ্চাত্য প্রভাবের সমর্থনে 'কল্লোল'-এর লেখক অমলেন্দু বসুর অভিমত এক্ষেত্রে উদ্ধৃতব্য—

ভিক্টর হুগোর বইও তাঁহারা পড়িতেন । টলস্টয়, তুর্গেনিভের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ের অন্তরঙ্গ তা আছে । উপরন্তু তরুণগণ হার্ডি, গলসওয়ার্দি পড়েন, আবার ওযাইলড, বার্ণার্ড শ'র সহিত পরিচিত আছেন । ফ্রাঁস, রঁল্যা, আদ্রিদের তাঁহারা অনুরাগী, নগুচী, ইয়েটস-এর তাঁহারা ভক্ত । পুরাতনপন্থীরা হযতো বিশ্বাস কবিতে চাইবেন না যে, যে বয়সে তাঁহারা মেরিডিথ, বালজাক পড়িতেন, সে বযসে তরুণগণ কিরূপে এইসব লেখকের লেখা পড়িয়া

আধুনিক সাহিত্যের চর্চা করেন ।[২৮]

রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও মার্কসবাদের বাস্তব রূপায়ণ পাশ্চাত্য সমাজ ও চিন্তাধারায় যে পরিবর্তন এনেছিল তার প্রভাব পাশ্চাত্য সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে সংক্রামিত হয়েছিল । ফলত-পূর্বসুরীদের অপেক্ষা কল্লোল-গোষ্ঠীর জীবনদৃষ্টিতে ও শিল্পসৃষ্টিতে তুলনামূলকভাবে অধিক পরিমাণে বস্তুবাদী চিন্তা, বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার প্রভাব লক্ষ করা যায় । তাই সুকুমার ভাদুড়ীর 'ঝাপট', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'দুনিয়াদারি', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'গুমোট' প্রভৃতি গল্পে কেরানীর আর্থিক দুর্দশার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার জন্য সমকালীন সামাজিক, আর্থিক পরিস্থিতির দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ না থাকলেও গল্পকারদের জীবনদর্শনে রুশ সাহিত্যিকদের প্রভাব প্রতিভাত হয় । বিশেষ করে, গোগোলের 'ওভারকোট' অথবা চেকভের 'ডেথ অব এ ক্লার্ক' নামক গল্পে লেখকদের যে সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে 'কল্লোল'-এর উক্ত গল্পগুলিতেও সমধর্মী জীবনদর্শন প্রতিভাত ।

শ্রমিকদের জীবনকে আশ্রয় করে শৈলজানন্দের গল্পগুলিতেও এমিল জোলার 'Germinal', সিনক্লেয়ারের 'Oil' অথবা গলসওয়ার্দির 'Strife' নাটকের বিষয় ও চরিত্রের প্রভাব লক্ষণীয় । শ্রমিকজীবনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পাশ্চাত্য লেখকদের ন্যায় 'কল্লোল'-এর এই পর্যায়ের সাহিত্যিকদের কথাসাহিত্যে অবশ্য লক্ষণীয়।

পতিতাদের জীবনীভিত্তিক গল্পগুলিতেও পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ করা যায় । এই পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে, বন্দী ভগবান কাঁদে', কিংবা মনীষ ঘটক, জগদীশ গুপ্ত, সুকুমার ভাদুড়ী, সুবোধ দাশগুপ্ত প্রমুখের গল্পে বারবণিতাদের জীবনের নানা সমস্যা বাস্তব দৃষ্টিতে সহানুভূতি সহকারে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার জন্য দস্তয়ভস্কির 'Crime and Punishment', টলস্টয়ের 'Ressurection', বার্ণার্ড শ'র 'Mrs. Warren's Profession, এমিল জোলার 'Nana' প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত পতিতাদের জীবনসমস্যা, বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও মমতাবোধের কথা মনে পড়ে । দস্তয়ভস্কির অঙ্কিত সোনিয়া অথবা টলস্টয়ের চিত্রিত মাসলোভার মতো হতভাগ্য গণিকাদের আর্থিক দুর্দশার পরিচয় প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীষ ঘটক, সুকুমার ভাদুড়ী প্রমুখ গল্পকারের উপস্থাপিত পতিতাদের আর্থিক জীবনের চিত্রাঙ্কনে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য লেখকরা পতিতা জীবন সম্পর্কে যে অনুসন্ধিৎসা, আর্থিক ও সামাজিক জীবনের বিশ্লেষণ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন, তার জন্য কল্লোল-গোষ্ঠীর আলোচ্য লেখকরা উক্ত সাহিত্যিকদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন ।

কল্লোল-গোষ্ঠীর কথাসাহিত্যে যেমন পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের সামাজিক দৃষ্টির প্রভাব পড়েছে, অপরপক্ষে তেমনই তাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবও লক্ষ করা যায়। মার্কস-এঙ্গেলস্-এর মতবাদ প্রসারের ফলে যেমন একদিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে কল্লোল-গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন; ফ্রয়েড, ইয়ুঙ, হ্যাভলক প্রমুখের মনস্তাত্ত্বিক বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলে তেমনই ব্যক্তিমানুষের মনোরাজ্য সম্পর্কে তাদের অধিকতর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় । বুদ্ধদেব বসুর 'অভিনয় নয়' গল্পের এক জায়গায় আছে —

ফ্রয়েড পড়ে অবধি আমার মনে হয়েছিল যে, পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস নেই—থাকতে পারে না—যা আমি না বুঝতে পারি ।[২৫]

আসলে এ শুধু গল্পের কথকের মনের কথা নয়, 'কল্লোল'-এর আবির্ভাবকালে বাংলার নবোদ্ভূত যুবসম্প্রদায়ের মনের কথা । সাইকো-অ্যানালিসিসের সূক্ষ্মতম অনুবীক্ষণ হাতে নিয়ে তারা জীবন-রহস্যের সিংহদ্বারে প্রবেশ করে তার সবটুকুই ধরতে চাইছিলেন । তাই বিজয় সেনগুপ্তের 'আঁধি', বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা', সত্যেন্দ্র দাসের 'রামধনু', সুকুমার ভাদুড়ীর 'ঋণশোধ', অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'শীতের নিঃশ্বাস' প্রভৃতি গল্পে নিষিদ্ধ প্রণয় অভিব্যক্তিতে যেভাবে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মানসিক জটিলতা উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাতে ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আভাস পাওয়া যায় । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাসে মিথুনাসক্তির প্রকাশের মধ্যে নরওয়ে সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ করে বলেছিলেন—

তোমার কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও অজস্র বৈচিত্র্য দেখে আমি মনে মনে তোমাব প্রশংসা করেচি । সেই কারণেই এই দুঃখ বোধ করেচি যে কোনো কোনো বিষয়ে তোমার অত্যন্ত পৌনঃপুন্য আছে—বুঝতে পারি সেখানেই তোমার মনের বন্ধন । সে হচ্ছে মিথুনাসক্তি । সে প্রবৃত্তি মানুষের নেই বা তা প্রবল নয় এমন কথা কেউ বলে না । কিন্তু সাহিত্যে সকল বিষয়েই যেমন সংযম আবশ্যক, এক্ষেত্রেও ।...

আধুনিক কোনো কোনো বিখ্যাত লেখকের রচনায় মাটির প্রতি মানুষের প্রবল আকর্ষণের বর্ণনা দেখেছ, সেইটের প্রভাব ভুলতে পার নি ।...

এ সম্বন্ধে উগ্রতা নরওয়ে প্রভৃতি দেশের সাহিত্যে দেখেচি । দেখে, আমি এই মনে করেই বিস্মিত হয়েছি যে আমাদের দেশের মানুষের এই ব্যাপারে এমনতর নিত্যজাগ্রত লালসা নেই । ... এই জন্য নরওয়েতে যেটা দৃষ্টিকটু নয়, আমাদের দেশে সেটা কুৎসিত ।[২৬]

এমনকি আর এক কল্লোলীয় বুদ্ধদেব বসুও 'বেদে'র সঙ্গে Linnarkoski-এর 'The song of the Blood and Flower'এর বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন—

'treatment'-এ না হোক, অন্তত বিষয়বস্তুতে Linnarkoski-এর নায়ক তার অসংখ্য প্রেয়সীর ভিতর দিয়ে একজনকেই তার অন্তবের রাজকন্যা, তার স্বপ্নসঙ্গিনী, পূর্বজন্মের প্রথমা প্রিয়াকে বন্দনা করেছিল । অনুরূপভাবে, বেদের মধ্যেও নায়কের অন্তরবাসিনী প্রেয়সীর সন্ধানের ইতিহাস আছে — আহ্লাদী থেকে মৈত্রেয়ী পর্যন্ত । কাঞ্চন সবার মধ্যেই তার আইডিয়ালের বিকাশ দেখেছিল—তাই সবাইকে ভালবেসেছিল ।[২৭]

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই জীবতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের নতুন নতুন দ্বারোদ্‌ঘাটনের ফলে প্রেমের একনিষ্ঠতা সতীত্ববোধ ইত্যাদি বিষয়ে নব নব জিজ্ঞাসা দেখা দিতে লাগল তারই শিল্পরূপ দেশবিদেশের বিভিন্ন সাহিত্যে লক্ষ করা যায় । 'কল্লোল'-এর লেখকরাও তাই প্রেম, বিবাহ, সতীত্ব ও নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে নতুন নতুন যে প্রশ্ন উথাপন করলেন তার পটভূমিকায় ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রভাব ফরাসী, নরওয়ে বা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান সাহিত্যে নর-নারীর মুক্ত জীবনের বৈচিত্র্য, রুশ সাহিত্যের সমাজনিষ্ঠ বাস্তবতা ও মানবতাবোধ অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হয় । সর্বোপরি পাশ্চাত্য প্রভাবকে সাঙ্গীকরণ করে কল্লোল-গোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যে যে নতুন মৌলিক পথের

হদিশ দিয়েছিল তা 'কল্লোল' পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছে ।

'কল্লোল'-এর গল্পের রূপকর্মেও নতুনত্ব সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় । রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোটগল্পের যে সমৃদ্ধি ঘটেছিল 'কল্লোল'-এর কালে তার প্রসার ও বৈচিত্র্য, ভাব ও রূপ উভয় দিক থেকেই আরও ঐশ্বর্যময় হয়ে ওঠে । তরুণ লেখকদের পূর্বতন রীতিকে অতিক্রম করে নতুন সৃষ্টির যে প্রবণতা, আদিমতম বৃত্তির পোষকতা ও নির্মম বাস্তবকে কাহিনীর মধ্যে উদ্ধৃত করে গড়ে তোলার যে প্রয়াস তার সঙ্গে বাংলা ছোটগল্পকে স্থান বিশেষে একটা অনিয়মিত কাঠামো এনে দিয়েছে । জীবনের রহস্যময়তাকে সাংকেতিকতার শৈল্পিক প্রকাশের আয়োজন 'কল্লোল'-এর ছোটগল্পে লক্ষণীয় । বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা'-এ আলো অন্ধকারের প্রসঙ্গে এই সাংকেতিকতার নিদর্শন আছে ।

দ্বিতীয়ত, কল্লোলীয়রা জীবন ও আত্মার সেই মূলগত রহস্যকে ধরতে গিয়ে ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন । মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণের অন্তরালে যে গভীর নিঃসঙ্গ অতলান্ত মনোজগৎ আছে তা এঁরা কখনো কখনো তীক্ষ্ণ ভাষা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেব সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন । এই মনোসমীক্ষণের প্রয়াস কতকটা অনিবার্যভাবে বুদ্ধদেব বসুর 'অভিনয় ও অভিনয় নয়' গল্পে একটা আলোচনামূলক ও প্রবন্ধাত্মক রীতি এনে ফেলেছে ।

তৃতীয়ত, কোনো কোনো লেখকের গল্পে জীবন দর্শন কাব্যানুপ্রেরিত হয়ে উঠেছে । চরিত্র পরিকল্পনায়, ঘটনা-বিন্যাসে, জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত বর্ণনায় এবং প্রকৃতির পরিবেশ রচনায় তাঁরা খুঁজেছেন কবিত্বের অবকাশ । বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা' এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'সন্ধ্যারাগ' গল্পে মনস্তত্ত্বের অন্তরালেও কবিজনোচিত ভাবোচ্ছ্বাসকে ধরে রাখবার প্রয়াস লক্ষণীয় ।

এইভাবে 'কল্লোল' বিষয় ও আঙ্গিক উভয় দিক থেকেই বাংলা সাহিত্যে যে অভিনবত্বের আয়োজন করেছিল তা অবশ্যই এক বিরাট আন্দোলন হিসেবে স্বীকৃত। বিখ্যাত কল্লোলীয় লেখক বুদ্ধদেব বসুর কথায় —

> 'কল্লোল' বেছে বেছে ফুলের তোড়া বাঁধেনি বলে তাকে দোষ দিই না, সে যে আস্ত একটা গাছের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিল, সেটাই তার প্রাণশক্তির প্রমাণ । তার পরিবেশের মধ্যে বুদ্ধিব চর্চা বেশি ছিল না, কিন্তু প্রাণ ছিল, আবেগ ছিল, তার টানে কিছু আবর্জনা তো ভেসে আসবেই । সেটা কিছু না—স্রোতটাই আসল কথা । স্রোত ছিল 'কল্লোলে' জোয়ার এসেছিল, রবীন্দ্রনাথের কুসুমশয়নে দীর্ঘ সুখতন্দ্রার পর আমরা হঠাৎ নিজের মধ্যে জেগে উঠেছিলাম।[১৮]

এই জেগে ওঠাটাই 'কল্লোল'-এর বিদ্রোহ । 'কল্লোল'-এর বিদ্রোহ মূলত ছিল পূর্বতন আদর্শবাদের বিরুদ্ধে কঠিন বাস্তবতার আনয়নে, সাহিত্যে সমাজের নগণ্য মানুষের সরব স্বীকৃতিতে, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের আলোকে ব্যক্তিচৈতন্যের স্বাধিকারের প্রতিষ্ঠায়;বলা যেতে পারে সমস্ত দিক থেকেই একটা নাড়া দেওয়ার উদ্যোগ 'কল্লোল' গ্রহণ করেছিল । এই উদ্যোগই বুদ্ধদেবের ভাষায় 'স্রোত' বা 'জোয়ার' যা গতানুগতিকতা বা পূর্বানুবৃত্তিকে অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্যে এক পালাবদল ঘটিয়ে দিয়েছিল এবং এই পালাবদলেই 'কল্লোল'-এর আন্দোলন স্বীকৃত ।

মননের পরিচয় (১৯৩১)

আধুনিক বাংলা সাহিত্য তথা বাঙালি ভাবুকতার ইতিহাসে কয়েকটি পত্রিকার বিশিষ্ট ভূমিকা অবিসংবাদিত। 'তত্ত্বোধিনী', 'বঙ্গদর্শন', 'সবুজপত্র'— সমকালীন খ্যাতিমান এবং পাঠকপ্রিয় অন্যান্য পত্র-পত্রিকার মধ্যে এরা যেন এক-একটি পর্বতশীর্ষ। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে বঙ্গীয় মননশীলতার সব চাইতে স্মরণীয় প্রকাশ ঘটেছিল 'পরিচয়' পত্রিকায়। সমসাময়িক সময়ে বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট পত্রিকার অভাব ছিল না। 'চতুরঙ্গ', 'মাসিক মোহম্মদী', 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা', 'পূর্বাশা' এবং ছোট-বড় আরোও বেশ কয়েকটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যপত্র যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ত্রিশের দশকে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধির প্রায় পরকাষ্ঠা অর্জন করেছিল। অস্তগামী রবীন্দ্রনাথ তখনও বাঙালির চিত্তাকাশ উদ্ভাসিত করে চলেছেন তাঁর দ্যুতিময় বর্ণবৈভবে। কবিতার জগতে নবনবোন্মেষশালী প্রতিভা নিয়ে দেখা দিয়েছেন জীবনানন্দ, জসীমুদ্দিন, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে; কথা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ, অন্নদাশঙ্কর, তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ধূর্জটিপ্রসাদ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সাহিত্যে প্রাচুর্যের মধ্যেও 'পরিচয়ে'র স্থান ছিল খুবই বিশিষ্ট।

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল মাসিক 'কল্লোল' পত্রিকা। কালক্রমে এই উচ্ছ্বাসও স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। 'কল্লোল' পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগের উন্মেষ ঘটিয়েছিল ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকা 'কল্লোল' পরবর্তী 'পরিচয়' প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন —

> 'পরিচয়'-এর কথা ভাবলে আজ আমার মনে হয় যে 'কল্লোল'-এর তোলপাড়ের পর ঘর গোছাবার কাজ নিয়ে সে এসেছিল। 'কল্লোল' যা ছিল না সেখানেই তার সম্পদ ছিল বিদ্রোহের উন্মাদনা যখন থিতিয়ে আসছে ঠিক সেই রকম সময়ে 'পরিচয়' নিয়ে এলো রুচি, বিচার, বুদ্ধি, চিন্তার শৃঙ্খলা।[১]

স্বাস্থ্য সংস্কারের জন্য সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৩৩৫ সনে (ইং ১৯২৯) রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন। পরিচয়-গোষ্ঠীর এক বিশিষ্ট লেখকের কথায়—

> সুস্থ দেহে তিনি দেশে ফিরলেন বিদেশী ছাঁচে ঢালা মনের ওপর বিদেশী সমাজ ও সংস্কৃতির পালিশ লাগিয়ে ও মাতৃভাষাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাহিত্য সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে।[২]

ইউরোপ থেকে ফেরার কিছুদিন পরে সুধীন্দ্রনাথের বাসনা হল ইংরেজী বা ফরাসী 'রিভিউ'-এর আদলে একটি উচ্চাদর্শের সাময়িকপত্র প্রকাশের। উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের মনন-সম্পদের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন। সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুরা, তাঁর এই সংকল্পের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ও পত্রিকা-প্রকাশের উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন—

> পরিচয় প্রকাশের উদ্যোক্তারা যখন আমাকে চিঠি লেখেন আমি সুধীন্দ্রনাথকে লিখি যে ওটি

হবে ফরাসীদের একখানি প্রসিদ্ধ রিভিউয়ের অনুরূপ ।[৩]

বিচক্ষণ সুধীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে একক প্রচেষ্টায় নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব নয় । তাই পিতা হীরেন্দ্রনাথ, অনুজ হরীন্দ্রনাথ, সমবয়সী নিকটাত্মীয় ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ও মেসোমশায় চারুচন্দ্র দত্তের কাছ থেকে আত্মিক ও আর্থিক সমর্থনের নিশ্চিত আশ্বাস পেয়েই পত্রিকা প্রকাশে অগ্রসর হয়েছিলেন । বন্ধুবর গিরিজাপতি ভট্টাচার্য নিয়ে এলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়কে, যুক্ত করলেন তাঁর বাল্যবন্ধু ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে । নীরেন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় পরিচয়ের প্রথম সংখ্যা থেকেই যুক্ত হলেন সুশোভন সরকার ও বিষ্ণু দে এবং দ্বিতীয় সংখ্যার প্রস্তুতি পর্ব থেকে যোগ দিলেন শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ও হিরণকুমার সান্যাল ।

সুশোভন সরকার লিখেছেন—

> আমি তখন ঢাকায় কাজ করি, ছুটি কাটাই কলকাতাতে ।...শুনলাম ‘পরিচয়’ নামে এক ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করা হচ্ছে । নীরেন্দ্রনাথ রায় আমাকে ধরলেন একটা প্রবন্ধের জন্য, প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হবে । আড়ষ্ট শুদ্ধ বাংলায় লিখলাম ‘রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা’। চিঠি ছাড়া আগে তখনও বাংলাতে কিছু লিখিনি । আমার খুবই সংকোচ হয়েছিল, অবাক হলাম যখন শুনতে পেলাম লেখাটি মনোনীত হয়েছে ।...এরপর যখনই ছুটিতে কলকাতায় আসতাম, তখনই পরিচয়ের শুক্রবাসরীয় বৈঠক হাজির হতাম ।[৪]

দেশের সমস্ত কূপমন্ডুকতা ও যাবতীয় হুজুগকে অতিক্রম করে পরিচয় প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের (১৯৩১) শ্রাবণ মাসে । প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা ছিল ১৬৮, তার মধ্যে ১৩ পৃষ্ঠা ছিল বিজ্ঞাপন । পত্রিকার ‘পরিচয়’ নামকরণটি নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রদত্ত ছিল । সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত । পরিচয় পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক সাহিত্যিক অমিতাভ দাশগুপ্তের মতে —

> সুধীন্দ্রনাথের বাসনা ছিল কাগজটিকে বিলিতি ক্রাইটেরিয়ন পত্রিকার আদলে গড়ে তোলবার। সম্ভ্রান্ত, মননশীল, বিজ্ঞান-সচেতন, বুদ্ধিদীপ্ত একটি পত্রিকা ।[৫]

‘পরিচয়’-এর প্রথম সম্পাদকীয় যেটি কোন নাম না দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, তা ছিল নীরেন্দ্রনাথের রচনা । এই রচনার মধ্যে পরিচয়ের আদর্শ ও উদ্দেশ্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছিল। প্রথম আবির্ভাবেই পরিচয় ঘোষণা করেছিল —

“...শুভদিনের আবির্ভাবকে ত্বরিত করিতে হইলে আজ মানুষের প্রধান কাজ ভাষা-সংকটের দুর্লঙঘ্য বাধা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির যুগ যুগ সঞ্চিত পরিশীলন-সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া । এই পরিশীলন পরিচয়ই জাতিগত দ্বেষ, হিংসা ও অবজ্ঞাকে সংকীর্ণ চিত্ততার-রন্ধ্রগত শনিকে বিতাড়িত করিতে সমর্থক ।

বাংলাদেশে ‘পরিচয়’ আজ এই ভারই লইতে চায় । তাহার প্রধান উদ্দেশ্য প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাবগঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহইয়া দেওয়া । প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে ‘পরিচয়’ বাঙালি পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী। কখনো মূল ভাষার অনুসরণে আলোচনা করিয়া, কখনো বা ভাষান্তরের সাহায্য লইয়া, কখনো

পরিচয়

প্রতি সংখ্যা

বার্ষিক

ত্রৈমাসিক

পত্রিকা

প্রথম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৩৮

বিষয় সূচী

পুস্তক পরিচয়

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য, শ্রীঅশোকনাথ বেদান্ততীর্থ, শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী, শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য, শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু - ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সম্পাদক- শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পরিচয় পত্রিকাব একটি সংখ্যার একটি পৃষ্ঠার নিদর্শন

সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া, কখনো বা মূলানুগ অনুবাদ করিয়া । এই সঙ্গে মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকেও পরিচয় তাহার দৃষ্টি সদাজাগ্রত কবিয়া রাখিবে । কবিতা, কথাশিল্প, নাটক, কথানুশীলন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব-পরিশীলনেব সকল বিভাগগুলিই যাহাতে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে; এবিষয়ে পরিচয় সাধ্যমত চেষ্টা করিবে । .. এখন ইহাকে লালনের ভার পড়িল তাহাদের উপর—বাংলা ভাষার অতীতকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন, বর্তমানকে দরদ দিয়া দেখেন ও ভবিষ্যতের আলোকিত প্রসার সম্বন্ধে যাহাদের বিশ্বাস অকুণ্ঠ ।"

উক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'পরিচয়' নামকবণের কারণটিও সুব্যক্ত । 'পরিচয়'-এর আদর্শ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'পরিচয়'-এর প্রাক্তন সম্পাদক গিরিজাপতি ভট্টাচার্য 'পরিচয়'-এর ৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে লিখেছিলেন —

> আমি মনে করি পরিচয়ের শৈশবাবস্থা থেকে তার বর্তমান পর্যায়ে অনেক মৌলিক পরিবর্তন এলেও তার অন্তরে এখনও সেই সুর বর্তমান ।[৬]

পত্রিকা হিসেবে 'পরিচয়'-এর চিরকালীনত্বের এখানেই স্বীকৃতি ।

'পরিচয়'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার বিষয়সূচীর দিকে একমাত্র দৃষ্টিপাত কবা যাক —

যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ	:	শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
বৌদ্ধধর্মের দান	:	শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাগচী
কাব্যের মুক্তি	:	শ্রী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
রুশ বিপ্লবের পটভূমিকা	:	শ্রী সুশোভন সরকার
বিজ্ঞানের সংকট	:	শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু
শিল্পীর ব্যথা	:	শ্রী সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রেমপত্র	:	শ্রী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
হিন্দুস্থানী ও বাংলা গান	:	শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়
কবিতাগুচ্ছ	:	শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী, শ্রী বিষ্ণু দে, শ্রী বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ ।

'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে শ্রী নীরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রী গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, শ্রী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রী সুধীরকুমার চৌধুরী, শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু ইত্যাদি সমালোচক নানা বিশিষ্ট গ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন ।

প্রথম সংখ্যার রচনাসূচী থেকে স্পষ্ট এই পত্রিকায় প্রাচীন ভারত এবং আধুনিক বিশ্ব, নব্যবিজ্ঞান, শিল্পতত্ত্ব এবং সঙ্গীতশাস্ত্র সবই আলোচনার বিষয় হবে । বিষয়-বৈচিত্র্যের পাশাপাশি সেই সময়ের বাঙালি মনীষার সেরা সমাবেশ ঘটিয়ে সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের সার্বিক চৈতন্যেরই মুক্তি ঘটানর অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন । এখানেই 'পরিচয়'-এর আন্দোলনের শিকড় প্রোথিত । সকল গোষ্ঠীবদ্ধতা, গ্রাম্যতা, অল্প জ্ঞানের আত্মতুষ্টি থেকে শিক্ষিত বাঙালিকে মুক্ত করাই ছিল 'পরিচয়'-এর আন্দোলনের ঘোষিত অভীষ্ট । জন্মলগ্নে 'পরিচয়' রাজনৈতিক প্রভাব থেকে পুরোপুরিভাবে মুক্ত হতে পারেনি । এ প্রসঙ্গে হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন—

...পরিচয় আত্মপ্রকাশ করেছিল উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তের মুখ তাকিয়ে ও এই মধ্যবিত্ত তাঁদেরই সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী যাঁরা একদিন রাজনৈতিক চৈতন্যে দীক্ষা পেয়েছিলেন গোলদিঘিতে সুরেন বাঁড়ুয্যের ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনে ।[৭]

পূর্বসূরী হলেও 'ভারতী', 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা', এমনকি 'কল্লোল', 'কালিকলম'-এর ধারা অব্যাহত রাখার কথা সচেতনভাবে ভাবেননি 'পরিচয়'-এর উদ্যোক্তারা। এমনকি রবীন্দ্রনাথ থেকেও তাঁরা যেন দূরে থাকতে চেয়েছিলেন । এ প্রসঙ্গে গিরিজাপতি ভট্টাচার্য লিখেছেন—

নীরেন পরিকল্পনা করেছিলেন যে প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কোন লেখা থাকবে না । প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর সুধীন্দ্র কবির কাছে এককপি নিয়ে যাবেন । পরিকল্পনাটি খুব সফল হয়েছিল ।[৮]

পাঠককে সমৃদ্ধ করার এই সুচিন্তিত আয়োজন দেখে উত্তেজিত সত্তরোর্ধ রবীন্দ্রনাথকে দ্বিতীয় সংখ্যাতেই লিখতে হয় পত্রাকার প্রবন্ধ —

আদর্শরক্ষা করতে গেলে প্রয়াসের দরকার, সাধনা না থাকলে চলে না । বারোয়ারির আসরে দাঁড়িয়ে সাধনা অসম্ভব । সেই সাধনাপেক্ষী সাহিত্যের জন্য সময়ও চাই বড়ো, ক্ষেত্রও চাই উদার । এ জায়গায় ভিড় জমাবার আশা নেই, কাজেই গুণজ্ঞের পরিতোষ ছাড়া অন্য পারিতোষিকের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিতেই হবে ।[৯]

তাই প্রথম সংখ্যাটি রবীন্দ্রবর্জিত হলেও 'পরিচয়'-এ রবীন্দ্রনাথের গমনাগমনকে রোধ করা সম্ভব হল না । 'পরিচয়'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন —

কিন্তু তবু ইতিহাসের পরিহাসে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ অনিবার্য হয়ে পড়ল পরিচয়-এর জন্মবৃত্তান্তের একেবারে সূচনাতে ।[১০]

রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের যে রীতি সমসাময়িক সময়ে প্রচলিত ছিল সেই রীতি ভেঙে দিয়ে 'পরিচয়' প্রকারান্তরে রবীন্দ্রনাথেরই শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিল । কবি 'পরিচয়'-এর শুক্রবারের আসরের কথা জানতেন এবং তাঁর কিছু পড়ে শোনাবার থাকলে মাঝে মাঝেই পরিচয়-গোষ্ঠীর ডাক পড়ত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে । 'পরিচয়'-এর মতামতকে রবীন্দ্রনাথ গুরুত্ব দিতেন এটা বোধহয় তারই প্রমাণ । সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'পরিচয়'-এর প্রথম দশ বছরে (কার্তিক, ১৩৩৮-শ্রাবণ, ১৩৪৮) রবীন্দ্রনাথের চিঠি, কবিতা, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ-সমালোচনা নিয়ে মোট ৩৬টি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল । সুধীন্দ্রনাথ ও তাঁর সতীর্থরা দুঃসাহসে ভর করেই এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন । তাঁদের এই দুঃসাহসের ব্রতেই রবীন্দ্রনাথ যে রীতিমতো উৎসাহ জুগিয়েছিলেন, সে কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন —

পরিচয়-এর প্রথম দশ বছর মিলে যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশকের সঙ্গে । কিন্তু এই দশ বছর শুধু পরিচয়-এর পাতাতেই তাঁর যে কটি লেখা বেরিয়েছিল তাতে প্রমাণ হয় যে আয়ুর সীমান্তে পৌঁছেও তাঁর মন ছিল যেমন সতেজ, তেমনি সমর্থ ছিল তার কলম । এই কলমের জোরে পরিচয়-এর স্বকীয়তাতে আরো বৈশিষ্ট্য দেবার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।[১১]

বস্তুতপক্ষে 'পরিচয়' কোন প্রাতিষ্ঠানিকতার কাছে মাথা নত করেনি । 'শনিবারের চিঠি', 'প্রবাসী' বা 'ভারতবর্ষ'-এর মতো কোনো বাণিজ্যিক ঝোঁক 'পরিচয়'-এর ছিল না । শেষ পর্যন্ত

শুধু রবীন্দ্রনাথ নয় তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু লেখকের রচনা নিয়েই 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ হত। পত্রিকার প্রথম কয়েক বছরের সূচী লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতিধারার এক উন্নত ছবিই যেন স্পষ্ট হয়ে ক্রমশ ফুটে উঠেছে । হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, অন্নদাশঙ্কর রায়, চারুচন্দ্র দত্ত, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছাড়াও বহু খ্যাতনামা পন্ডিত রসজ্ঞ ব্যক্তির লেখা প্রবন্ধ প্রকাশিত হত 'পরিচয়'-এর প্রথম যুগের পৃষ্ঠায় । বহু জটিল, পান্ডিত্যপূর্ণ, দার্শনিক, সাহিত্যিক প্রবন্ধের সঙ্গে পাঠকের যোগাযোগ ঘটত মূলত এইসব রচনার মধ্য দিয়ে । সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিজেও লিখেছেন বেশ কিছু প্রবন্ধ, যার মধ্যে 'ঐতিহ্য ও এলিয়ট' কিংবা 'কাব্যের মুক্তি' তো আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল । আবু সয়ীদ আইয়ুবের লেখাগুলির মধ্যেও নতুন সাহিত্যবীক্ষা, নতুন রূপে দেখতে পাওয়া যায় । তাছাড়া গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল কিংবা অপেক্ষাকৃত তরুণ বিষ্ণু দে তো ছিলেনই, আর যে সমালোচকের প্রখর ব্যক্তিত্বের ছাপ সে যুগের 'পরিচয়' বহন করেছে, তিনি হলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ।

প্রথমাবস্থায় 'পরিচয়'-এর সম্পাদক-মন্ডলীতে ছিলেন আট জন । এ প্রসঙ্গে গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণা—

> সম্পাদক-মন্ডলীতে ছিলেন চারু দত্ত, সত্যেন বোস, সুবোধ মুখুজ্যে, প্রবোধ বাগচী, ধূর্জটি মুখুজ্যে, নীরেন রায়, সুধীন দত্ত ও আমি—যতদূর মনে পড়ে এই আট জন । বলতে পারো অষ্টদিক্‌পাল বা অষ্টদিগ্‌গজ ।[১২]

এই পরিচালকমন্ডলীর কাজ ছিল কাগজটির আকৃতি-প্রকৃতি নির্ধারণ ও বিশেষভাবে ছাপার জন্য লেখা নির্বাচন । সম্পাদকমন্ডলীর নিয়মিত অধিবেশন বসত প্রতি শুক্রবার । এই আড্ডায় শুধু বাংলার নয়, ভারতের এমনকি কোনও কাজে কলকাতায় এসে পড়া বিদেশীদেরও বিতর্কমুখর সমাগম হত । প্রায়ই এখানে আসতেন অক্সফোর্ডের ডিন বসন্ত মল্লিক, তুলসী গোঁসাই, অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবীর, অপূর্ব চন্দ্র, সুশোভন সরকার, সাহেদ সুরাওয়াদি, সুরেন গোস্বামী, হামফ্রে হাউস প্রমুখরা । অর্থাৎ 'পরিচয়'-কে কেন্দ্র করে তৎকালীন বিদগ্ধজনের এক আশ্চর্য সমাবেশ ঘটেছিল সুধীন্দ্রনাথের হাতিবাগানের বাড়িতে । ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকার ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য ষষ্ঠ বর্ষ থেকে পত্রিকাটি মাসিক রূপে আত্মপ্রকাশ করল । আকৃতি এতে কিছু লঘু হল বটে কিন্তু পত্রিকার চরিত্র ও মাহাত্ম্য অবিকৃত রইল । পরবর্তী সময়ে 'পরিচয়'-এর কার্যালয় কলেজ স্কোয়ারে স্থানান্তরিত হলে এখানেও একটা আড্ডা গড়ে উঠেছিল । এই আড্ডায় প্রায় নিয়মিত হাজির হতেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, আশানন্দ নাগ, হরপ্রসাদ মিত্র, মনীন্দ্র রায় এবং আরো অনেক প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক ।

পরিচয়-গোষ্ঠীর মধ্যে সবুজপত্র, কল্লোল প্রভৃতি সাহিত্যিকগোষ্ঠীর লেখকরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধিজীবিরা, আর এর মধ্যমণিরূপে ছিলেন সুধীন্দ্রনাথের মতো উদারনৈতিক ব্যক্তিত্ব । ভাবতে আশ্চর্য লাগে মজিদ রহিম (আই. সি. এস)-এর মতো নাৎসিবাদের সমর্থকও পরিচয়-এর আড্ডায় আসতেন। এই আড্ডায় বিভিন্ন চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিত্বের ব্যাপক সমাবেশ ঘটতে থাকে ১৯৩৬ সাল থেকে 'পরিচয়' মাসিকরূপে আবির্ভূত হলে । ইতিপূর্বে 'পরিচয়'-এর আড্ডায় বা পত্রিকায় জাতীয়

ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে কিংবা পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান বা মার্কসবাদ সম্পর্কে আলোচনা হত, কিন্তু বামপন্থী প্রগতিশীলতা বলতে যা বোঝায় তার সূচনা 'পরিচয়'-এ ঘটেছিল তিরিশের দশকের ঠিক মধ্যপর্ব থেকে। বেপরোয়া উদ্দামতা ও হঠাৎ হুজুগে মেতে ওঠা ছিল পরিচয়-গোষ্ঠীর স্বভাববিরুদ্ধ। আলাপ-আলোচনার মান ছিল যথেষ্ট উন্নত ও রুচিকর। বঙ্গসাহিত্যে 'পরিচয়'-এর ভূমিকা সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের মন্তব্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য —

> রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সেই সময় যে ভূমিকায় ছিল, বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিচয়-এর ভূমিকা ছিল তদনুরূপ।[১৩]

পরিচয়-গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও একটা জায়গায় এদের ব্যাপক ঐক্য ছিল। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন সামন্ততন্ত্রবিরোধী এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানবমহিমাদীপ্ত সৃজনশীল সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাভাবাপন্ন। 'পরিচয়'-এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রাচ্যের মানবিক দর্শন ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের মিশ্রিত ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। পরিচয়-গোষ্ঠীর লেখকদের প্রগতির দর্শন ও ঐক্যের ভিত্তি ছিল এটাই। প্রকৃত অর্থে 'পরিচয়' ছিল সকল রকম মানবতা-বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে একটি 'যুক্তফ্রন্ট'।

'পরিচয়' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আর একধারা যা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ও সমাজ ভাবনায় নতুন এক দিগন্ত তৈরি করেছে পরবর্তীকালে, তা হল মার্কসবাদী চিন্তাধারা, পরিচয়-গোষ্ঠীর প্রথম যুগের লেখক, যাঁরা পরবর্তীকালে প্রগতি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির সহযাত্রীরূপে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁরাও ছিলেন নানা মানসিকতা ও ভাবধারায় দোদুল্যমান। তবু এঁদের অনেকেরই মুক্তিবুদ্ধি চেতনার ফলে 'পরিচয়'-এ অধ্যাপক সুশোভন সরকার রচিত 'রুশ বিপ্লবের পটভূমি', 'রুশ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পেরেছিল। তিরিশের দশকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণে পরিচয়-গোষ্ঠী যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিল। 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন', 'সবুজপত্র', 'কল্লোল' প্রভৃতির কাল ছাড়িয়ে 'পরিচয়' বাংলা সাহিত্যে প্রগতির সংজ্ঞা ও সীমানা বহুদূর বিস্তৃত করতে পেরেছিল।

এরপর ক্রমশই পরিচয়-এর পৃষ্ঠায় মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটতে থাকে একটু একটু করে। এর প্রথম মুখবন্ধ হিসেবে ধরা যায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ে 'অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা' (বৈশাখ, ১৩৪১) প্রবন্ধটি। হিরণকুমার সান্যাল 'পরিচয়'-এ মার্কসবাদী চেতনার প্রথম স্ফুরণ সম্পর্কে স্পষ্ট করে লিখেছেন—

> মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলির ব্যাখ্যায় এই প্রবন্ধটি ('অথ কাব্য-জিজ্ঞাসা') ঠাসা। তখনকার দিনে এ-সব কথা নতুন ছিল। ভাবগঙ্গার ঘোলাটে জলে ফুটলো লালের আভা।
> এই সময়ে একটির পর একটি প্রবন্ধে সুশোভন সরকার বর্ণনা করেছিলেন তখনকার ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা। অত্যন্ত সরল ভাষায় সমসাময়িক ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য এগুলি উল্লেখযোগ্য। অনেকেরই তখন চোখ ফুটেছিল ঐ লেখাগুলি পড়ে। ...এর কিছুকাল পরে সদ্য বিলেত-ফেরত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এসে যোগ দিলেন পরিচয়-

এর আড্ডায় ও লেখক-গোষ্ঠীতে । 'পরিচয়'-এর পাতায় লালের আভা আব একটু গাঢ় হল । কিন্তু এই রঙ প্রথম ফুটিয়েছিলেন ধূর্জটিবাবু তা ভুললে অন্যায় হবে ।[১৪]

সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'পরিচয়'-এর পট-পরিবর্তনে ধূর্জটিপ্রসাদের ভূমিকা অবশ্য স্মরণীয়। 'পরিচয়' আরো প্রগতিভিমুখী হল বটে, কিন্তু একথাও সত্য যে,

> এঁরা মার্কসবাদী চিন্তা চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ নিশ্চয়, কিন্তু এঁদের সাহিত্যভাবনায় ছিল মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের অস্পষ্ট চেতনা; সমাজতাত্ত্বিক (Sociological) দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁরা কিছুটা আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন মাত্র । তাতে মার্কস্‌বাদের 'লাল রঙ' তেমন পরিস্ফুট নয়, 'আভা'-র আভাসেই তা নিঃশেষিত ।[১৫]

সমালোচকের এই মন্তব্য সত্ত্বেও সে-সময় ব্রিটিশের জেলখানায় বসে যে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীরা 'কমিউনিজম'-এ দীক্ষা লাভ করেছিলেন, তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতেন 'পরিচয়' পাঠের জন্য । এর মূল্যও আজ অনুধাবন করা উচিত ।

'পরিচয়' পত্রিকাটি শুধুমাত্র সাহিত্যিকদের নয়, বৈজ্ঞানিক, সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, শিল্প-বিশারদ প্রভৃতিরও মিলনের স্থান ছিল । সুধীন্দ্রনাথ এই পত্রিকায় বড় পৃথিবীর আলো সঞ্চার করার জন্য যথেষ্ট মেধা ও শ্রম ব্যয় করেছিলেন । 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার দানগুলির সঙ্গে' বাঙালি পাঠকের পরিচয় সাধন এবং 'কূপমন্ডুকতা ও গ্রাম্যতামুক্ত' মননশীলতার চর্চাই 'পরিচয়'-এর প্রথম দশ বছরের সংখ্যাগুলিকে সমসাময়িক অন্য সব পত্রিকা থেকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল । 'পরিচয়'-এর বিশিষ্টতার কথা বলতে গিয়ে হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন —

> পরিচয় প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে গৌরব অর্জন করেছিল তা অক্ষুণ্ণ ছিল যতদিন এই পত্রিকা ছিল ত্রৈমাসিক ।[১৬]

প্রথম পাঁচ বছরের (শ্রাবণ, ১৩৩৮-আষাঢ়, ১৩৪৩) ত্রৈমাসিক 'পরিচয়'-এর ২০টি সংখ্যার বিষয়সূচী লক্ষ্য করলেই একথার সত্যতা বোঝা যাবে । প্রথম ২০টি সংখ্যায় আলোচিত হয়েছিল ৪০১টি গ্রন্থ; এর মধ্যে ১৪৩টি বাংলা গ্রন্থ এবং ২৫৮টি বিদেশী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ । ১১১টি ছিল উচ্চমানের প্রবন্ধ । অধ্যাপক সুশোভন সরকার অবশ্য 'পরিচয়'-এ গৌরব কালের সীমা প্রসারিত করে বলেছেন—

> বাংলা পত্রিকার জগতে পরিচয় দুর্লভ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পেরেছিল প্রথম দশ বছর।[১৭]

মাসিক 'পরিচয়'-এ প্রথম পাঁচ বছরের (শ্রাবণ, ১৩৪৩-আষাঢ়, ১৩৪৮) ৬০টি সংখ্যার বিষয়সূচীও এই অভিমত সমর্থন করে । এই পর্বে আলোচিত বাংলা গ্রন্থ ৪৯৬টি এবং ২৪৭টি বিদেশী ভাষায় রচিত গ্রন্থ । আর মননশীল প্রবন্ধের সংখ্যা ২২৪টি । তাছাড়া ত্রৈমাসিক ও মাসিক পর্বের লেখকগোষ্ঠী অপরিবর্তিত থাকায় প্রথম পাঁচ বছরে ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' যে গৌরব অর্জন করেছিল, পরবর্তী পাঁচ বছরে মাসিক 'পরিচয়'ও তা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিল । অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় 'পরিচয়'-এ বিশিষ্টতা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> সূচনা থেকেই পরিচয়-এর প্রধান ঝোঁক ছিল বাঙালী পাঠকেব চেতনায় তার সর্বমানবীয় এবং সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ উত্তরলব্ধিকে প্রবাহিত করাব দিকে । গোষ্ঠীবদ্ধতা, গ্রাম্যতা, অল্প

জ্ঞানের আত্মতুষ্টি, আপন সমাজ সংস্কৃতির সঙ্কীর্ণ গন্ডীব ভিতরে আবদ্ধ থাকা—এই প্রতিন্যাস থেকে শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাকে মুক্ত কবা ছিল পরিচয়-এর ঘোষিত অভীষ্ট। এ কাজে প্রধান সহায় মননের চর্চা—পরিচয় পত্রিকায় তাই প্রাধান্য পেয়েছিল প্রবন্ধ এবং পুস্তব পরিচয়। ...প্রবন্ধে এবং বিশেষ করে গ্রন্থ সমালোচনায় পরিচয়, ত্রিশের দশকের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হয়ে উঠেছিল।[১৮]

অধ্যাপক রায়ের এই মতামতের প্রমাণ পাওয়া যায় 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত অজস্র বিষয়ের প্রবন্ধের প্রাচুর্যের দিকে তাকালে। যার মধ্যে সর্বাধিক প্রকাশিত হয়েছিল দার্শনিক প্রবন্ধ এবং এক্ষেত্রেও সুধীন্দ্র-পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। হীরেন্দ্রনাথের লেখা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য দার্শনিক প্রবন্ধ গুলির মধ্যে কয়েকটি হল—'যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ' (শ্রাবণ, ১৩৩৮/ধারাবাহিক প্রবন্ধ), 'যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ' (কার্তিক, ১৩৩৮), 'যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদ' (মাঘ, ১৩৩৮), 'মোক্ষ ও নির্বাণ' (কার্তিক, ১৩৩৯), 'নিসর্গের অনুবর্তন' (শ্রাবণ, ১৩৪০), 'বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা' (মাঘ, ১৩৪০; বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক, মাঘ ১৩৪১), 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' (আষাঢ়-চৈত্র, ১৩৪৫), 'বঙ্কিম ও গীতার ধর্ম' (বৈশাখ, ১৩৪৬), 'উপনিষদে জীবতত্ত্ব' (কার্তিক, ১৩৪৬), 'পিতৃযান ও দেবযান' (মাঘ, ১৩৪৬), 'অমৃতত্ত্ব-সিদ্ধির উপায়' (শ্রাবণ, ৪৭), 'বিদেহ-কৈবল্য' (ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৪৭), 'সু-যোগ ও কু-যোগ' (বৈশাখ, আষাঢ়, ১৩৪৮) ইত্যাদি। এছাড়া অন্যান্যদের দার্শনিক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরিশচন্দ্র সিংহের 'বিদেশে অর্থনীতি ও সাংখ্যশাস্ত্রের গবেষণা পদ্ধতি' (শ্রাবণ, ১৩৪১); আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাভূমি ও দর্শন' (শ্রাবণ, ১৩৪২); বটকৃষ্ণ ঘোষের 'মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি' (কার্তিক, ১৩৪৩) 'হিন্দু ও বৌদ্ধ' (বৈশাখ, ১৩৪৪); 'শব্দব্রহ্মবাদ' (চৈত্র, ১৩৪৫); 'ন্যায়মতে আত্মবাদ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬); ক্ষিতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'মানুষের মন, মগজ ও আত্মা' (কার্তিক, ১৩৪৫) পুলকেশ দে সরকারের 'ভারতীয় মূর্তবাদ' (ফাল্গুন, ১৩৪৬); সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বৌদ্ধ শূন্যবাদ' (বৈশাখ, ১৩৪৯) ইত্যাদি।

দার্শনিক প্রবন্ধ সমূহের পরে সাহিত্য-তত্ত্ব বিষয়ক বেশ কিছু স্মরণীয় প্রবন্ধ 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'কাব্যের মুক্তি' (শ্রাবণ, ১৩৩৮); অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'রীতি-বিচার' (কার্তিক, ১৩৩৮), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আধুনিক কাব্য' (বৈশাখ, ১৩৩৯) 'সাহিত্যের মাত্রা' (শ্রাবণ, ১৩৪০); ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অথ-কাব্য-জিজ্ঞাসা' (বৈশাখ, ১৩৪১); বটকৃষ্ণ ঘোষের 'ভাব ও ভাষা' (শ্রাবণ, ১৩৪২); রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সাহিত্যের স্বরূপ' (কার্তিক, ১৩৪৩); নলিনীকান্ত গুপ্তের 'কাব্যের মহত্ত্ব' (আষাঢ়, ১৩৪৫); নবেন্দু বসুর 'কবিতার প্রকার' (ভাদ্র, ১৩৪৮) ইত্যাদি।

সাহিত্য-তত্ত্ব ব্যতিরেকে সাহিত্য-সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'পরিচয়'-এ। যেমন—প্রিয়রঞ্জন সেনের 'বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমের হাওয়া' (শ্রাবণ, ১৩৩৯), হুমায়ুন কবীরের 'সাহিত্যে বাস্তবতা' (কার্তিক, ১৩৩৯), অচ্যুতানন্দ গোস্বামীর 'শরৎচন্দ্র ও বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য' (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও আধুনিক সাহিত্য'

(বৈশাখ, ১৩৪৭) ইত্যাদি উল্লেখ্য ।

এছাড়াও ইতিহাস, শিল্প, রাজনীতি, সঙ্গীত, শিক্ষা, সমাজনীতি বিষয়ক যথেষ্ট গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠা আলোকিত করে থাকত । 'পরিচয়'-এর বিপুল প্রবন্ধরাজির গুণগত মানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে, 'পবিচয়' তার প্রথম প্রকাশের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিল তা যথার্থই রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। অর্থাৎ প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল ভাবধারাকে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করে, বাঙালি পাঠককে সর্বাঙ্গীনভাবে আন্তর্জাতিক চেতনায় দীক্ষিত করে তোলার প্রয়াস । 'পরিচয়'-এর সেই মহত্তর প্রয়াস বা আন্দোলনের অন্যতম অস্ত্রই ছিল তার প্রবন্ধাবলী ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়'-এর অন্যতম প্রধান সম্পদ ছিল 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগ । বিশিষ্ট সমালোচক ড. ভূদেব চৌধুরী এ প্রসঙ্গে সঠিক মূল্যায়ন করে বলেছেন—

> পত্রিকা হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের পরিচয়-এর শ্রেষ্ঠদান বাংলা সাহিত্যে পুস্তক সমালোচনাব এক অতি উন্নত—অভূতপূর্ব মান । সেই সঙ্গে মনস্বিতায় উজ্জ্বল গূঢ় গভীব প্রবন্ধরাজি, যার বিষয় দর্শন, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য-শিল্পকলা ।[১১]

হিরণকুমার সান্যালও স্বতন্ত্রভাবে 'পরিচয়'-এর 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগটিব গুরুত্ব উপলব্ধি করে লিখেছিলেন—

> পরিচয় যে একেবারে প্রথম থেকে বিশিষ্ট পত্রিকা বলে খাতির পেয়েছিল তা প্রধানত এই 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগের জন্যে । এর আগে বাংলা দেশের কোন পত্রিকা সমলোচনা-সাহিত্যকে এতটা সম্মানের আসন দেয়নি ।[২০]

'পরিচয়'-এর 'পুস্তক-পরিচয়' বিভাগের বিষয়-বৈচিত্র্য ছিল বিস্তৃত । সমসাময়িক অন্য কোন পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনা ঠিক ঐ ধরনের প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য লাভ করেনি । বাংলা সমালোচনা সাহিত্য ইতিপূর্বে খুব একটা অগ্রসর হয়নি । এর সাধারণ কারণ বাঙালি মনের স্বাভাবিক জড়তা আর অনেকটাই সুযোগের অভাব । সেই অভাবই মোচন করল 'পরিচয়' । মনের ও কলমের জড়তা কাটিয়ে একদল মননশীল লেখক 'পরিচয়'-এর পাতায় সাহসের সঙ্গে প্রবৃত্ত হলেন সমসাময়িক সাহিত্যের মূল্য নিরূপণে । 'পরিচয়'-এর এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে এক বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা । প্রথম পর্বের 'পরিচয়'-এ বিদেশী গ্রন্থের সমালোচনার প্রাচুর্য থাকলেও সমকালীন বাংলা সাহিত্যের মূল্যায়নেও 'পরিচয়'-এর লেখকেরা তীক্ষ্ণ লেখনী ধারণ করেছিলেন। নীরেন্দ্রনাথ রায় কিংবা জীবনময় রায় যেমন আক্রমণ করেছিলেন শরৎচন্দ্রকে শাণিত ভাষায় আধুনিকতার নব্য ধারাব দৃষ্টিকোণ থেকে; অন্যদিকে তেমনি বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কল্লোল-গোষ্ঠী সহ অন্নদাশঙ্কর রায়, শৈলজানন্দ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ লেখকদের কাব্য-উপন্যাসের ভাব-গম্ভীর আলোচনার পথও প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে, সুধীরকুমার চৌধুরী সহ আরো অনেকে । এছাড়া 'পুস্তক-পরিচয়'-এ অনুবাদ করা হয়েছিল আঁদ্রে জিদ, রবার্ট গ্রেভস, অলডাস হাক্সলি, এরিখ মারিয়া রেমার্ক, লিও তলস্তয়, দস্তয়ভস্কি, পাবলো নেরুদা, লোরকা

থেকে শুরু করে লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও তৃতীয় বিশ্বের অসংখ্য লেখকদের ।

প্রথম সংখ্যায় ১৫৪ পৃষ্ঠার মধ্যে ৩৬ পৃষ্ঠা পুস্তক-পরিচয় । যার মধ্যে কয়েকটি হল নীরেন্দ্রনাথ রায় কৃত শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'-এর আলোচনা, গিরিজাপতি ভট্টাচার্যকৃত বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' কাব্য ও 'অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প' । সুধীরকুমার চৌধুরী করেছিলেন অন্নদাশঙ্করের 'পথে প্রবাসে'র সমালোচনা, ধূর্জটিপ্রসাদ আলোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' । এছাড়া মূল জার্মান রচনার ভিত্তিতে মনীন্দ্রলাল বসু সমালোচনা করেছিলেন Leonard Franck-এর Karl and Anna; ফরাসী ভাষার মূল গ্রন্থগুলি পড়ে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত । সমকালীন বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র প্রকাশ বিষয়ে পরিচয়-গোষ্ঠীর লেখকরা ছিলেন অত্যন্ত সজাগ । কিন্তু পত্রিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং আকর্ষণ ছিল সমকালে পশ্চিমে প্রকাশিত বিবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সমালোচনা । আধুনিক সাহিত্য তো বটেই, তাছাড়াও জীববিদ্যা, নৃবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কেও গ্রন্থের আলোচনা হত 'পরিচয়'-এ । উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল— 'The Collected, Poems of Robert Frost' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (কার্তিক, ১৩৩৮), 'Philosophy of a Biologist'-Sir Leonard Hill—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (কার্তিক, ১৩৩৮), 'The Biological Basis of Human Nature'- H. S. Jennings—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (কার্তিক, ১৩৩৮), 'The Waves'- Virginia Woolf—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (বৈশাখ, ১৩৩৯), 'The New Conceptions of Matter'- C. G. Darwin—গিরিজাপতি ভট্টাচার্য (বৈশাখ, ১৩৩৯), 'The Scientific Outlook'- Bertrand Russell—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (শ্রাবণ, ১৩৩৯), 'The Triumphal March'- T. S. Eliot'—বিষ্ণু দে (কার্তিক, ১৩৩৯), 'The Teaching of Karl Marx'- V. I. Lenin—সুশোভন সরকার (মাঘ, ১৩৩৯), 'The Common Reader'- Virginia Woolf —বিষ্ণু দে (বৈশাখ, ১৩৪০),'The Nature of Capitalist Crisis'- Jolm Strachy—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (মাঘ, ১৩৪২), 'Wheels and Butterflies'- W. B. Yeats—হুমায়ুন কবীর (শ্রাবণ, ১৩৪২), 'The Ancient World'- T. R. Glover —হরীতকৃষ্ণ দেব (বৈশাখ, ১৩৪৩),'Philosophy of Rhetoric'- I. A. Richards—নীরেন্দ্রনাথ রায় (শ্রাবণ, ১৩৪৪), 'The Communist International'- F. Borkenau—সুশোভন সরকার (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫), 'Fascism'- M. N. Roy —সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (মাঘ, ১৩৪৫),'Bounderies of Science'- Jolm Macmurry—সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (পৌষ, ১৩৪৬), 'America faces the War'- Mr. Roosevelt Speaks—হিরণকুমার সান্যাল (চৈত্র, ১৩৪৮) ইত্যাদি ।

পুস্তক-সমালোচনার এই সমারোহ সত্যই বিস্ময়কর । 'পরিচয়' বিশেষ করে সমকালীন পশ্চিমের ভাবনা এবং সাহিত্যকর্ম বিষয়ে বাঙালি পাঠক-পাঠিকাকে আগ্রহী করে তুলেছিল; স্বদেশের উদ্যম উদ্যোগকে বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে নিরিখ করার চেষ্টা ছিল সেখানে । 'পরিচয়'-এর লেখকগোষ্ঠী সার্বিক কর্মকান্ডের দ্বারা বাঙালি মননকে আন্তর্জাতিক স্তরে জাগ্রত করে তোলবার আন্দোলনেই অগ্রসর হয়েছিলেন ; বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনও তাঁদের লক্ষ্য ছিল । তাই দেখা যায়, পদার্থবিদ্যা,

মনোবিজ্ঞান, জীববিদ্যা, নৃতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি দুরূহ বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনায় একটিও ইংরেজী শব্দ ব্যবহার না করে বাংলা ভাষাকে শক্তিশালী করে তোলার দায়িত্ব 'পরিচয়' নিয়েছিল। 'পরিচয়'-এর পুস্তক আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মূল্যায়নটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ—

> এমন বুদ্ধিদীপ্ত, রসোজ্জ্বল, নিটোল সমালোচনা এমন অজস্র পরিমাণে বাংলা ভাষায় আর কখনো উৎপন্ন হয়নি ; এই একটা বিষয়ে 'পরিচয়' যে আদর্শ স্থাপন করে গেছে সেখানে আবার কখনো কোনো পত্রিকা পৌঁছবে কিনা জানি না।[২১]

বাংলা সাহিত্যে অদ্যাবধি এমন কোন প্রগতিশীল পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি, যার সঙ্গে সমসাময়িক সময়ে বা পরবর্তীসময়ে এক বা একাধিক পত্রিকার বিরোধ বাধেনি। বিতর্ক ব্যাপারটি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় জমান খানিকটা মুশকিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তর্ক জমে উঠেছিল 'পরিচয়'-এর জন্মের সূচনাতেই। 'পরিচয়' চেয়েছিল সমস্ত বাঙালি পাঠকের সবরকমের কূপমন্ডুকতার গুটি কাটিয়ে আধুনিক মননশীলতার উপযুক্ত করে তুলতে। স্বাভাবিকভাবেই তাই সমকালীন কয়েকটি পত্রিকার সঙ্গে তার বিরোধ ছিল অনিবার্য। এ প্রসঙ্গে 'পরিচয়'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন —

> ...পরিচয় একাধিক দলের সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি না করে পারেনি। যে পত্রিকাব প্রধান অঙ্গ সমালোচনা, সে পত্রিকার পক্ষে এই জাতীয় বিরোধ এড়িয়ে চলা একরকম অসম্ভব ছিল। পরিচালকদের সাধ্যমত চেষ্টা ছিল পরিচয়-এর সমালোচনা যাতে একেবারে পক্ষপাতশূন্য হয়। এ বিষয়ে লেখকদের ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, নির্বাচিত রচনায় সম্পাদক কদাচিৎ হস্তক্ষেপ করতেন। আমাদের সকলেরই মত ছিল দরকার হলে কাউকেই ছেড়ে কথা বলব না। এই নীতির একটিমাত্র ব্যতিক্রম আমবা মেনে নিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে : Others abide our question thou art free। আসল কথা, জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে কলহটা খুব সমীচীন হয় না।[২২]

'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম সাহিত্য বিতর্ক ছন্দ প্রসঙ্গে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যা স্মরণীয়। 'পরিচয়'-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় শেলির 'ওয়ান ওয়ার্ড ইজ টু অফেন প্রোফেনড' কবিতাটির দুটি অনুবাদ বেরিয়েছিল, একটি নীরেন্দ্রনাথ রায়ের আর একটি রবীন্দ্রনাথের। নীরেন রায়ের অনুবাদটির গোড়ার লাইন 'একটি কথা এতবার হয় কলুষিত'। 'একটি শব্দটিকে এখানে লেখক দুই মাত্রা দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথও তা বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন। অথচ 'একেকটি শব্দটিকে কবি তাঁর নিজেরই রচনায় দিয়েছেন চার মাত্রার ওজন, এই নজির দেখিয়ে দিলীপকুমার রায় আপত্তি জানিয়েছিলেন 'উত্তরা' পত্রিকায়। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'পরিচয়'-এ 'ছন্দের হসন্ত হলন্ত' (মাঘ, ১৩৩৮) নামক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে কবি ব্যাখ্যা করলেন পয়ার-জাতীয় সমমাত্রার ছন্দের স্থিতিস্থাপকতার রহস্য দৃষ্টান্ত সহকারে যেমন —

টোটকা এই মুষ্টিযোগ লট্‌কানের ছাল,
সিট্‌কে মুখ খাবি, জ্বর আটকে যাবে কাল।

নীরেন রায়ের 'একটি কথার মতন, ওপরের ছড়ায় শব্দমধ্যস্থ হসন্তগুলি মাত্রার ওজনে বাদ পড়েছে। কবি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রাকৃত বাংলার স্বরবর্ণের সজীবতার জন্যই

প্রাক্-হসন্ত স্বর কখনো দীর্ঘ, কখন লঘু করে পড়া যায় । কবি তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করে' গানটি উল্লেখ করে লিখেছেন —

'এখানে 'রূপ' আপন হসন্ত প-এর ঝোঁকে 'সাগরে'র মা-টাকে টেনে আপন করে নিয়েচে, মাঝে ব্যবধান থাকতে দেয়নি । 'রূপ-সা' তাই আপনিই তিনমাত্রা হয়ে গেল । 'সাগরে'র বাকি টুকরো রইল 'গরে' । সে আপন ওজন বাঁচাবার জন্যে 'রে'টাকে দিলে লম্বা করে, তিনমাত্র পূরল । ...এমনি করে আগাগোড়া তিনমাত্রা জমে উঠল ।'

দিলীপকুমার রায় আবার আপত্তি জানালেন 'পরিচয়'-এর 'পাঠকগোষ্ঠী' বিভাগে (বৈশাখ, ১৩৩৯) । 'রূপসাগরে' গানটির মাত্রাবিভাগ করলেন নিম্নরূপ—

১	১১১	১১	১১১	১১	১১	১১	১১
রূপ	সাগরে/	ডুব	দিয়েছি/	অরূপ	রতন/	আশা	করি/

তারপর নাম করে মোহিতলাল, বুদ্ধদেব, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কালিদাস রায়কে 'পরিচয়' মারফৎ প্রশ্ন করলেন যে 'রূপসাগরে' গানটি তাঁরা পড়েন কোন্ ছন্দে, রবীন্দ্রনাথের মতন ত্রৈমাত্রিকা না তাঁর নিজের মতন চতুর্মাত্রিক স্বরবৃত্ত ছন্দে ? কিন্তু এ প্রস্তাব 'পরিচয়' সম্পাদকের সমর্থন পায়নি । পরের সংখ্যাতেই যদিও প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ-বিতর্ক' নামে একটি প্রবন্ধ । এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে কবি অল্প কথায় পরিষ্কার জানালেন যে, ছন্দের রকমফের হয় শুধু মাত্রার ওজনে নয়, লয়ের বৈচিত্র্যে । এর পরের সংখ্যাতেও (কার্তিক, ১৩৩৯) কবি লিখলেন 'নবছন্দ' বলে আর একটি প্রবন্ধ । এই প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য ইচ্ছেমতো মাত্রাসংখ্যা বাড়িয়েও যতিস্থাপনের রকমফের করে 'বাংলায় নতুন নতুন ছন্দ তৈরি করতে অসাধারণ নৈপুণ্যের দরকার করে না । 'নবছন্দ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নয় মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ দিয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে আর একটি তর্ক জুড়লেন অমূল্যসাধন মুখোপাধ্যায় 'নয় মাত্রার ছন্দ' (কার্তিক, ১৩৪০) প্রবন্ধে । যদিও ইতিপূর্বে তাঁর আরো একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল 'গদ্যের ছন্দ' শিরোনামে (মাঘ, ১৩৩৯) । 'গদ্যের ছন্দ' প্রবন্ধে অমূল্যধন লিখেছিলেন —

'পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দের মধ্যে সবর্বপ্রধান পার্থক্য এই যে — পদ্যছন্দ ঐক্যপ্রধান এবং গদ্যছন্দ বৈচিত্র্যপ্রধান।'

রবীন্দ্রনাথও এই কথাকে সমর্থন করেছিলেন তাঁর 'পুনশ্চ' নামাঙ্কিত একটি পত্রে (বৈশাখ, ১৩৪৩) ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তও 'পুনশ্চ' ও 'পরিশেষ' বইদুটির উল্লেখ করে তাঁর 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' (মাঘ, ১৩৩৯) প্রবন্ধে লিখলেন — 'এমন করে মনে হওয়া অন্যায় নয় যে এই গ্রন্থ দু'খানিতে রবীন্দ্রনাথ ভাষা, ধবনি ও প্রসঙ্গের দিক দিয়ে যেখানে পৌঁছেছেন, তার পরে আর এগুনো অসম্ভব । সাত্ত্বিক কবিমাত্রেই গদ্য-পদ্যের বিবোধ দূর করবাব চেষ্টা করে এসেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হননি। এতদিন পরের রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়ে হয়তো সে বিবাদের নিষ্পত্তি হলো ।'

এর তিন বছর পরে ১৩৪৩-এর কার্তিক সংখ্যায় 'পরিচয়'-এ হিরণকুমার সান্যাল রবীন্দ্রনাথের 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' সমালোচনা উপলক্ষে কিছুটা উগ্রভাবেই লিখেছিলেন যে, আধুনিকদের গদ্যকবিতার বিস্তার কচুরিপানার বংশবৃদ্ধির মতোই এবং একমাত্র রবীন্দ্রনাথের

কলমে গদ্য-কবিতা সাহিত্যিক উৎপাত হয়ে ওঠেনি । বুদ্ধদেব বসু এব জবাব দিলেন আরো উগ্রভাবে তাঁর সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় ।

যাইহোক, নবজাত 'পরিচয়' পত্রিকায় পৃষ্ঠায় ছন্দ নিয়ে যে বিতর্ক জমে উঠেছিল এবং সেই বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ যোগ না দিলে বাংলা ছন্দের অনেক রহস্যই আমাদের কাছে আজও তা স্পষ্ট থেকে যেত ।

'সাহিত্যে বাস্তবতা' নামে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল হুমায়ুন কবীর রচিত 'পরিচয়'-এর ১৩৩৯-এর কার্তিক সংখ্যায় । প্রবন্ধ টিতে তিনি বাংলা সাহিত্যে অবাস্তবতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে—

'এদেশে আজ প্রায় সাতশো বছর হিন্দুমুসলমান পাশাপাশি ঘর করেছে । .....সমস্ত বাংলা সাহিত্য পড়েও কি কেউ ভাবতে পারে যে সাতশো বছর এত বড় দুটো জাতি এমন করে পাশাপাশি জীবনযাত্রা নিবর্বাহ করেছে......বাংলা সাহিত্য বাংলার জাতীয় জীবনের এ বৈচিত্র্যকে রূপ দিতে পারে নাই, তাই জীবনের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য বাংলা সাহিত্যে আজো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নাই।'

কিন্তু যে ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক কারণে বাংলা সাহিত্যে এই বাস্তবতার অভাব বোধ দেখা গিয়েছিল কবীরসাহেব তা বোঝার চেষ্টা করেননি, দোষ চাপিয়েছেন হিন্দু সাহিত্যিকদের ঘাড়ে । সমসাময়িক সময়ে এই প্রসঙ্গ নিয়ে বিতর্ক হয়নি । এর কয়েক বছর পর 'পরিচয়'-এ আশানন্দ নাগের 'অহিন্দুর দৃষ্টিতে হিন্দু সমাজ' (চৈত্র, ১৩৪৫) প্রবন্ধ কিন্তু উত্তাপ সঞ্চার করল। আশানন্দ নাগ লিখেছিলেন —

'সাধারণ হিন্দু হিন্দুধর্ম ও হিন্দুকৃষ্টিকে ভালবাসেন কিন্তু ভারতবর্ষকে ভালবাসতে শেখেননি ।

...জাতীয়তাবাদ যতখানি পর্য্যন্ত হিন্দুয়ানির পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে, ততটা পর্য্যন্তই সাধারণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমর্থন করেন । তার বেশী এগুতে সাহস করেন না ।'

হিন্দু জাতীয়তাবাদের দুর্বলতা দেখাতে চেয়েছিলেন আশানন্দ নাগ । কিন্তু প্রবোধচন্দ্র বাগচী একটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ লিখলেন 'হিন্দুর দৃষ্টিতে অহিন্দু সমাজ' নামে, যেটি প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় । আশানন্দ ধর্মে ছিলেন খ্রিস্টান, তাই বোধ হয় প্রবোধচন্দ্র লিখেছিলেন চীন ও জাপানে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টধর্মের সংঘাতের সংবাদ । আশানন্দ উত্তর দিয়েছিলেন পরের সংখ্যাতেই 'সুদুর প্রাচ্যে খ্রীষ্টধর্ম' নামক প্রবন্ধে । ইতিহাস সচেতন মন নিয়ে স্বীকার করলেন—

'ইউরোপের রাজনৈতিক প্রতাপ ঈশার ধর্মের পরিপন্থী । এজন্যই বিভীষিকা ভারতবর্ষে ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে উৎকৃষ্ট আকারে দেখা দিয়েছে ।'

এইভাবেই 'পরিচয়'-এর আঙিনায় মননসমৃদ্ধ বিতর্কের আসর জমে উঠত যা বাঙালি পাঠকের বুদ্ধির দীপ্তিকেই আরো শানিয়ে দিত ।

'পরিচয়'-এর সঙ্গে একাধিক দলের বা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল ।

যেমন 'পরিচয়'-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় হিরণকুমার সান্যাল বিশ্বপতি চৌধুরীর 'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। লিখেছিলেন—

'সাহিত্যের বিচার ও বিশ্লেষণ অতি দুঃসাহসিক কাজ। এই কাজে সাফল্যের জন্য যে দুর্লভ শক্তির প্রয়োজন, বিশ্বপতিবাবুর রচনায় তাহার আভাস পাওয়া যায় না। .....তাই তাঁহার লেখা পড়িবার সময় বারম্বার মনে হয় যেন গলদঘর্ম্ম গুরুমহাশয় নির্বোধ ছাত্রগণকে দুরূহ পাঠ বুঝাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।'

স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বপতিবাবু ও তাঁর সাহিত্যিকবন্ধু দের আসর 'রসচক্র'-এর সকলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। রসচক্রের অন্যতম সদস্য কালিদাস রায় একটি প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন। 'পরিচয়'-সম্পাদকের কাছে। কিন্তু অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ার দরুণ সেটি মুদ্রিত হয়নি।

এরপরেও রসচক্রের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটেছিল 'পরিচয়'-এর। রসচক্রের গোষ্ঠীপতি সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'রবি-দীপিতা' গ্রন্থটির সমালোচনা করেছিলেন নির্মল মৈত্র চতুর্থ বর্ষের 'পরিচয়'-এর চতুর্থ সংখ্যায়। 'বলাকা' প্রসঙ্গে 'রবি-দীপিতা'র লেখক প্রকৃতি সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসের ওপর সমালোচকের মন্তব্য —

'ভাষা এবং ভাবের এই অপ্রত্যাশিত উৎপাতে বিশৃঙ্খলবাক্ গ্রন্থকারের প্রকৃতিস্থতা বিষয়েই পাঠকের সন্দেহ জন্মে।'

'পরিচয়'-এর এই আক্রমণের প্রথম লক্ষ যদিও শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'। প্রথম সংখ্যাতেই নীরেন্দ্রনাথ রায় তীক্ষ্ণ, তীব্রভাবে 'শেষ প্রশ্নে'র সমালোচনা লিখলেন—

'চারিশত পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গল্পটি পড়িতে পড়িতে সন্দেহ হইল—শরৎবাবু কি থামিতে ভুলিলেন ?'

কিংবা আরো কঠোরভাবে বললেন—

'এই কমলই হইতেছে শেষ-প্রশ্নের মুকুটিত কীর্ত্তি অথবা অপকীর্ত্তি।'

এই ধরনের সমালোচনায় স্বয়ং শরৎচন্দ্রও যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে 'পরিচয়'-এর আদিপর্বেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যে বিরোধ শুরু হয়েছিল তা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। ১৩৪০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের 'তরুণের বিদ্রোহ' ও 'স্বদেশ ও সাহিত্য' এই দুটি বইয়ের সমালোচনা করলেন জীবনময় রায়। স্বাভাবিকভাবেই আলোচ্য বিরূপ সমালোচনাও শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত মর্মাহত করেছিল। তবে সৃজনমূলক সমালোচনাও যে 'পরিচয়'-এর পাতায় হত তারও প্রচুর এবং সর্বাধিক নিদর্শন 'পরিচয়' নিজেই। যেমন, দ্বিতীয় সংখ্যাতেই (কার্তিক, ১৩৩৮) রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের 'লঘু-গুরু' উপন্যাসের সমালোচনা করেও তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিককেই যুক্তিসহকারে তুলে ধরেছিলেন। আসল কথা সদ্য তরুণ সম্প্রদায় যৌবনের উদ্দামতায় ও মননের নির্ভীকতায় তখন 'পরিচয়'-এর আসর উত্তপ্ত করে রেখেছিলেন। তারই প্রতিফলন ছিল কিছু কঠোর সমালোচনায়, স্বাভাবিকভাবেই তাই বিরোধও তৈরি হয়েছিল।

১৯৩৬ সালে গঠিত হয়েছিল 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। এই সংঘের

প্রভাব 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠাতেও প্রতিফলিত হয়েছিল। প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ছিল মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় উদ্যোগ। পরিচয়-গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে মার্কসবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসীরা হলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এঁরা প্রায়ই 'পরিচয়'-এর আড্ডায় উপস্থিত থেকে প্রগতি লেখক সংঘের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ নিয়ে আলোচনা এবং বিতর্ক করতেন, ইস্তাহার পাঠ করতেন আর সংঘের জন্য সদস্য ও অর্থ দুই-ই সংগ্রহ করতেন। 'পরিচয়' পত্রিকার আরো প্রগতি অভিমুখী পর্বান্তর ঘটে এই সময়েই।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন 'পরিচয়' সম্পাদক ও 'স্বঘোষিত প্রগতিবিরোধী' বলে পরিচিত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতিমন্ডলীর অন্যতম সদস্যরূপে প্রগতি সাহিত্য-আন্দোলনে অনুপ্রবেশ করেছিলেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল। ১৯৪১-এর ২২জুন হিটলার অতর্কিতে সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করায় শুরু হল যুদ্ধের নতুন পর্যায়। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, সোভিয়েতের সপক্ষে জনতার পাশে দাঁড়াতে বাংলার লেখক-শিল্পীবৃন্দের অধিকাংশই তখন ইতস্তত বোধ করেননি। আর তখন 'পরিচয়'ও এক সমুজ্জ্বল ভূমিকায় নামল, সবাই যে সর্ববিষয়ে একমত তা নয়;কিন্তু 'পরিচয়' সংশ্লিষ্ট লেখকদের মধ্যে গভীর ও প্রখরভাবে সমাজবাদী প্রত্যয়ের পদধবনি যেন তখন আরও স্পষ্ট হতে লাগল। 'পরিচয়'-এর আড্ডায় এই সময় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, রাধারমণ মিত্ররাও নিয়মিত আসতে শুরু করেছেন। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে 'পরিচয়'-এর আর্থিক অবস্থা ক্রমশই সঙ্গীন হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। সুধীন্দ্রনাথ এই সময় 'পরিচয়'-এর কাজকর্ম দেখাশোনার বিশেষ অবকাশ পেতেন না। নীরেন্দ্রনাথ রায়ও নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শের টানে অন্যত্র ব্যস্ত থাকতেন। এই সঙ্কটের সময় সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদক রূপে 'পরিচয়'-এর হাল ধরেছিলেন হিরণকুমার সান্যাল। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ এ সময়ে কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। 'পরিচয়' পরিচালনার সমগ্র দায়িত্ব মূলত বহন করতে থাকেন হিরণকুমার সান্যাল ও কুন্দভূষণ ভাদুড়ী। আর্থিক দুরবস্থার জন্য সুধীন্দ্রনাথ এই সময় কাগজের স্বত্ব পরিত্যাগ করতে মনস্থির করেছিলেন। হিরণকুমার সান্যালের পরিচালনায় 'পরিচয়'-এর পালাবদল যে ঘটতে চলেছে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ মিছিল করে একটি ফ্যাসিস্তবিরোধী সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার সময় ঢাকার রাজপথে যেদিন নৃশংসভাবে নিহত হলেন তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ, তার কিছুদিন পরে 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয় একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ।

> লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর পটভূমিকায় একটি মাত্র লোকের মৃত্যু তুচ্ছ মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিছু বিশেষ পরিবেশে একজনের মৃত্যু বহু মৃত্যুর চাইতে বেশি অর্থবহ হতে পারে। সোমেন চন্দ-র মৃত্যু এই জাতীয়। ... সোমেন মার্কসবাদী ছিল। এই মার্কসবাদের প্রেরণাতেই সে ফ্যাসিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে নির্ভীকভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। তাকে প্রাণ বলি দিতে হল এই বর্বরতার যূপকাষ্ঠে। সব থেকে শোচনীয় ব্যাপার এই যে সোমেনকে যারা হত্যা করেছে তারা জার্মান, ইটালীয় বা জাপানী নয়, তারা আমাদেরই দেশের লোক। ফ্যাসিস্ত বর্বরতার প্রভাব কীরকম ব্যাপক ও তার বিরুদ্ধে আমাদের কতখানি

সতর্ক হওয়ার দরকার আছে এই ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায় । আশার কথা এই যে সোমেনের মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি ।[২৩]

হিরণকুমার সান্যাল রচিত এই নিবন্ধ টি পড়ে অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় নাকি লেখককে বলেছিলেন: 'পরিচয় এতদিনে মোড় ফিরল ।'

ছ'হাজার টাকার বিনিময়ে ১৯৪৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে সুদীর্ঘ একযুগ পরে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'পরিচয়'-এর মালিকানা হস্তান্তরিত করেছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির হাতে । পার্টির তরফ থেকে গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপক সুশোভন সরকার । এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

> প্রকারান্তরে 'পরিচয়' এসে পড়ল পার্টির আয়ত্তে । তবু 'পরিচয়' কখনোই ঠিক পার্টি সম্পত্তি হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস, আজও 'পরিচয়' একটা প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থা—যার অংশীদারদেব নাম আইনত প্রকাশ করতে হয়।[২৪]

১৯৪৩ সালে (শ্রাবণ, ১৩৫০) 'পরিচয়' অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অংশরূপেই প্রকাশিত হতে থাকে । প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর আত্মিক যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায় । হস্তান্তরিত হবার পর 'পরিচয়' সম্পাদকরূপে হিরণকুমার সান্যাল যে সম্পাদকীয় লেখেন তার নামই ছিল 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও পরিচয়' (আশ্বিন, ১৩৫০) । এই সম্পাদকীয়তে 'পরিচয়'-এর প্রকাশনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য সুধীন্দ্রনাথকে নিবেদন করা হয়েছিল আন্তরিক শ্রদ্ধা । প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনে সুধীন্দ্রনাথের এই প্রশংসনীয় সহযোগিতা ও উদ্যোগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল । যে উদার মানবিকতা ও সাহিত্যবোধের ব্যাপক ও গভীর পটভূমিতে তিনি 'পরিচয়'-কে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তা বাংলাদেশের পত্রিকা জগতে নতুন এক পর্বের সূচনা করেছিল ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত পরিচয়-এর আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং পটভূমি;আর কমিউনিস্ট পার্টি সম্পাদিত 'পরিচয়'-এর আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং পটভূমি সম্পর্কে গোপাল হালদার লিখেছেন—

> ১৯৩২-এ যখন সুধীন্দ্রনাথ 'পরিচয়' প্রকাশিত করেন তখন তার পটভূমিতে একদিকে ছিল ১৯২৯-এর অর্থনৈতিক মন্দায় বিপর্যস্ত বুর্জোয়া জগৎ, অন্যদিকে 'প্রথম পঞ্চবার্ষিক সংকল্পে' উদ্দীপিত সোভিয়েত কর্মযজ্ঞ । মাঝখানে, আমাদের অব্যবহিত পরিবেশে, ছিল সাম্রাজ্যবাদে বিক্ষুব্ধ ও 'রাশিয়ার চিঠি'তে উচ্চকিত জীবনজিজ্ঞাসা । 'পরিচয়'-এর প্রথম সংখ্যাতে নীরেন্দ্রনাথ রচিত ঘোষণাপত্রে 'পরিচয়'-এর তৎকালীন সচেতনতা জ্ঞাপিত হয় যথেষ্ট উদার কণ্ঠে ও সুস্থ বিশ্বাসে—মানব সংস্কৃতির পরিচয় মানুষের পৌঁছে দেওয়া যেমন তার প্রয়াস, আপন পরিচয়কে তেমনি বিশ্বের সম্মুখে উপস্থাপিত করা তার লক্ষ। দেখি মানবপ্রগতিতে যেমন তার শ্রদ্ধা, আপন শক্তিতেও তেমনি তার প্রত্যয় । ত্রৈমাসিক 'পরিচয়'-এ এই দুই ধারা যে রূপে প্রবহমান তা সর্বরকমেই পরিচালকদের শ্লাঘার বিষয় ; বাংলা কেন, অনেক অগ্রগামী পাশ্চাত্য সাহিত্য-পত্রের পক্ষেও তা শ্লাঘ্য হত । ... দিনবদলের প্রতি অরুচিতে কর্তৃপক্ষ অব্যাহতি খোঁজেন । হাত বদলে পশ্চিম বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি 'পরিচয়'-এর সুহৃদ-সহায়কদের মধ্যস্থতায় পত্রের সত্ত্বাধিকার ক্রয় করে সেই দায়িত্বভার

গ্রহণ করে—সভ্যতার নবজন্মের আয়োজন সকল মানুষেরই দায়িত্ব—'পরিচয়'এরও সে উদ্যোগে নেওয়া উচিত বিশেষ স্থান। সুহৃদ লেখকদের সহায়তায় চাই—'পরিচয়'-এর মূল আদর্শের কালোচিত বিবর্তন, ইতিহাসের নিয়মে তার প্রয়োজনীয় রূপায়ন প্রয়োজন মানুষের মুক্তির আয়োজনে আক্ষুদ্র সকল মানুষের মননশীলতায় জাগ্রত ও সৃজনশীলতায় প্রবুদ্ধ করা—সর্বজনীন সংস্কৃতির উজ্জীবন।[২৫]

১৯৪৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে 'পরিচয়' পরিচালনার প্রত্যক্ষ ভার অর্পিত ছিল প্রগতি লেখক সংঘের হাতে। এই সংঘের তরফে 'পরিচয়' সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন প্রগতি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা গোপাল হালদার ও হিরণকুমার সান্যাল। দ্বিতীয় পর্বের প্রথম থেকেই 'পরিচয়' নিছক কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক মুখপত্র রূপেই কাজ করেনি, তা ছিল ফ্যাসিস্ত-বিরোধী বৃহত্তর যুক্তফ্রন্ট এবং প্রগতি লেখক সংঘের অঘোষিত মুখপত্র। ফলে 'পরিচয়'-এর লেখকগোষ্ঠীও কেবল পার্টির লেখকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, তা উন্মুক্ত ছিল পার্টি বহির্ভূত ব্যাপক লেখক মন্ডলীর মধ্যে। চল্লিশের দশকের ঐ সময়টাও নিঃসন্দেহে ছিল সামগ্রিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টি, ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এবং 'পরিচয়' পত্রিকার নেতৃত্বে এক সম্মিলিত জাগরণের যুগ।

চল্লিশের দশকেই রাজশেখর বসু, প্রমথ চৌধুরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সুশীল জানা, ননী ভৌমিক, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সরোজ আচার্য, সমর সেন, চিন্মোহন সেহানবিশ থেকে শুরু করে সুকান্ত ভট্টাচার্য, অবন্তী সান্যাল, অসীম রায়, সমরেশ বসু প্রমুখ বিপুল সংখ্যক খ্যাত, স্বল্পখ্যাত এবং তরুণ লেখকের সমাবেশ ঘটেছিল 'পরিচয়' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। এছাড়া 'পরিচয়'-এর দুই সম্পাদক গোপাল হালদার ও হিরণকুমার সান্যাল তো বটেই, নীরেন্দ্রনাথ রায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখ প্রাক্তন পরিচয়-গোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকরাও ছিলেন এই লেখকবৃত্তের অন্তর্গত। 'পরিচয়'-এর এই পর্বের লেখালেখি প্রসঙ্গে কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন—

> 'পরিচয়'-এ তখন সরাসরি ফরমায়েশ করা ও সংগ্রহ করে আনা লেখাই ছাপা হত না, লেখব সঙ্ঘে যে সমস্ত সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা ও বিতর্ক চলত সেগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে বিতর্কের জন্যে পত্রিকার দরজাও দেওয়া হত খুলে। ..সাহিত্য তখনও এদেশে বাণিজ্যের পণ্য হয়ে ওঠেনি, সাহিত্য আলোচনায় তাই কঠোর নিরপেক্ষতা বিষয়মুখিনতা ও সমনোযোগ নিষ্ঠার অবকাশ ছিল অনেকখানি। আর ছিল পার্টির বাইরের লেখকদের প্রতি সূক্ষ্ম সৌজন্যবোধের পরিচয়, তাঁরা যাতে কোনো কারণে ক্ষুণ্ণ না হন, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি।[২৬]

'পরিচয়' যাতে নিছক পার্টির আরেকটি মুখপত্রে পরিণত না হয়, সেদিকে 'পরিচয়'-এর মালিকপক্ষ এবং পরিচালকমন্ডলীর সদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল। 'পরিচয়' ছিল সাহিত্য এবং সংস্কৃতিমূলক পত্র। তার প্রধান কাজই হল নতুন সংস্কৃতির জন্য নতুন চেতনার সৃষ্টি এবং সৃজনশীল মানসিকতার পরিপুষ্টসাধন। আর, যুদ্ধকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির

মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাবীসৃষ্টির সম্ভাবনাকে চিনে নেওয়া এবং পাঠকের চৈতন্যকে প্রসারিত করা। এই মূলনীতি সম্পর্কে 'পরিচয়' পরিচালক বর্গের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এ প্রসঙ্গে তৎকালীন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার মহাশয় যথার্থই লিখেছেন—

> কমিউনিস্ট পার্টি (বাংলার) 'পরিচয়'কে নিজেদের 'পলিসি' প্রচারের জন্য হাতে নেয়নি। ...'পরিচয়ে'র পাঠক সুশিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। জিজ্ঞাসায়, মননশীলতায় ও রূপ-রসের সৃষ্টিতে ও আলোচনায় তাঁদের রুচি। একটু 'উন্নাসিক' বলেও আর খ্যাতি। তার বুদ্ধিজীবী ঐতিহ্যকে মেনে নিয়ে তাকে ব্যাপকতর বুদ্ধিজীবী সমাজের মুখপত্র করা প্রয়োজন।[২৭]

অর্থাৎ 'পরিচয়'-এর মত আছে কিন্তু কোনো মতবাদ নেই।

১৯৪৮ সালের পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টি 'পরিচয়'-এর সম্পাদনা ও পরিচালনাব ক্ষেত্রে একেবারে পার্টি বিরোধী কিছু ছাপা না হলে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করেনি। এই সময়ে পরিচয়-কেন্দ্রিক লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের বিচারে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও কমিউনিস্ট লেখকদের কর্তব্য নিরূপণ প্রসঙ্গে তীব্র বিতর্ক উপস্থিত হয়েছিল এবং ক্রমেই তা তিক্ত হতে আরম্ভ করেছিল। ১৩৫৪-এর পৌষ সংখ্যা থেকে শুরু করে ১৩৫৫-এর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় 'পরিচয়'-এ তর্ক-বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, শীতাংশু মৈত্র ও নীরেন্দ্রনাথ রায়। ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি নাগাদ 'পরিচয়' পত্রিকার পরিচালন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবার জন্য মাস ছয়েকের মতো পত্রিকাটি বন্ধ ছিল। ছমাস বাদে ১৯৫০ সালের প্রথম চার মাসে নবপর্যায় 'পরিচয়'-এর চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল নতুন পরিচালন-ব্যবস্থায়, গোলাম কুদ্দুস ও সরোজকুমার দত্তের যুগ্ম-সম্পাদনায়। তারপর আবার 'পরিচয়' কয়েক মাস বন্ধ। ১৯৫০ সালের শেষার্ধে যখন নতুন করে আবার 'পরিচয়' প্রকাশিত হয়েছিল। তখন সম্পাদনার দায়িত্বে সুশীল জানা ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। গোটা কমিউনিস্ট পার্টি তখন ছত্রভঙ্গ। 'পরিচয়'-এর অনেক সদস্য, লেখক ও কর্মী তখন জেলখানায় আটক। এই সময়ে মঙ্গলাচরণের একক পরিশ্রমের ফলে 'পরিচয়' প্রকাশিত হতে পেরেছিল। ১৯৫১ সাল থেকে 'পরিচয়' সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পরিচয়'-এর আয়ুষ্কাল ছিল এক বছরের মতো। ১৯৫২ সাল থেকে সম্পাদক হন ননী ভৌমিক। এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে 'পরিচয়' তার স্বাভাবিক গতিপথের ছন্দে সুস্থিত হতে আরম্ভ করেছিল।

১৯৫৬ সালের শেষ দিকে 'পরিচয়' সম্পাদক রূপে আবার নিযুক্ত হয়েছিলেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। এই সময়ে প্রদ্যোৎ গুহ, অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মুজমদার, চিত্ত ঘোষ, মতি নন্দী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের যোগদানে 'পরিচয়'-এর মানের সমৃদ্ধি ঘটেছিল। পরবর্তী সময়ে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনার দায়িত্বে নিয়ে 'পরিচয়'-এর মান উন্নত আরো অনেকটাই করতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে গোপাল হালদার মহাশয় লিখেছেন—

> ...আমাদের পরে দীপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি একটা অসাধ্য সাধন করেছেন—'পরিচয়'-এর লেখা উন্নত করেছেন, লেখার মান এখন উন্নত,'পরিচয়' অধিকতর মর্যাদার অধিকারী।[২৮]

পর্যায়ক্রমে সম্পাদক হয়েছেন দেবেশ রায় ও বর্তমানে অমিতাভ দশগুপ্ত। উনিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে পথযাত্রা শুরু করেছিলেন এশিয়ার বৃহত্তম এই পত্রিকাটি,অদ্যাবধি

সে যাত্রা থামেনি; নব নব সৃষ্টি সম্ভার নিয়ে 'পবিচয়' প্রকাশিত হয়ে চলেছে আপন ছন্দে ও আপন গতিতে ।

সাহিত্য সমালোচনায়, দর্শনচর্চায়, রাজনীতি আলোচনায় এবং সৃষ্টিশীল শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'পরিচয়'-এর দ্বিতীয় পর্ব নতুন যুগের সূচনা কবেছিল । চিন্তার মুক্তি ঘটানর যে আযোজন সুধীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীরা আরম্ভ করেছিলেন, এই পর্বে তা বিস্তৃত হয়েছিল বৃহত্তর ক্ষেত্রে ও ব্যাপকতম অর্থে । বিভিন্ন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সর্বোপরি রবীন্দ্র-জীবনী, সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথের চৈতন্য-চেতনা ও মনন সম্পর্কে অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল এই পর্বে ।

দর্শনের বিভিন্ন ভাগ যেমন চার্বাক দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, পাশ্চত্য দার্শনিকদের আলোচনা সম্পর্কে যাঁরা আলোচনা করেছিলেন প্রবন্ধ সহ তাঁরা হলেন হাক্সলি ও অ্যান্ড্রুয়াসের 'কি পেরিনিয়ল ফিলজফি' এবং নীড্হাস্ ও জোসেফের 'টাইম দি রিফ্রেশিং রিডার' সম্পর্কে 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে কার্তিক, ১৩৫৪ সালে আলোচনা করেছিলেন সরোজ আচার্য । 'বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী' সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (আশ্বিন-চৈত্র, ১৩৪৮, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯) ।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আলোচনা করেছিলেন 'চার্বাক দর্শন' (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪)। বটকৃষ্ণ ঘোষ বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন 'প্রজ্ঞা পারমিতা' (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯) প্রবন্ধে । এছাড়া সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বৌদ্ধ শূণ্যবাদ' প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ, ১৩৫৯ সংখ্যায় । 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে রামপ্রসাদ দাস চৈত্র, ১৩৫৩ সংখ্যায় আলোচনা করেছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেলের 'History of Western Philosophy and its connection with political and social circumstances from the ancient time.' গ্রন্থের ।

ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেবীপ্রসাদ চট্টেপাধ্যায়ের লেখা ধর্মের উৎপত্তি বিষয়ক প্রবন্ধ 'ইন্দ্রজাল থেকে ধর্ম' (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫), হিন্দুধর্মের নাথ সম্প্রদায়ের উপর কল্যানীদেবী লিখেছিলেন 'মধ্যযুগের সন্ত ও নাথ সাধনা' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২) । হীরেন্দ্রনাথ দত্তের উপনিষদের ওপর লিখিত বিখ্যাত প্রবন্ধ 'উপনিষদে জড়তত্ত্ব' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৯-এর বৈশাখ থেকে চৈত্র এবং ১৩৫০-এর বৈশাখ থেকে শ্রাবণ সংখ্যায় । খ্রীস্টধর্মের উপর হরপ্রসাদ মিত্রের 'খ্রিস্টীয় সমাজতত্ত্ব' (পৌষ, ১৩৪৯) প্রবন্ধটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ।

রাষ্ট্রনীতির বিভিন্ন পরিকাঠামো যেমন—গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্রের ফ্যাসিবাদ এবং বিস্তৃতভাবে মার্কসবাদের ওপর আলোচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল— সুশোভন সরকারের 'রাষ্ট্র গঠন-পরিষদের গোড়ার কথা' (আশ্বিন, ১৩৫৩), পরিমলচন্দ্র ঘোষের 'গণতন্ত্রের সংকট' (চৈত্র, ১৩৫৫), বুদ্ধদেব বসুর 'ফ্যাসিবাদ, শিল্প ও বিশ্বমানব' (পৌষ, ১৩৪৯), হিরণকুমার সান্যালের 'ফ্যাসিবাদ, সমাজ ও শিল্প' (পৌষ, ১৩৪৯), নরহরি কবিরাজের 'মার্কসবাদের নয়া ভাষ্য' (বৈশাখ, ১৩৫৬), সরোজ আচার্যের 'মার্কসবাদ ও স্বাধীনতা' (মাঘ, ১৩৫২), 'সাম্যবাদের প্রতিবাদ' (আষাঢ়, ১৩৫২), সুধাকর গুপ্তের 'নয়া গণতন্ত্র ও সমাজবাদ' (পৌষ, ১৩৫৫) ইত্যাদি।

ভূমি-অর্থনীতি, কৃষি-অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন

প্রবন্ধ ও 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়েছিল । যেমন—অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্রের 'কেইনসীয় অর্থনীতি' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩), বিমলচন্দ্র সিংহের 'ইংলণ্ডে র সমরকালীন অর্থনীতি' (ভাদ্র, ১৩৫০), গোপাল হালদারের 'কৃষকদের দাবী : পাঠকগোষ্ঠী' (বৈশাখ, ১৩৫২), কল্যাণকর গুপ্তের 'মার্শাল পরিকল্পনা' (অগ্রহায়ণ, ১৩৫০) ইত্যাদি ।

এইভাবেই বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, শিল্পকলা, চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য, সামাজিক সমস্যা, চলচ্চিত্র, নাটক, সাহিত্যতত্ত্ব, সংস্কৃত সাহিত্য, ইতিহাস, বিদেশী সাহিত্য, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেও অজস্র প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। বলা যেতে পারে, সুধীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'পরিচয়' প্রবন্ধ ও পুস্তক-সমালোচনার গুণগত ও সংখ্যাগত মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, 'পরিচয়' বরাবরই সযত্নে তার সেই মানকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে । এত বিপুল পরিমাণ ও মননঋদ্ধ প্রবন্ধ ও সমালোচনা বাংলা সাহিত্যে আর কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি । বাঙালি পাঠকের মননের ক্ষেত্রে যে মুক্তির হাওয়া 'পরিচয়' প্রবাহিত করেছিল, বরাবরই সে তার দায়িত্ব একইভাবে পালন করে গেছে। সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকা যেখানে রম্য গল্প, উপন্যাস, কবিতার জনপ্রিয় চর্চায় ব্যস্ত ছিল, 'পরিচয়' সেক্ষেত্রে ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র । 'পরিচয়'-এর উপন্যাস চর্চাও ছিল অন্য পত্রিকার উপন্যাস চর্চার থেকে পৃথক ।

'পরিচয়'-এ প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল— ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'এই জীবন' (অন্তঃশীলার সূত্রপাত), (১৩৪০), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'আবর্ত' (১৩৪৩), সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'সোমলতা' (প্রকাশারম্ভ, ১৩৪৪), নীরেন্দ্রনাথ রায়ের 'দাবী' (প্রকাশারম্ভ, ১৩৪৫), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহিংসা' (প্রকাশারম্ভ, ১৩৪৫), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'মোহনা' (প্রকাশারম্ভ, ১৩৪৮), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিযান' (প্রকাশারম্ভ, ১৩৫২), সমরেশ বসুর 'নয়নপুরের মাটি' (প্রকাশারম্ভ, ১৩৫৭), ননী ভৌমিকের 'ধুলোমাটি' (প্রকাশারম্ভ, ১৩৬০), দেবেশ রায়ের 'যযাতি' (প্রকাশারম্ভ, ইত্যাদি । সংখ্যার দিক থেকে খুবই স্বল্প, হিসেব করে দেখা গেছে প্রথম পঞ্চাশ বছরে 'পরিচয়'-এ মাত্র ১৯টি মৌলিক এবং ৩টি অনুবাদ উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে ।

আসলে গল্প-উপন্যাস প্রকাশের ব্যাপারে 'পরিচয়'-এ একটা অন্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল । এই পত্রিকা প্রকাশের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল দেশ-বিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে এ দেশীয় পাঠকদের পরিচয় স্থাপন । সেই উদ্দেশ্যে ফরাসি-ইংরেজী উপন্যাসের সমালোচনা বহুলসংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছিল পুস্তক পরিচয় বিভাগে । আলোচিত হচ্ছিলেন মালরো জীদ, অলডাস হাক্‌সলি কিংবা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ । সেসব আলোচনায় উপন্যাস-এর যে উৎকর্ষের ধারণা প্রশ্রয় পাচ্ছিল বাংলা সাহিত্যের সমকালীন যুগের উপন্যাস চর্চায় তার হদিশ ছিল না । কাব্য ভাবনায় যে সচেতনতার চর্চা চলছিল, তাকে সৃষ্টিতে আকীর্ণ করছিলেন সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে-সমর সেন প্রভৃতি কবিরা। 'অন্তঃশীলা'-'আবর্ত' থেকে 'মহিষকুড়ার উপকথা' বা 'নবাব ক্লাইভ' পর্যন্ত 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত উপন্যাসে লক্ষণীয় হয়ে আছে একটা সচেতনতারই বৈশিষ্ট্য, ফর্মে-কনটেন্টে । জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাস থেকে স্বতন্ত্র হয়ে আছে এগুলি—কখনও তীক্ষ্ণ সমাজ পরিবেশ

সচেতনতায়, কখনও বিশুদ্ধ নভেল চর্চার নির্মিতিতে, কখনও বা প্রত্যক্ষ রাজনীতিরই সংস্পর্শে দেশকাল-ইতিহাসে মানুষের সম্ভাবনাময় দ্বন্দ্বকে তুলে ধবার যোগ্য প্রয়াসে ।

ধূর্জটিপ্রসাদের নায়ক খগেনবাবু (যাঁকে লেখক তাঁর মনটা ধার দিযেছিলেন বলে স্বীকার করেন 'অন্তঃশীলা'র ভূমিকায়) বলেছিলেন—'সত্যিকারের নভেলে গল্পাংশ থাকে না, থাকা উচিত নয়, চিন্তাস্রোতের বিবরণ থাকবে, হয়তো কোনো সিদ্ধান্তই থাকবে না, কীটসেব negative capability থাকবে । ...তবে স্রোত যে বইছে তার ইঙ্গিত থাকবে।' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ ১৩৪৭ সালে 'পরিচয়'-এ লিখেছিলেন—'এইসব নভেল বুদ্ধিসর্বস্ব উঁচুকপালে দুর্নাম অর্জন করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভাবধর্মী নভেলই বর্তমান যুগের উপযোগী ।'

এইসব আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছিল, আধুনিক উপন্যাস সম্পর্কে 'পরিচয়'-এর সচেতনতা । তাই আক্রান্ত হচ্ছিলেন, শরৎচন্দ্র কিংবা সমকালীন পাশ্চাত্যবিলাসী কথাকাররা । কারণ রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে যে ধারার সূত্রপাত, বাংলা উপন্যাস চর্চায় তার প্রতি লক্ষ ও মনোযোগ ছিল না । তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত অন্তঃশীলা-আবর্ত-মোহনা এই ত্রয়ী উপন্যাসের জন্য । আর এই ত্রয়ী উপন্যাস প্রকাশের মধ্য দিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকার উপন্যাসের গোড়াপত্তন। পরবর্তীকালেও 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত উপন্যাসে মননধর্ম ও সচেতনতার সেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়েছে ।

'পরিচয়' পত্রিকার ১৩৪০ সালের মাঘ সংখ্যায় 'এই জীবন' নাম দিয়ে যে কাহিনীর সূত্রপাত—পরবর্তীকালে সেটাই 'অন্তঃশীলা' উপন্যাসে পরিণতি পায় এবং 'আবর্ত' ও 'মোহনা' আরও দুই পর্বে এগিয়ে গিয়ে শেষ হয় । সুধীন্দ্রনাথের 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে আধুনিক বাংলা কবিতার দিগদর্শনের চিহ্ন যেমন ছিল এলিঅটের সাহচর্যে, আত্মসচেতনতার শিক্ষায়, তেমনি ধূর্জটিপ্রসাদ এ উপন্যাসে বপন করেন সেই আত্মসচেতনতারই বীজ আধুনিকতর যা মৌল লক্ষণ।

'অন্তঃশীলা'য় প্রাধান্য পায় চিন্তাবৈচিত্র্য । সংঘাতও মূলত চৈতন্যে ও চিন্তায়—যে চিন্তা ঠিক ধারাবাহিকভাবে এগোয় না, সব কিছুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও যুক্ত বলেই মাঝে মাঝে ছিন্ন হয় । লেখকও ঘটনাজালে জড়িয়ে পড়েন না, কাহিনীর অগ্রগতিকে মর্যাদা দেন ঠিকই, কিন্তু নির্দিষ্ট সীমায় তাকে আবদ্ধ রাখেন । তাই শুরু করেন সেখান থেকে অন্য ঔপন্যাসিক যেখানে নিটোল গল্পের সমাপ্তি ঘটাতেন । খগেনবাবুর স্ত্রী সাবিত্রীদেবীর আত্মহত্যার আঘাত দিয়ে উপন্যাসের সূত্রপাত । অতঃপর রমলাদেবীর সঙ্গে খগেনবাবুর সম্পর্কের বিবর্তনে, কলকাতা থেকে কাশী, কাশী থেকে লক্ষ্ণৌ-কানপুরের পরিবেশ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে খগেনবাবু আসলে বেরিয়ে আসেন আপন আত্মকেন্দ্রিক বুদ্ধিচর্চার খোলস ছেড়ে—সম্বন্ধ স্থাপনে । এমনকি গার্হস্থ্য ছেড়ে কর্মময় জীবনের বিস্তারে । গল্পে নয়, পরিবেশ প্রভাবে চরিত্রের বিবর্তনই এ উপন্যাসের মুখ্য । এছাড়াও উপন্যাস ত্রয়ীর চৈতন্যের আধার এর গদ্যভঙ্গি । আসলে 'চতুরঙ্গ'-এ যে সর্বাত্মক আধুনিক, উপন্যাসের সূচনা, 'পরিচয়'-এ তারই চর্চা ও বিবর্তন ।

১৩৪৪-৪৫ সালে সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'সোমলতা' প্রকাশিত হয় । ময়ূরাক্ষী-